হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম

রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড, সেনাবাহিনীর ভেঙে পড়া চেইন অব কমান্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা—কাছ থেকে দেখা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এসব ঘটনার বিস্তারিত বয়ান রয়েছে এই বইয়ে। বাংলাদেশের ওই ঝঞ্ঝাসংকুল সময় আর ইতিহাসের এক অলিখিত অধ্যায়ের অজানা ঘটনাবলি জানতে অবশ্যপাঠ্য একটি বই।

সৈনিক জীবন

গৌরবের একাত্তর
রক্তাক্ত পঁচাত্তর

সৈনিক জীবন

গৌরবের একাত্তর
রক্তাক্ত পঁচাত্তর

হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম

সৈনিক জীবন : গৌরবের একাত্তর, রক্তাক্ত পঁচাত্তর

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২০
মাঘ ১৪২৬, ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন : ৮১৮০০৮১

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

মুদ্রণ : ডট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৩/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৫২০ টাকা

Sainik Jibon : Gowraber Ekattor, Roktakto Pochattor
by Hafiz Uddin Ahmad Bir Bikrom
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180081
e-mail : prothoma@prothomalo.com

Price : Taka 520 only

ISBN 978 984 94365 3 9

আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা দিলারা হাফিজকে,
বই লেখার ব্যাপারে যিনি আমাকে
উৎসাহ জুগিয়েছেন

লেখকের নিবেদন

আমি লেখক হিসেবে তেমন পরিচিত নই, তবে ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া এবং সেনাবাহিনীতে চাকরি করার সুবাদে অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ভেতর থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এ বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এক গণবাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনাপঁচিশেক অফিসার একাত্তরের মার্চে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জনযুদ্ধে শামিল হন। আমি তাঁদের একজন হতে পেরে গর্বিত।

প্রায় ৪৪ বছর আগে ইউনিফর্ম খুলে এসেছি, কিন্তু এ বাহিনীর ভালো-মন্দ আজও আমাকে আলোড়িত করে। বইয়ে বর্ণিত ঘটনাবলি অনেক বছর আগে ঘটেছে, কিন্তু এসব ঘটনা থেকে বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে বলে আমি মনে করি।

এসব ঘটনার পাত্রপাত্রীরা কেউ কেউ এখনো জীবিত। তাঁদের অনেকের জন্য কিছুটা বিব্রতকর হতে পারে, এই বিবেচনায় লেখার আগ্রহবোধ করিনি।

২০১৮ সালে সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে হঠাৎ করে দেখা হলো *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমানের সঙ্গে। তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার খুবই সমৃদ্ধ। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো লিখে ফেলার জন্য। তাঁর সঙ্গে ছাত্রজীবনে একই টিমে ক্রিকেট খেলেছি, তিনি আমার প্রিয় মানুষ। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দ্রুত লিখে ফেললাম আট বছরের সেনাজীবনের অভিজ্ঞতা। এতে রয়েছে ইতিহাসের কিছু অজানা অধ্যায়ও। প্রথমা প্রকাশনের অরুণ বসু ও জাফর আহমদ রাশেদকে ধন্যবাদ। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণেই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। সহৃদয় পাঠক ভুলত্রুটি মার্জনা করবেন—এই প্রত্যাশা করি।

হাফিজ উদ্দিন আহমদ
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২০

সূচিপত্র

সৈনিক জীবন

গৌরবের একাত্তর, রক্তাক্ত পঁচাত্তর

প্রথম অধ্যায়

জীবনের প্রথম প্রহর

বরিশালে সেনা আগমন

ছোট্ট ছিমছাম সাদামাটা শহর বরিশাল, বাংলার ভেনিস নামে সুপরিচিত। বেশ কয়েকটি ছোট-বড় খাল শহরটি অতিক্রম করে পূর্ব প্রান্তে বয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনী কীর্তনখোলা নদীতে এসে মিশেছে। বরিশাল দেশের বৃহত্তম নদীবন্দর। স্টিমারঘাট এলাকা দিনরাত কর্মচঞ্চল, যাত্রীদের আসা-যাওয়ায় গমগম করছে। ঘাটের দৃশ্য অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত। কালো কয়লার গুঁড়া পরিপাটিভাবে বিছানো, কৃষ্ণচূড়াগাছ পরিকল্পিতভাবে লাগানো, ফুলের সমারোহ সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। যেন পটে আঁকা ছবিটি। স্টিমারঘাট থেকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত লাল সুরকি বিছানো পথটি চলে গেছে ঝালকাঠির দিকে। রাস্তার দুধারে পামগাছের সারি। সারা শহরের সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষ কীর্তনখোলার পাড়ে এই পাম সুশোভিত রাস্তায় বিকেলে হাঁটতে আসেন। বেল পার্ক খেলার মাঠের পাশ দিয়ে বিস্তৃত এই সড়ক চিত্তবিনোদনের জন্য আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয় জায়গা।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস। ক্লাস নাইনে পড়ি। নিরুদ্বেগ, পারিবারিক ছকবাঁধা জীবনে হঠাৎ করে চাঞ্চল্য, উদ্বেগ পরিলক্ষিত হলো। গৃহকর্তারা নিজ উদ্যোগে বাড়ির চারপাশের ঝোপ-জঙ্গল, আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করা শুরু করলেন। স্কুলের উঁচু ক্লাসের এবং কলেজের মাস্তান টাইপের ছেলেরা সুবোধ বালকের মতো জামার সব কটি বোতাম লাগিয়ে, গুটানো আস্তিন ফুল স্লিভ করে, রাস্তার এক পাশ দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা শুরু করে। সবার চোখেমুখে উত্তেজনা, বড়রা ফিসফাস করে সলাপরামর্শ করছে। রাস্তায় উচ্চ স্বরে গলাবাজি, গান গাওয়া—সবই বন্ধ। ঘটনা কী, হচ্ছেটা কী?

আমার পিতা ডা. আজহারউদ্দিন আহমদকে সবাই চেনে, ছোট্ট শহরের হাতে গোনা জনা দশেক চিকিৎসকের একজন, ভালো পশার জমিয়েছেন পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই। তাঁর মুখেই শুনলাম 'মার্শাল ল' বা সামরিক আইন জারি করা হয়েছে সারা পাকিস্তানে। সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর ক্ষমতা দখল করেছেন। তাঁর নির্দেশেই এখন থেকে দেশ পরিচালিত হবে। পূর্ব পাকিস্তানেও সেনারা শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনায় ছড়িয়ে পড়ছে, বরিশালেও শিগগিরই তাদের দেখা যাবে।

একদিন একটি ছোট সেনাদল বরিশালে এসে সার্কিট হাউসে ডেরা ফেলে, কিন্তু তাদের আবাসস্থলের বাইরে তেমন দেখা যাচ্ছে না। আমি বরিশাল জিলা স্কুলের ছাত্র, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম সেরা স্কুল। বাসা থেকে স্কুলে যাওয়ার পথেই পড়ে সার্কিট হাউস। খ্রিষ্টানদের কবরস্থানকে ডাইনে রেখে সদর রোড ধরে স্কুলের পথে এগোলেই হাতের বাঁয়ে পড়ে সার্কিট হাউস। বাঁ দিকে চোরা চাউনি মেলে প্রতিদিন স্কুলে যাই, কিন্তু কোনো সেনাসদস্য চোখে পড়ে না। একদিন একজনকে দেখলাম হাফপ্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি পরে সার্কিট হাউসের এক কোনায় মাঠের পাশে টিউবওয়েলে সাবান ঘষে কাপড় ধুচ্ছে। তেমন ভয়ংকর কিছু বলে মনে হলো না। ক্লাসের বন্ধুদের কাছে শোনা লম্বা-চওড়া, দৈত্যাকৃতি ভয়ালদর্শন সৈনিকদের কাউকে চোখে পড়েনি। হয়তো আমারই কপাল মন্দ! একদিন অবশ্য মাইকে শোনা গেল বিশেষ ঘোষণা, জনসাধারণকে নিজ বাড়ির আশপাশের আগাছা, আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হলো। ভেতো বাঙালি অবশ্য তাদের পদার্পণের আগেই এ কাজ সেরে ফেলেছে, মিলিটারি বলে কথা!

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শীর্ষ কর্তাদের নির্দেশে বন্ধ, আমরা স্কুলছাত্ররা অবশ্য রাজনীতি নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না। আমার ধ্যানজ্ঞান ছিল খেলাধুলা। ফুটবল, ক্রিকেট নিয়েই অষ্টপ্রহর ব্যস্ত। এমনই খেলাপাগল ছিলাম যে সকাল-বিকেলে খেলার পর, রাতে ঘুমালেও স্বপ্নে দেখতাম গোল করছি কিংবা ক্রিকেট মাঠে ছক্কা হাঁকাচ্ছি। বরিশালের ফুটবল ও ক্রিকেট লিগ ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দেশের তৎকালীন নামীদামি খেলোয়াড়েরা এসব প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নিতেন। কৈশোরে আমার রোল মডেল ছিলেন ফুটবলার কবীর এবং গজনবী, পাকিস্তান জাতীয় দলের খেলোয়াড়। যেমন তাঁরা সুদর্শন ছিলেন, তেমনই চিত্তাকর্ষক ছিল তাঁদের ক্রীড়াশৈলী। ভাবতাম, এদের মতো কৃতী খেলোয়াড় হতে পারলেই জীবন সার্থক। পড়াশোনা? পরীক্ষায় পাস করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, শুধু ততখানি করে অনেক বেশি

সময় দিয়েছি খেলার পেছনে। সেকালে খেলাকে অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন সম্ভবপর ছিল না। খেলোয়াড়দেরও তেমন পরিচিতি, গ্ল্যামার কিংবা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। অভিভাবককুল ছেলেদের খেলাধুলায় নিরুৎসাহিত করতেন। আমার পরিবারও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পরীক্ষার আগে খেলায় অংশগ্রহণের কারণে অনেক মার খেয়েছি। সামান্য পড়াশোনা করেই পরীক্ষায় বরাবর উতরে গেছি। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম পাঁচ-সাতজনের মধ্যেই থাকতাম। ক্লাসের শিক্ষকেরা বলতেন, ক্লাসে আমি ইংরেজিতে ফার্স্ট, অঙ্কে লাস্ট। অঙ্কে খুবই কাঁচা ছিলাম। অঙ্ক আজও আমার কাছে বিভীষিকা। এমনই খেলাপাগল ছিলাম, পরীক্ষার হলে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও না লিখে খাতা জমা দিয়ে বেরিয়ে আসতাম খেলার মাঠে সময়মতো উপস্থিত থাকার জন্য। আমার পিতা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৩ সালে ম্যাট্রিক এবং ১৯৩৫ সালে আইএসসিতে কয়েকটি লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমি তাঁকে ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেকেই বঞ্চিত করেছি। খেলার নেশা এমনভাবেই গ্রাস করেছিল আমাকে।

সামরিক শাসনের নির্দেশনায় প্রথম দিকে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে আইয়ুব নিজেই একটি দল সৃষ্টি করেন, কনভেনশন মুসলিম লীগ নামে এবং রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে পুরোদস্তুর রাজনীতিক বনে যান। বুনিয়াদি গণতন্ত্র নামে রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু করেন এবং নতুন ব্যবস্থায় সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আমার পিতাও একসময় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬২, '৬৫ ও '৭০ সালে তিনি ভোলা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। জীবনভর তিনি বিরোধী দলের সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের উপনেতা ছিলেন।

আমার রাজনীতিতে কোনো আগ্রহ ছিল না, পিতার নির্বাচন দেখতেও যাইনি। খেলাধুলার ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু পড়াশোনা না করলেই নয়, ততটুকু করেই ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৬১ সালে আইএ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ অনার্স শিক্ষাক্রমে ভর্তি হলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় আর খেলার মাঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেই নিজেকে সাবালক বলে মনে হলো। পিতার কঠিন শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত, বাঁধা-বন্ধনহীন আনন্দমুখর জীবনের স্বাদ পেলাম। ফজলুল হক হলের ফুটবল ও ক্রিকেট টিম সেরা, প্রাদেশিক দলের ফুটবলার শাহ আলম ও সাইফুদ্দিন এ হলের আবাসিক ছাত্র।

ফুটবলার হিসেবে ইতিমধ্যেই যৎকিঞ্চিৎ নাম হয়েছে আমার, বন্ধুদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফজলুল হক হলে আবাসিক ছাত্ররূপে ডেরা বাঁধলাম। পিতার নির্দেশ ছিল অর্থনীতি কিংবা ইংরেজিতে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হতে হবে, প্রয়োজনীয় নম্বরও ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ছিল কৃতী খেলোয়াড়দের আখড়া, জাতীয় দলের খেলোয়াড় মনজুর হাসান মিন্টু এবং ঢাকা ফুটবল লিগের কয়েকজন কৃতী খেলোয়াড় এ বিভাগের ছাত্র। বন্ধুরা পরামর্শ দিল সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য। কারণ, বিভাগীয় প্রধান ড. নিউম্যান খেলাপাগল মানুষ। মাঠে ভালো খেললেই তিনি প্রিয় খেলোয়াড়কে ফার্স্ট ক্লাস দিয়ে দেন ফাইনাল পরীক্ষায়। প্রাদেশিক দলের ইনসাইড লেফট এজাজ রসুল প্রথম শ্রেণি পেয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেই লেকচারাররূপে নিয়োগ পেয়েছেন। আমি শর্টকাট সাফল্যে বিশ্বাসী, পরামর্শটি মনে ধরল। হেসেখেলেই প্রথম শ্রেণি পাওয়া মন্দ কী? ভর্তি হলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। আন্তবিভাগীয় প্রতিযোগিতা শুরু হলো, প্রথম দুটি খেলায় হ্যাটট্রিক করলাম। ড. নিউম্যান মহাখুশি, হাফ টাইমের সময় নিজেই মাঠে নেমে স্যুটবুট পরে বলে লাথি মারেন। সহপাঠীরা বলাবলি করতে লাগল, হাফিজের ফার্স্ট ক্লাস ঠেকায় কে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, ছয় মাস পরই ড. নিউম্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরতরে ছেড়ে চলে গেলেন পশ্চিম জার্মানিতে, আমার ফার্স্ট ক্লাসও সঙ্গে গেল।

ফজলুল হক হলে আবাসিক ছাত্র হিসেবে প্রায় ছয় বছর আনন্দমুখর সময় কাটিয়েছি। মোগল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত এ হলের তিনতলা সুদৃশ্য ইমারতটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান, কেয়ারটেকার মন্ত্রিসভার প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদসহ অনেক বিশিষ্ট রাজনীতিক এ হলের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সূতিকাগাররূপেও ফজলুল হক হল ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

প্রথম বর্ষের নবীন ছাত্রদের চার সিটের রুমে একটি সিট বা কাঠের চৌকি বরাদ্দ দেওয়া হতো। আমিও ইস্ট হাউসের একটি কক্ষে স্থান নিলাম বাক্সপ্যাটরাসহ। সেকালে খেলাধুলার বেশ কদর ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আবাসিক হলগুলোতে। ছাত্র-শিক্ষক সবাই খেলোয়াড়দের সহযোগিতা করতেন। আমি প্রথম বছরেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ভালো খেলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হই। সেকেন্ড ইয়ারে উঠলে হল কর্তৃপক্ষ ক্রীড়ামোদী ছাত্রদের অনুরোধে আমাকে হলের একটি ডাবল সিটেড কক্ষে (সংযুক্ত বারান্দাসহ) সিট বরাদ্দ করে। হলে ছাত্রদের অবস্থানের মেয়াদ সাধারণত চার বছরের, তিন বছরের অনার্স এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স। আমি চার বছরে বিএ অনার্স ও মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর হলের ক্রীড়ামোদী ছাত্ররা,

ভিপি, জিএস, এমনকি প্রভোস্টও অনুরোধ করলেন হলে থেকে যেতে। তাঁরাই এলএলবি ক্লাসে আমাকে ভর্তি করে নিলেন এবং একটি সিঙ্গল সিটেড রুম বরাদ্দ দিলেন তিনতলায়। এ ছাত্রাবাসে আমিই ছিলাম আইন বিভাগের একমাত্র ছাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বরাবরই রাজনীতিসচেতন। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ছাত্ররা আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। '৬২-র ছাত্র আন্দোলনের ফলে সরকার ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে তাঁদের শিক্ষাসম্পর্কিত দাবিদাওয়া মানতে বাধ্য হয়।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে কখনো রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনি। খেলাধুলাই ছিল আমার ধ্যানজ্ঞান। আমার রুমমেটদের কয়েকজন ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন (১৯৭৩)। তাঁরা হলেন আব্দুল জলিল (নওগাঁ), কে এম শামসুল হুদা (মুন্সিগঞ্জ) এবং এন্তাজ আলী (সাতক্ষীরা)। আব্দুল জলিল পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। আমার পাশের রুমেই থাকতেন হলের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, যিনি পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সম্পর্ক বজায় ছিল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মনোরম ছিল। শিক্ষকেরা অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি তাঁদের কল্পনারও অতীত ছিল। তাঁরাই ছিলেন ছাত্রদের প্রকৃত অভিভাবক। রাজনৈতিক ডামাডোল থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতিচর্চা, বিতর্ক, ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রভৃতির চর্চা ছিল উচ্চমানসম্পন্ন। রাজনীতিচর্চাও সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ছিল। ছাত্রনেতাদের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল। এ সময়ের প্রধান নেতারা ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন (ছাত্র ইউনিয়ন), ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (ছাত্রলীগ), আবুল হাসনাত ও আনোয়ার আনসারী খান (এনএসএফ)। তাঁরা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন। এনএসএফ ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত সংগঠন ছিল, কিন্তু গভর্নর মোনায়েম খানের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে অচিরেই এটি পেশিমানবের দলে পরিণত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সামরিক শাসক আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে ওঠে। মিটিং-মিছিলে ছাত্ররা ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করে। আমি ব্যস্ত ফুটবল, ক্রিকেট নিয়ে। ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ

অত্যন্ত জমজমাট ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সারা দেশের কৃতী খেলোয়াড়েরা বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন। আমি প্রথম বছর ১৯৬২ সালে ফায়ার সার্ভিস টিমের হয়ে খেলি। আমি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও চারজন ছাত্র এ দলের সদস্য ছিলেন। প্রথম বছরেই উদীয়মান খেলোয়াড়রূপে আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং দু-তিন বছরের মধ্যেই দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্লাব ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলার সুযোগ পাই। ১৯৬৪ সালে ঝোঁকের বশে ফজলুল হক হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এবং চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করে নিজেই অবাক হই। কেডস পরেও ১০০ মিটার দৌড়ে প্রাদেশিক রেকর্ডের সমান টাইমিং করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেটিকস কোচ ছিলেন ওটিস কফি নামের এক আমেরিকান ভদ্রলোক। তিনি আমাকে তাঁর জিপে তুলে স্টেডিয়ামের দোকানে নিয়ে রানিং শু কিনে দিলেন এবং এক সপ্তাহ পর অনুষ্ঠেয় প্রাদেশিক অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমি অ্যাথলেটিকস অঙ্গনে প্রবেশ করি এবং সামান্য প্র্যাকটিস করে পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হই। হলের বন্ধুবান্ধব, সাধারণ ছাত্ররা এ ব্যাপারে আমাকে ব্যাপক উৎসাহ দেয়। আমিও খেলার নেশায় আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ি। পত্রিকার খবরাখবর দেখে আমার বাবা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। প্রতি সপ্তাহে বরিশাল থেকে চিঠি পাঠান খেলা ছেড়ে পড়াশোনায় মন দেওয়ার জন্য।

আগেই বলেছি, ষাটের দশকের গোড়ার দিকে তখনো খেলাধুলা কোনো সম্মানজনক পেশা হয়ে ওঠেনি। খেলায় মেতে থাকাকে বখে যাওয়ার নামান্তরই মনে করা হতো। বাবা সংসদ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য ঢাকায় এলে নাখালপাড়ায় সংসদ ভবনে থাকতেন। এক রুমে দুজন করে এমপি বরাদ্দ পেতেন। আবদুল মালেক উকিল ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা এবং আমার পিতা উপনেতা। দুজনে একই রুমে বহুদিন থেকেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে তখন চমৎকার সম্পর্ক ছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে তাঁদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের কোনো অবনতি হয়নি। শাসক দল মুসলিম লীগের নেতা বরিশালের আবদুর রহমান বিশ্বাস পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিরূপে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ও আমার পিতা একই রুমে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন। তাঁদের মধ্যে সব সময়ই সুসম্পর্ক ছিল। আমি সংসদ সদস্য ভবনে গেলেই আব্বা আমাকে বোঝাতেন, খেলাধুলা করে কোনো লাভ হবে না। আমি যেন পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে ভালো একটি ক্যারিয়ার গড়তে পারি, এ জন্য তাঁর উদ্বেগের সীমা ছিল না। তাঁর রুমমেটরাও পিতার সুরে সুর মিলিয়ে আমাকে উপদেশ

দিতেন। পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল আমি যেন তৎকালীন এলিট প্রশাসন ক্যাডার সিএসপির সদস্য হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নিই। সেকালে সব মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছাত্ররা এই ক্যাডারে ঢুকবার জন্য প্রস্তুতি নিতেন। খেলার নেশায় মত্ত থেকে আমি বাবার এ ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাতে পারিনি। এ জন্য আজও অপরাধবোধে ভুগি।

খেলাধুলায় ইতি টেনে একটি সম্মানজনক ক্যারিয়ার গড়ে তোলা ছিল তখন সময়ের দাবি, কিন্তু আমার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। হলে আমার আশপাশের রুম থেকে কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র মির্জা আজিজুল ইসলাম, এরশাদুল হক প্রমুখ সিএসএস পরীক্ষা দিয়ে সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য চাকরিতে ঢুকলেন। কয়েকজন অনার্স পরীক্ষা না দিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। আমার সহপাঠী কয়েকজন, যাঁরা ১৯৬১-তে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, তাঁদের মধ্যে ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলের ২৯তম ও ৩০তম লং কোর্সে যোগ দেন। অথচ আমি শুধু খেলা নিয়ে আছি, কোনো ক্যারিয়ার প্ল্যানিং নেই।

১৯৬৪ সালে বিশ্ব অলিম্পিকের আসর বসে জাপানের রাজধানী টোকিওতে। পাকিস্তানের অ্যাথলেটিকস টিম অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল সেকালে। বেশ কয়েকজন এশিয়ান রেকর্ডধারী ছিলেন এ দলে। টোকিও অলিম্পিকের দল গঠনের জন্য পাকিস্তান অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন দেশের কৃতী অ্যাথলেটদের জন্য অ্যাবোটাবাদে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনজন অ্যাথলেটকে এ ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়। আমি তাঁদের একজন। শৈল শহর অ্যাবোটাবাদের একটি হোটেলে আমিসহ জনা দশেক সিভিলিয়ান ক্রীড়াবিদ মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত এ ক্যাম্পে যোগ দিই। ক্যাম্পে অংশ নেওয়া অধিকাংশ ক্রীড়াবিদ সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। তাঁরা সেনানিবাসের নিজস্ব আবাসস্থল থেকে এসে সকাল-বিকেল দুই বেলা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতেন। গ্লেন র‍্যান্ডাল নামে একজন আমেরিকান ক্যাম্পে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১০০ মিটার স্প্রিন্টে তিনজন প্রতিযোগী এশিয়ান রেকর্ডধারী সুবেদার আবদুল খালেক, আমানউল্লাহ নিয়াজি ও আমি। ২০০ মিটার স্প্রিন্টে ক্যাপ্টেন আসমত বেগ, আমানউল্লাহ নিয়াজি ও আমি। আবদুল খালেক এশিয়ার কিংবদন্তি স্প্রিন্টার ১৯৫৪ (ম্যানিলা) এবং ১৯৫৮ (টোকিও) এশিয়ান গেমসের গোল্ড মেডালিস্ট, ১০.৪ সেকেন্ডে এশিয়ান রেকর্ড করেন। তখন বয়সের কারণে তাঁর আগের ফর্ম নেই, তবু তাঁকে হারানোর মতো কেউ নেই। তরুণ আমানউল্লাহ খালেকের মানে পৌঁছাতে আরও সময় নেবে। আর্মড কোরের তরুণ ক্যাপ্টেন আসমত বেগ ২০০ মিটারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু এশিয়ান মানে নিম্নসারিতে। তবে

তাঁরা আমার চেয়ে সবল এবং নিজ ইভেন্টের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে থাকেন। অ্যাথলেটিকসের চেয়ে ফুটবলের প্রতি আমার নিষ্ঠা বেশি, ফলে ট্র্যাকে তাঁদের মতো সিরিয়াস ছিলাম না।

অ্যাবোটাবাদ ছবির মতো সাজানো গোছানো শৈল শহর। চারদিকে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকায় অবস্থিত শহরটি পর্যটকদের জন্য দৃষ্টিনন্দন। এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা রয়েছে। মাইল তিনেক দূরেই কাকুলে অবস্থিত পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি। সপ্তাহে এক দিন রোববার আমাদের প্রশিক্ষণে বিরতি থাকে। সেদিন বিকেলে আমরা অ্যাবোটাবাদ শহরে বেড়াতে বের হই। রাস্তায় বেরোলেই চোখে পড়ে, শত শত স্মার্ট পোশাকধারী সবুজ ফেল্ট হ্যাট পরা পিএমএ ক্যাডেট ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গী আমান নিয়াজি সামরিক পরিবারের সদস্য। তাঁর পিতা ব্রিগেডিয়ার আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি* উচ্চপদস্থ অফিসার। জানাল, সে-ও সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী। কয়েক মাস পরই আইএসএসবি পেরিয়ে কাকুল একাডেমিতে যোগ দেবে। আমার সামরিক বাহিনী সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই। ক্যাজুয়াল দৃষ্টিতে ক্যাডেটদের গতিবিধি লক্ষ করতাম। মাঝেমধ্যে বাঙালি ক্যাডেটরা আমাকে দেখে 'স্লামালেকুম হাফিজ ভাই, কেমন আছেন?' বলে সম্ভাষণ জানাতেন। আমি না চিনলেও ফুটবলের বদৌলতে তাঁরা আমাকে চেনেন। আমান অবাক হয়ে বলেন, 'আরে, তোমাকে দেখি সবাই চেনে। তুমি কি সেলিব্রিটি নাকি?' আমি বললাম, এসব ফুটবলের কল্যাণে, পূর্ব পাকিস্তানে ফুটবলাররা অনেক জনপ্রিয়। 'আমি তো স্প্রিন্টাররূপে জাতীয় পর্যায়ে নাম করেছি, কিন্তু আমাকে তো কেউ চেনেই না।' আমানের খেদোক্তি।

একদিন বিকেলে অ্যাবোটাবাদের রাস্তায় পায়চারি করছি। এ সময় এক সুঠামদেহী ক্যাডেট সামনে এসে দাঁড়াল, 'আরে, হাফিজ ভাই, এখানে কবে এলেন?'

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে চেনার চেষ্টা করছি।

'আমি রফিক, এফএইচ হলের।'

আরে, তাই তো! হলে আমার পাশের রুমেই থাকত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র রফিকুল ইসলাম**, আমার এক বছর সিনিয়র। বছর খানেক আগে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে উঠেই পিএমএতে যোগ দিয়েছে ৩২তম লং কোর্সে। চেনা কিছুটা মুশকিলই বটে। চুলে বাটিছাঁট, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, শরীরে মেদ

---

* পরবর্তীকালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে ঢাকা রেসকোর্সে আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সেনাধ্যক্ষ।

** পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল, নবম ডিভিশনের জিওসি।

উধাও। এ যে অন্য এক রফিক। বরিশালের এক অজপাড়াগাঁর সন্তান রফিকুল ইসলাম এখন চলনে-বলনে অনেক স্মার্ট। খুব খুশি হলাম তাকে দেখে। রফিক আমাকে আমন্ত্রণ জানাল মিলিটারি একাডেমিতে যাওয়ার জন্য। সানন্দে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। পরের রোববার সকাল ১০টায় পিএমএতে যাওয়ার প্ল্যান করলাম। আমার স্কুলজীবনের বন্ধু আবদুস শাকুর ৩৪তম লং কোর্সে যোগ দিয়েছে কয়েক মাস আগে। ওর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলাম রফিককে।

নির্ধারিত দিনে ট্যাক্সি চড়ে পৌঁছালাম পিএমএ কাকুলে প্রথমবারের মতো। একাডেমির বিশাল গেট পেরোতেই সিনিয়র ক্যাডেট রফিক সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে একটি বড়সড় কক্ষে নিয়ে গেল আমাকে। সেখানে আগে থেকেই বসে আছে জনা দশেক বাঙালি ক্যাডেট। শাকুর ও জনা তিনেক জুনিয়র টার্মার ফ্লোরে বসা। সিনিয়র টার্মাররা বেডে কিংবা চেয়ারে উপবিষ্ট। একাডেমির ট্র্যাডিশন অনুযায়ী জুনিয়র ক্যাডেটরা সিনিয়র ক্যাডেটদের যাবতীয় নির্দেশ, অর্থাৎ প্রদত্ত শাস্তিসমূহ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করতে বাধ্য। সামরিক পরিভাষায় এর নাম র‍্যাগিং। বিচিত্র সব শাস্তি ভোগ করতে হয় বেচারা জুনিয়র ক্যাডেটদের। যেমন ২০০-৩০০ গজ ক্রলিং (হামাগুড়ি), ডিগবাজি ও গাছে চড়া, পাথরের শেল বহন করে ডাবলিং (দৌড়ানো)। এ ছাড়া আরও অনেক কষ্টসাধ্য ও ঘাম ঝরানো কসরতের শিকার হতে হয় তাদের। এই র‍্যাগিংয়ের ফলে ক্যাডেটরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সৈনিক জীবনের যাবতীয় প্রতিকূলতা অতিক্রম করার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করে একাডেমি থেকেই। প্রধান সড়ক বেয়ে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পথেই প্রথমবার দেখলাম তাদের শাস্তিদান পর্ব। কেউ হামাগুড়ি দিচ্ছে কিংবা স্যুট-টাই পরে সুইমিংপুলে লাফিয়ে পড়ছে। বিচিত্র সব ফৌজি গালি বর্ষিত হচ্ছে তাদের উদ্দেশে। কখনো কল্পনাও করিনি একদিন আমারও এমন করুণ দশা হবে আর অন্যরা দাঁড়িয়ে সেটি উপভোগ করবে।

ফ্লোরে বসা শাকুরের অবস্থা কাহিল। সকাল থেকেই নানা প্রকার শাস্তি ভোগ করেছে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই।

'কিরে শাকুর, কেমন আছিস?' আমার প্রশ্ন।

শাকুর নিরুত্তর। কাঁদো কাঁদো অবস্থা। রফিক বলল, ব্লাডিফুল, উইশ ফার্স্ট অ্যান্ড রেসপন্ড টু আওয়ার গ্রেট ফুটবলার।'

'স্লামালেকুম স্যার, আই এম ফাইন।' শাকুর ঢোঁক গিলে কোনোক্রমে উচ্চারণ করে, সোজা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে।

এতক্ষণে বুঝলাম পিএমএর উইশ করা মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন নয়, সালাম জানানো। তৃতীয় শ্রেণি থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমার সহপাঠী বন্ধু

আজ আমার দিকে তাকাতেও পারছে না! সোজা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আমাকে সালাম দিচ্ছে। হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু হাসলে আরও বিব্রত হবে, তাই তাকে ছেড়ে অন্য ক্যাডেটদের প্রতি মনোযোগী হলাম। শাকুরের পাশেই ফ্লোরে বসা ক্যাডেট ইকরাম সায়গল। ঢাকায় ক্রিকেট মাঠে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার পিতা পাঞ্জাবি কর্নেল, মা বাঙালি। তার অবস্থা শাকুরের চেয়ে কিছুটা ভালো, সেনা পরিবারের সদস্য বিধায় এহেন পরিস্থিতিতে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে।

কয়েক ঘণ্টা চমৎকার সময় কাটালাম একাডেমিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে গল্পগুজব জমে ওঠে। তারা একাডেমির ক্যাফেতে নিয়ে আমাকে আপ্যায়ন করে। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানলাম। কঠিন শৃঙ্খলা রক্ষা সৈনিক জীবনের মূলমন্ত্র। একাডেমি সদ্য কলেজ পেরোনো একজন তরুণকে ভেঙেচুরে মিলিটারি ফর্মায় ঢুকিয়ে সাহসী সৈনিকে রূপান্তরিত করে। পরিবারের ছত্রচ্ছায়া থেকে বেরিয়ে একাডেমিতে দুই বছর প্রশিক্ষণ লাভের পর একজন ক্যাডেট যখন কমিশন লাভ করে, সেকেন্ড লেফটেন্যান্টরূপে একাডেমির গেট পেরিয়ে বাইরের জগতে প্রবেশ করে, তখন সে একজন রূপান্তরিত ব্যক্তিত্ব। গ্র্যাজুয়েশন সনদের সঙ্গে সঙ্গে সে অর্জন করে সৈনিকসুলভ দক্ষতা। ম্যাপ রিডিং, আইন, যুদ্ধকৌশল ও সমরবিদ্যার যাবতীয় বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অর্জন করতে হয় নেতৃত্বের গুণাবলি।

বিকেলের দিকে ট্যাক্সি চড়ে ফিরে এলাম আমাদের ক্যাম্প হোটেলে। ফিরতি পথে বারবার শাকুরের কথা মনে পড়ছিল। বরিশাল জিলা স্কুলে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আমরা সহপাঠী ছিলাম। তার বাবা মৌলভি আবদুল গফুর ছিলেন ধর্মীয় শিক্ষক। সম্পন্ন পরিবার, জমিজমার মালিক। শাকুর ছিল অত্যন্ত লাজুক, এতটাই যে শিক্ষকের রোল কলের সময় লজ্জায় 'প্রেজেন্ট স্যার' কথাটিও উচ্চারণ করতে পারত না। প্রথম সারিতে কোনার দিকে উপবিষ্ট, নিচের দিকে তাকিয়ে থাকা সহকর্মীর পুত্রকে দেখে নিয়ে উপস্থিত মার্ক করতেন ক্লাসটিচার। শাকুর ক্লাসের বাইরে কারও সঙ্গে মিশত না। ম্যাট্রিক পাস করা পর্যন্ত একটিও সিনেমা দেখেনি। ম্যাট্রিক পাসের পর পিতা তার ওপর আরোপকৃত নিষেধাজ্ঞাসমূহ কিছুটা শিথিল করেন। হাজার হোক সে তখন কলেজছাত্র, সাবালক।

শাকুর এই সদ্য অর্জিত স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার শুরু করে। তার বাসা থেকে বিএম কলেজ পর্যন্ত আসতে দুটি সিনেমা হল পড়ে—জগদীশ ও সোনালী। শাকুর দুই হলেই নিয়মিতভাবে হাজিরা দিতে শুরু করে। প্রতিটি ছবিই কমপক্ষে পাঁচবার করে দেখে। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সে

সিনেমা দেখার সুযোগ পায়নি। সেই বঞ্চনা, অপ্রাপ্তি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য একাদশ বর্ষে এসে সে উঠেপড়ে লাগে। ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্সের ছাত্র সে। অথচ কলেজে তাকে দেখাই যায় না। ফল যা হওয়ার তা-ই হলো। মেধাবী ছাত্র শাকুর আইএসসিতে ডাব্বা মারল। পরিবারের মাথায় হাত! আমরা সহপাঠীরা ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হলাম। শাকুরের পিতা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তাকে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করালেন। ক্যাডেট কলেজের শৃঙ্খলিত জীবন তাকে মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় এবং দুই বছর পর শাকুর আইএ পাস করে। সহপাঠীদের কয়েকজনের সঙ্গে আইএসএসবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ৩৪তম লং কোর্সের সদস্যরূপে পিএমএতে জয়েন করে। শাকুর শেষতক সঠিক পথে এসেছে দেখে আমি খুশি হলাম।

অ্যাবোটাবাদ অ্যাথলেটিকস ক্যাম্পে দুই সপ্তাহ কাটানোর পর একঘেয়েমি গ্রাস করে আমাকে। ক্যাম্পে প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো। মাইলের পর মাইল দৌড়ানো, পাহাড়ে চড়া, এসব কষ্টসাধ্য কাজ। দৌড়বিদদের মধ্যে আমার অবস্থান তৃতীয়, আবদুল খালেক ও আমানউল্লাহর পরে, সুতরাং অলিম্পিকে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া সম্ভব হবে না। খামোখা পণ্ডশ্রম না করে ঢাকায় ফিরে ফুটবল লিগে অংশগ্রহণ করাই শ্রেয়তর বলে আমার মনে হলো। উপরন্তু কয়েক মাস পরই অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। একটি অজুহাত দেখিয়ে, ক্যাম্প কমান্ড্যান্টের অনুমতি নিয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম, ১৮ দিন অ্যাবোটাবাদে কাটিয়ে। ক্যাম্পে সিভিলিয়ান অ্যাথলেটদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। আমান ছাড়াও লং জাম্পার ইফতেখার শাহ ও শটপুটার তোফায়েল বাজওয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটিয়েছি। স্পোর্টসম্যানরা সাধারণত সহজ-সরল ও রসবোধসম্পন্ন হয়। তারা সহজেই একে অপরকে আপন করে নিতে পারে। আমি চলে আসায় তারাও কিছুটা বিষণ্ন, ক্যাম্পে ফিরে আসার অনুরোধ জানাল তারা। মাস দুয়েক পর তিন সদস্যের অ্যাথলেটিকস দল টোকিও অলিম্পিকে পাঠানো হলো। কোনো স্প্রিন্টার নেই, ইফতেখার শাহ এবং একজন লং ডিসট্যান্স রানার এ দলের সঙ্গে গেলেন।

ক্যাম্পে ফৌজি অ্যাথলেটদের সঙ্গে আমার তেমন আলাপ জমেনি। সুবেদার খালিক, রাজিক, ইকবাল, মুবারক শাহ—এরা এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেট। কিন্তু স্বল্পশিক্ষিত। খেলার বাইরে এদের সঙ্গে গল্প করার মতো তেমন কিছু ছিল না। একমাত্র ক্যাপ্টেন আসমত বেগের সঙ্গে কিছুটা অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়েছিল। আর্মার্ড কোরের (১৩ ল্যান্সার) সুদর্শন, দীর্ঘকায় স্মার্ট অফিসার। উপরন্তু আমাদের দুজনের একই ইভেন্ট (২০০ মিটার স্প্রিন্ট)

হওয়ার ফলে আমরা একে অপরের ঘনিষ্ঠ ছিলাম। তিনি ছোট ভাইয়ের মতোই দেখতেন আমাকে।

ঢাকায় ফিরে হলের অতিপরিচিত ডাবল সিটেড রুমে আস্তানা গাড়লাম। রুমমেট আবদুল জলিল আমার এক বছরের সিনিয়র, তুখোড় ছাত্রনেতা ও সজ্জন। তাঁর সঙ্গে আমৃত্যু সুসম্পর্ক বজায় ছিল আমার।

১৯৬৪ সালে অনার্স ফাইনাল ঘনিয়ে এল। একসঙ্গে আট পেপার পরীক্ষা নেওয়া হবে। সময় আছে মাত্র দুই মাস। জীবনে কখনো ফেল করিনি, মান-ইজ্জতের ব্যাপার। কোমর বেঁধে পড়াশোনায় মন দিলাম। আগের বছরগুলোর প্রশ্নপত্র স্টাডি করলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল সামনে অকূল সমুদ্র। প্রস্তুতি নিতে গিয়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। নিজের ওপর রাগ হলো, কেন যে অ্যাবোটাবাদ ক্যাম্পে গেলাম। মিছিমিছি অনেক সময় নষ্ট হলো!

অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় বসলাম কার্জন হলে। প্রথম পেপারের প্রশ্নপত্র হাতে পেয়েই পরীক্ষার্থীরা হতবাক। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রশ্ন, সিলেবাসের বাইরে থেকেও প্রশ্ন করা হয়েছে এবার, কারোরই 'কমন' পড়েনি। বই কিংবা নোট মুখস্থ করে কোনো লাভ হয়নি গ্রন্থকীট ছাত্রদের। চিন্তাভাবনা করে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আমার সহপাঠী পরীক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা পরীক্ষা বর্জন করে হলের বাইরে চলে আসে। আমাদের শিক্ষকেরা অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তাদের পরীক্ষার হলে ফিরিয়ে আনেন। তাঁরা আশ্বাস দিলেন, লিবারেলভাবে খাতা দেখে নম্বর দেবেন। এমনই ঘটল আরও তিন পেপারের বেলায়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের একই আশ্বাস দিলেন শিক্ষকেরা। মজার ব্যাপার হলো, প্রশ্নের এই ভিন্নতায় আমার পরীক্ষায় কোনো হেরফের হয়নি। পাঠ্যবই, সিলেবাস, নোট ইত্যাদি নিয়ে আমার প্রস্তুতি সামান্য। তাই কমনসেন্স খাটিয়ে প্রশ্নপত্রের উত্তর দিলাম। ফলাফল নিয়ে অবশ্য কিছুটা শঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর যখন হলের নোটিশ বোর্ডে অনার্স পরীক্ষার ফলাফল টাঙিয়ে দেওয়া হলো, রেজাল্ট দেখে খুবই অবাক হলাম! জনা চল্লিশেক পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র একজন (নাজমা আলম) প্রথম শ্রেণি পেয়েছেন। কুড়িজন দ্বিতীয় এবং বাদবাকিরা তৃতীয় শ্রেণি। আমি ভালো নম্বর পেয়ে ২য় শ্রেণিতে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছি। মাসিক ৭৫ টাকার বৃত্তি (ইন্টারনাল ট্যালেন্ট স্কিম) পেলাম। ক্লাসে হইচই পড়ে গেল। হাফিজ ক্লাসে আসে না, খেলার মাঠে পড়ে থেকে এই রেজাল্ট! ঘটনা কী? আমাকে সহপাঠীরা জিজ্ঞাসা করে, 'তুই আগেই পরীক্ষার প্রশ্ন হাতে পেয়েছিলি নাকি রে?' আমি কিছু না বলে শুধু হাসি!

১৯৬৪ সালে ৭৫ টাকা অনেক টাকা। ডাইনিং হলে খাবারের মাসিক চার্জ

ছিল ৩৭ টাকা। ১০০ টাকায় একজন আবাসিক ছাত্র মাসিক খরচ মেটাতে পারত মোটামুটিভাবে। বৃত্তির ৭৫ টাকা, ফুটবলের টাকা ইত্যাদি মিলিয়ে নিজেকে রকফেলারের কাছাকাছি মনে হলো। আব্বাকে আর টাকা পাঠাতে হবে না মর্মে জানিয়ে দিলাম। ৩ হাজার ৫০০ টাকায় বায়তুল মোকাররম মার্কেট থেকে একটি নতুন চকচকে ইতালিতে তৈরি ভেসপা মোটরবাইক কিনে ফেললাম। ঢাকা তখন ছোট শহর। এক ঘণ্টায় পুরো শহর চক্কর দেওয়া যেত। প্রায়শ বন্ধুবান্ধবকে পেছনে বসিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, নিউমার্কেট, স্টেডিয়াম এলাকায় চক্কর মেরে গুলিস্তান বিল্ডিংয়ে চৌ-চিন-চৌ চায়নিজ রেস্তোরাঁয় ডিনার সেরে হলে ফিরতাম। মোটকথা, মহা আনন্দে রাজার হালে দিনগুলো কাটছিল আমার।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হলো পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ। প্রথমবারের মতো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুভব করল, তারা সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কিছুটা অসহায় বোধ করতে লাগল বাঙালিরা। এ সময় টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত জনপদে দেশপ্রেমের জোয়ার বইতে শুরু করে। রেডিও-টিভিতে অবিরাম দেশাত্মবোধক গান প্রচারিত হতে লাগল। যুদ্ধ হচ্ছে পশ্চিম সেক্টরে, পূর্বাঞ্চলে ভারতের কোনো সামরিক তৎপরতা দেখা যায়নি। কিন্তু এফএইচ হলের উৎসাহী ছাত্ররা কয়েকটি ট্রেঞ্চ খনন করল সম্ভাব্য বিমান আক্রমণকালে আত্মরক্ষার জন্য। রাতে অনুষ্ঠিত হয় ব্ল্যাকআউট বা নিষ্প্রদীপ মহড়া। নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধ চলাকালে। আমরা ছাত্ররা হলের বারান্দায় রাতের অন্ধকারে বিমান আক্রমণের জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করি। কিন্তু কিছুই ঘটে না পূর্ব সীমান্তে। একদিন বিকেলে হলের লনে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমার সহপাঠী ছাত্রলীগ নেতা শাহ সালাউদ্দিন ভারত সরকারের কড়া সমালোচনা করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেয়। দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে যুদ্ধকালীন সংকট মুহূর্তে যুদ্ধাহত সৈনিকদের জন্য রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। স্থির হলো, পরদিন সকালে ছাত্ররা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রক্ত দিতে যাবে। আমিও রক্তদানের জন্য প্রস্তুত হয়ে সালাউদ্দিনের রুমে গেলাম।

'চল, রক্ত দিতে যাবি না?' আমার তাগাদা।

'দোস্ত, রক্ত দিলে আমি মারা যাব, আমার শরীরে রক্ত কম। তোরা যা।' সালাউদ্দিন।

'তাহলে কাল এত চাপাবাজি করলি কেন?' আমার প্রশ্ন।

'আমি ছাত্ররাজনীতি করি, এসব তো বলতেই হয়।' বলেই তাড়াহুড়া করে রুম থেকে কেটে পড়ে নেতা।

মাত্র ১৭ দিনের মাথায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলো। পাকিস্তান নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল তাসখন্দ চুক্তির বদৌলতে। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে বাঙালিদের নিয়ে গঠিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১ম ব্যাটালিয়ন (সিনিয়র টাইগার্স) অতুলনীয় শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে দেশব্যাপী সুনাম অর্জন করে। লাহোরের নিকটবর্তী বেদিয়ান সেক্টরে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের বাঙালি সৈনিকেরা প্রশংসনীয় নৈপুণ্য ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রাভিযানকে প্রতিহত করে। এই ব্যাটালিয়ন (৭০০ সৈনিক) পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সর্বাধিক সাহসিকতা পদক (সিতারায়ে জুরাত, তমঘায়ে জুরাত ইত্যাদি) অর্জন করে বিরল সম্মানের অধিকারী হয়। যুদ্ধের পরপরই পাকিস্তানি বাহিনীতে অফিসারের ঘাটতি পূরণের জন্য 'শর্ট সার্ভিস কমিশন' প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিয়মিত কমিশনের তুলনায় শর্ট সার্ভিস কমিশনের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশান বোর্ডে (ISSB)-এ কিছুটা শিথিলতা আনা হলো। ব্যাংকের কেরানি, পুলিশের দারোগা, স্কুলের শিক্ষক, পড়াশোনায় অমনোযোগী ছাত্র, এমন অনেকেই এ সুযোগে শর্ট সার্ভিস কমিশন লাভ করে। এঁদের কয়েকজন পরবর্তীকালে ভাগ্যক্রমে মেজর জেনারেল পদেও উন্নীত হন। ইন্টারমিডিয়েট পাস যুবকদের সেনাবাহিনীতে শর্ট সার্ভিস কমিশনে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বলা হয় মাত্র ছয় মাস ট্রেনিংয়ের পরই তাদের সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। চাকরির শর্তাবলি খুবই আকর্ষণীয়। পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে আর্মিতে যোগদানের হিড়িক পড়ে গেল। ফজলুল হক হল থেকেই বেশ কয়েকজন ছাত্র শর্ট সার্ভিস কমিশন লাভের উদ্দেশ্যে পিএমএ কাকুলে যোগ দেয়।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে আমাদের মাস্টার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এবার কেউ প্রথম শ্রেণি পেল না। আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে আবারও ষষ্ঠ স্থান লাভ করি।

ফল বেরোনোর মাস দুয়েক পর শাহ সালাউদ্দিন সিভিলিয়ান লেকচাররূপে মিলিটারি একাডেমি কাকুলের চাকরিতে যোগ দেয়।

এমএ পাস করার পর আবাসিক ছাত্ররা হল ছেড়ে চলে যায় এবং বিভিন্ন পেশায় আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু হলের ক্রীড়ামোদী ছাত্ররা আমাকে আইন বিভাগে ভর্তি হয়ে হলে থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। কথাটা আগেও বলেছি। তারাই হলের প্রভোস্টের কাছে তদবির করে আমাকে আইন বিভাগে ভর্তি করায় এবং তৃতীয় তলায় একটি সিঙ্গেল সিটেড রুম বরাদ্দ করায়। মাস্টার্স করার পর পড়াশোনার চাপ রইল না। ফুটবল নিয়ে আমার ব্যস্ততা আরও বেড়ে গেল। ল ক্লাস শুরু হয় সন্ধ্যার পর। সেখানে কখনো যাইনি, লইয়ারও হইনি।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার আকৈশোর লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। প্রথমবারের মতো পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হলাম। সৌদি আরব জাতীয় দল পাকিস্তান সফরে আসে তিনটি ম্যাচ খেলার জন্য। লায়ালপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে আমরা ৩-০ গোলে সৌদি আরবকে পরাজিত করি। বিখ্যাত লেফট উইঙ্গার মুসা হ্যাটট্রিক করেন। প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের জার্সি পরে শিহরিত হলাম। এ মুহূর্তের জন্যই আমি বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছি। আমরা দুজন বাঙালি খেলোয়াড় এ দলে সুযোগ পাই, আমি ও প্রতাপ শঙ্কর হাজরা।

খেলা নিয়ে ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় আব্বা উদ্বিগ্ন হয়ে একদিন নিজেই ফজলুল হক হলে আমার রুমে চলে এলেন। বললেন, 'মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেছ, আর কত খেলবে? এখন একটি পেশা বেছে নিয়ে ক্যারিয়ার গড়ে তোলো।'

'জি আব্বা, নিশ্চয়ই।' আমার সংক্ষিপ্ত জবাব।

'তুমি এ বছর সিএসএস (সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। বইপত্র জোগাড় করে পড়াশোনা শুরু করো। আমি কোনো অজুহাত শুনতে চাই না।' আব্বা বললেন।

'জি আব্বা।' আমি তাঁকে আশ্বস্ত করি।

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি কিছু বইপত্র জোগাড় করি। সিএসএস পরীক্ষার ফরম ফিলআপ করে জমা দিই আব্বার সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু প্রস্তুতি মোটেই এগোচ্ছে না ফুটবলসংক্রান্ত ব্যস্ততার কারণে। নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করব, এই মর্মে আব্বাকে আশ্বস্ত করলাম। সেকালে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার আগে প্রতি পরিবারে পরীক্ষার্থীর সাফল্য কামনা করে মিলাদ পড়ানো হতো। সিএসএস লিখিত পরীক্ষার আগের দিন আব্বা বরিশালে আমার সাফল্য কামনা করে বাসায় মিলাদ পড়ালেন। পরদিন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটালাম। পরীক্ষার সিট পড়েছিল ঢাকা কলেজে। আমি সেখানে না গিয়ে জাতীয় দলের ব্লেজার পরে গেলাম ঢাকা বিমানবন্দরে। দলের অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে অ্যারোফ্লোটের একটি বিমানে আরোহণ করে বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) রাজধানী রেঙ্গুনের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। এশিয়ান কাপে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় দলে আমি ছিলাম একমাত্র বাঙালি খেলোয়াড়। প্লেনে ওঠার আগে অনেক ভেবেছি আমার করণীয় সম্পর্কে। পিতাকে খুশি করার জন্য পরীক্ষা দেব, নাকি জীবনে প্রথম বিদেশভ্রমণের সুযোগ কাজে লাগাব। অবশেষে খেলার নেশাই অগ্রাধিকার পেল। পরদিন পত্রিকায় এ খবর পড়ে আব্বা এতই মর্মাহত হলেন যে পরবর্তীকালে এ নিয়ে আর একটি কথাও বলেননি। বিমানে বসে সারাক্ষণই ভাবছিলাম ফিরে এসে আব্বাকে মুখ

দেখাব কীভাবে। আব্বা ২০১১ সালে প্রায় ১০০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ক্যারিয়ার-সংক্রান্ত নির্দেশ পালন না করে তাঁকে দুঃখ দিয়েছি, এ কথা ভেবে আজও অপরাধ বোধে ভুগি!

শীতের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতে রেঙ্গুন বিমানবন্দরে অবতরণ করি। ছোট ছিমছাম সুসজ্জিত এয়ারপোর্ট। বার্মা বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বিশাল এক দেশ। তাদের রয়েছে তেল থেকে শুরু করে যাবতীয় খনিজ ও বনসম্পদ। কী নেই তাদের? খাদ্যে স্বনির্ভর, পৃথিবীর এক নম্বর চাল রপ্তানিকারক দেশ, এককথায় সম্পদের কোনো অভাব নেই। কিন্তু চেপে বসা সামরিক শাসনের কারণে জনজীবনে উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি। বিস্তীর্ণ বনভূমির মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে দেশটির একমাত্র পাঁচ তারকা হোটেল ইনিয়ালেক। শহর থেকে দূরে, অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত এক লেকের পাড়ে অবস্থিত এই আধুনিক বিলাসবহুল হোটেল। লেকের নামেই হোটেলের নামকরণ। বার্মায় ফুটবল খুবই জনপ্রিয়। তারা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দল। আমরা ছাড়াও কম্বোডিয়া ও ভারতের জাতীয় দলও একই হোটেলে ছিল।

ষাটের দশকের রেঙ্গুন ছোট শহর, অনেকটা চট্টগ্রামের মতো। উন্নয়নের তেমন কোনো ছোঁয়া লাগেনি। বিপণিবিতানে কেনাকাটার কোনো সুযোগ নেই। যেকোনো পণ্য কেনার জন্য সরকারি পারমিট প্রয়োজন। ফলে শপিং করা হলো না।

অং সান মেমোরিয়াল স্টেডিয়ামে চার দেশের অংশগ্রহণে এশিয়ান কাপের জোনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হলো। ফ্লাড লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত স্টেডিয়াম দর্শকে পরিপূর্ণ। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। যোগ্যতর দল হিসেবে বার্মা চ্যাম্পিয়ন হয়, আমরা তাদের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হই। ভারত-পাকিস্তান প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলাটি ১-১ গোলে ড্র হয়।

বার্মার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি অত্যন্ত মনোরম। বনভূমি ছাড়া দেখার মতো তেমন কিছুই নেই। রেঙ্গুনের বিখ্যাত শোয়ে ড্রাগন প্যাগোডা মোটামুটি দৃষ্টিনন্দন কিন্তু পর্যটকদের ভিড় নেই সার্বিক পরিস্থিতির কারণে। এক সকালে দেখে এলাম শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের দীনহীন সাদামাটা কবর। ইংরেজ শাসকদের দ্বারা রেঙ্গুনে নির্বাসিত হবার পর সম্রাটের শেষ জীবন সেখানে খুব কষ্টে কেটেছে। বাহাদুর শাহ জাফর ছিলেন কবি, কবিতার ভাষায় আক্ষেপ করে তিনি লিখেছেন, 'জাফর এতই বদনসিব যে বিশাল হিন্দুস্তানে দুগজ জমিও দাফনের জন্য সে পেল না।'

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির আকাশে সে সময় দুর্যোগের ঘনঘটা ঘনীভূত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হয় কিন্তু সে পাকিস্তানে বাঙালিরা প্রকৃত

অর্থে পরাধীনই থেকে যায়। ব্রিটিশের পরিবর্তে পাঞ্জাবিরা শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোনো সংবিধান ছিল না, শাসকদের মর্জিমতোই দেশ চলছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য '৫২-তে ছাত্রদের রাজপথে জীবন বিসর্জন দিতে হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও রাষ্ট্রশাসনে বাঙালির ভূমিকা না থাকায় তারা ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি পেশ করে। প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করে একটি লুজ ফেডারেশন স্থাপনই ছয় দফার মূল দাবি। প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র—এ দুটি বিষয় ছাড়া প্রতি ক্ষেত্রে ফেডারেটিং ইউনিট, অর্থাৎ প্রদেশসমূহ নিয়ন্ত্রণ করবে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আলাদা কারেন্সি চালু এবং মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল ছয় দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতারূপে অভিহিত করে এবং এর তীব্র বিরোধিতা করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এ দাবি ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মানসিক গঠনেই ভিন্নতা ছিল। একমাত্র ধর্ম ছাড়া কোনো বিষয়েই তাদের মধ্যে মিল ছিল না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের কারণে বাঙালিরা ক্রমেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

খেলার মাঠেও পশ্চিমা বিরোধী মনোভাব ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রেঙ্গুন থেকে ফিরেই পাকিস্তান জাতীয় দল ঢাকার মাঠে আরসিডি ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। বিমানবন্দর থেকে আমাদের দলকে নিয়ে আসা হলো তখনকার ঢাকার একমাত্র আধুনিক হোটেল শাহবাগে (বর্তমানে পিজি হাসপাতাল)। টুর্নামেন্টের অপর দুটি দল তুরস্ক ও ইরান একই হোটেলে ওঠে। যোগ্যতর দল হিসেবে তুরস্ক চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করে। খেলা চলাকালে এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য সবার চোখে পড়ে। পাকিস্তান দলের একমাত্র বাঙালি খেলোয়াড়ের (অর্থাৎ আমার) পায়ে বল এলেই স্টেডিয়ামের দর্শকেরা হর্ষধ্বনি করে ওঠে, অন্য ১০ জন খেলোয়াড়ের বেলায় তারা কিছুটা নিস্পৃহ, নিশ্চুপ। আমার প্রতি স্থানীয় দর্শকদের এহেন পক্ষপাতিত্ব দেখে আমাদের টিমের অন্য খেলোয়াড় বন্ধুরা হোটেলে ফিরে আমাকে নিয়ে হাসি-মশকরা করতে থাকে। তাদের বক্তব্য, 'আমরা তো সবাই নিম্নমানের খেলোয়াড়। হাফিজই একমাত্র তারকা। দর্শকেরা তাকে ছাড়া অন্যদের পাত্তাই দিচ্ছে না।' দলের অধিনায়ক তোরাব আলী এশিয়ার সেরা স্টপার ব্যাক, ঢাকায় আমরা একই দল মোহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলি। আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলে, 'ভাইয়া, কেয়া হো রাহা হ্যায় (ভাই, কী হচ্ছে এসব)?' 'হামারা কেয়া কসুর

(আমাদের কী অপরাধ)'? আমিও তাদের সঙ্গে মশকরা করে মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাই। একই জার্সি পরে খেললেও মানসিকভাবে তখন আমরা দুটি দলে বিভক্ত—পূর্ব ও পশ্চিম, বাঙালি ও অবাঙালি। ক্রমশ এ বিভক্তি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই।

শুরু হলো সামরিক জীবন

আরসিডি টুর্নামেন্ট শেষ হলে এফএইচ হলে আমার রুমে ফিরে এলাম। একদিন সকালে দেখা হলো আমার দুই বছরের সিনিয়র ছাত্র, জগন্নাথ কলেজে রসায়ন বিভাগের প্রভাষক ওয়াহিদুল হোসেনের সঙ্গে। তিনি জানালেন যে আর্মি এডুকেশন কোরে যোগদানের জন্য তিনি সেনা দপ্তরে আবেদন করেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি আগ্রহী কি না। ভেবে দেখব বলে তাঁকে কোনোমতে দায়সারা জবাব দিলাম।

রাতে ঘুমানোর আগে ভাবনা এল নিজের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে। একটা সম্মানজনক পেশা আমাকে অবিলম্বে বেছে নিতে হবে। জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান সাহেব ছিলেন আব্বার বন্ধুস্থানীয়। তিনি আমাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে যোগ দিতে বলেছেন। তাঁর অভিমত, পড়াশোনার চর্চা থাকলে সিএসএস পরীক্ষায়ও তা কাজে লাগবে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে আমাকে। আর্মি এডুকেশন কোর সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কোনো সেনাসদস্য নেই। পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মেজর মোহাম্মদ হোসেন মালিক বছরখানেক ধরে আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য। তাঁর মতে এ পেশায় গেলে সামাজিক মর্যাদার পাশাপাশি খেলাধুলাও চালিয়ে যাওয়া যাবে। আর্মিতে নাকি জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়দের বাড়তি কদর। এডুকেশন কোরের দায়িত্ব কী, তা-ও সঠিকভাবে জানি না। ভাবলাম হয়তো বন্ধু শাহ সালাউদ্দিনের মতো বিএমএতে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার প্রধান সমস্যা রেঙ্গুন ভ্রমণের পর পিতার মুখোমুখি হওয়া। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, সেনা শিক্ষা কোরে যোগ দেব এবং সুবিধামতো সময়ে কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করব। পরদিন সেনা শিক্ষা কোরে নিয়মিত কমিশনের জন্য আবেদন করলাম।

আবেদন করার দুই সপ্তাহের মধ্যে সেনা দপ্তরের চিঠি পেলাম প্রাথমিক ইন্টারভিউতে হাজির হওয়ার জন্য। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে

সিগন্যাল গেটের কাছে একটি অফিস কক্ষে ইন্টারভিউ দিলাম একজন ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে গঠিত বোর্ডের সামনে। আমি জাতীয় দলের খেলোয়াড় জেনে তাঁরা খুশি হলেন এবং বললেন, 'ওয়েল কাম টু আর্মি।'

এক সপ্তাহ পর চিঠি পেলাম ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকেশন বোর্ডে (আইএসএসবি) চূড়ান্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য। সপ্তাহ দুয়েক পর আমি ও ওয়াহিদ ভাই ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে রেললাইনের পূর্ব দিকে অবস্থিত আইএসএসবি অফিসে রিপোর্ট করলাম। আমাদের ব্যাচে Electrical and Mechanical corps (EME) এবং Army Education Corps (AEC)-এর মোট ৩০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিলাম। প্রথমেই সাইকোলজিক্যাল টেস্টে জনা দশেক বাদ পড়ে। পরবর্তী তিন দিনে বিভিন্ন প্রকার লিখিত ও শারীরিক সক্ষমতার (Obstacle course) পরীক্ষা নেওয়া হয়। তৃতীয় দিন বিকেলে আইএসএসবি চেয়ারম্যানের সঙ্গে ইন্টারভিউর পর চূড়ান্ত ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হয়। এডুকেশন কোরে মাত্র দুজন (আমি ও ওয়াহিদ ভাই) এবং ইএমই কোরে দুজন পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে নিয়মিত কমিশনের জন্য নির্বাচিত হলাম। রেগুলার কমিশনের জন্য পরীক্ষা শর্ট সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার তুলনায় কঠিন। এ কারণে বাদ পড়ার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। আমাদের ব্যাচে পরীক্ষা দিলেন ক্যাপ্টেন গাইয়ুর নামে ইপিআরের এক অফিসার। এক ফাঁকে তাঁকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। জানালেন, তিনি শর্ট সার্ভিস কমিশন পেয়ে পাঁচ বছর চাকরি করেছেন, এবার রেগুলার কমিশন লাভের জন্য দ্বিতীয়বার আইএসএসবির মুখোমুখি হয়েছেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্থায়ী নিয়মিত কমিশন্ড অফিসার হলেন।

আইএসএসবিতে নির্বাচিতদের সিএমএইচে (কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল) নেওয়া হলো শারীরিক পরীক্ষার জন্য। এখানেও একজন অযোগ্য হলেন, অর্থাৎ মেডিকেলি আনফিট। সিএমএইচের স্টাফ সার্জনের নাম মেজর শফিকুর রহমান, ইএনটি স্পেশালিস্ট। দেখা হতেই তিনি আমাকে নিরাশ করলেন। বললেন, 'আপনি নামকরা খেলোয়াড়, কে বলেছে আপনাকে আর্মিতে যোগ দিতে? তা-ও আবার এডুকেশন কোরে, যেখানে প্রমোশন খুবই স্লো।'

তিনি আমার কান স্প্রে দিয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। বললেন, 'এত বছর কাদার মধ্যে খালি খেলেই গেছেন, কান পরিষ্কার করার সময় পাননি, তাই না? বিকেলে আমার চেম্বারে এভাবে কান পরিষ্কার করালে ১০০ টাকা ফি দিতে হতো। খেলোয়াড় বলে ফ্রি করে দিলাম, আর্মিতে যাবেন কি না, আবার ভেবে দেখবেন।'

ওয়াহিদ ভাই নির্বাচিত হয়ে খুব খুশি। আমি স্টাফ সার্জনের কথায় একটু দমে গেলাম। ওয়াহিদ ভাই বললেন, ঢাকায় অবস্থিত ১৪ ডিভিশনে এডুকেশন

কোরের একজন লে. কর্নেল স্টাফ অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর কাছ থেকে ব্রিফিং নেওয়া যাক। পরদিন আমরা দুজন ডিভিশন সদর দপ্তরে এইসির লে. কর্নেলের কাছে গেলাম কিছু আশার বাণী শোনার জন্য। তিনিও আমাদের বললেন, 'আমি তোমাদের উৎসাহিত করতে পারছি না, এইসিতে প্রমোশনের সুযোগ খুবই সীমিত। আমার অনেক জুনিয়র সেনাবাহিনীতে জেনারেল, আর আমি নগণ্য লে. কর্নেল।' আবার মন খারাপ করে হলে ফিরে এলাম।

সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হওয়ার খবর আব্বাকে জানালাম। তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না। তবে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগে কাকুলের উদ্দেশে যাত্রা করলাম আমি ও ওয়াহিদ। রাওয়ালপিন্ডিতে দুই দিনের যাত্রাবিরতি। দরজিকে দিয়ে একটি নতুন স্যুট বানিয়ে নিলাম। পিন্ডির কাছাকাছি গড়ে উঠছে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ। পরিকল্পিত মেগাসিটি, প্রশস্ত রাস্তাঘাট, বিলাসবহুল ইমারতে সমৃদ্ধ। পরিকল্পিত বনায়নের জন্য বিমান থেকে ছিটানো হয়েছে নানা ধরনের বীজ। কয়েক বছরেই বনাঞ্চল এবং চতুর্দিকের পাহাড়গুলো ইসলামাবাদকে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ছিল অতি সামান্য। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হলে পাট রপ্তানি করে পাকিস্তান বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকের পরিশ্রমের ফসল পাট রপ্তানির কোনো সুফল এ অঞ্চলের জনগণ ভোগ করতে পারেনি। অর্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। ইসলামাবাদ, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি—এসব মেগাসিটির চাকচিক্য বেড়েছে পাটের বিনিময়ে অর্জিত অর্থে। পূর্ব পাকিস্তান উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বরাবরই বঞ্চিত থেকেছে, ধীরে ধীরে তার পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনিতে পরিণত হওয়ার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রশাসনে কোনো ভূমিকাই ছিল না, পাঞ্জাবিরাই ছিল সর্বেসর্বা। ক্রমেই তারা প্রভুত্বপরায়ণ হয়ে ওঠে। সিভিল প্রশাসন ও সামরিক বাহিনী—সর্বত্রই বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল যৎসামান্য, পাঞ্জাবিরাই ডমিন্যান্ট শাসকশ্রেণিতে পরিণত হয়। গণতন্ত্র না থাকার কারণে এলিট শাসককুলের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি। বাঙালিদের পশ্চিম পাকিস্তানিরা নিম্নশ্রেণির জাতি বলে গণ্য করত। এরা মার্শাল রেস নয়, হিন্দু সংস্কৃতিতে প্রভাবিত, অর্থাৎ খাঁটি মুসলমান নয়, এমন কথাও বলা হতো। অথচ শিক্ষার হার পূর্ব পাকিস্তানে বেশি, বাঙালি সাহিত্য-সংস্কৃতি পশ্চিমের তুলনায় উন্নততর।

১৯৬৮ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে আমি ও ওয়াহিদ ভাই স্যুট পরে কেতাদুরস্ত হয়ে ট্যাক্সি চড়ে যাত্রা করলাম কাকুলের উদ্দেশে। ওয়াহিদ ভাই

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দুই বছরের সিনিয়র, নিপাট ভদ্রলোক। শিক্ষকসুলভ আচরণ ও ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত। যাত্রাপথে আমার মনে পড়ছিল চার বছর আগের কাকুল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, সে সময় প্রত্যক্ষ করা জুনিয়র ক্যাডেটদের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। র‍্যাগিংয়ের প্রসঙ্গ তুলতেই ওয়াহিদ ভাই বললেন, 'আমরা শিক্ষক, শিক্ষার আলো ছড়ানোর জন্য এসেছি। ক্যাডেটরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে।'

ঘণ্টা দেড়েক পরই পিএমএর দ্বিতীয় পাক ব্যাটালিয়নে যাই। ট্যাক্সি থেকে নামার পর মালপত্র ব্যারাকে নিয়ে গেল ব্যাটম্যান (খিদমতগার) আর আমাদের ওপর চড়াও হলো মহা শক্তিধর সিনিয়র ক্যাডেটরা। ওয়াহিদ ভাই বললেন, 'উই আর ফ্রম এডুকেশন কোর।' সিনিয়র বলে, 'শাটআপ ব্লাডিফুল। অন দ্য হ্যান্ডস ডাউন।'

অন্য জুনিয়র ক্যাডেটদের দেখাদেখি আমরা মাটিতে শুয়ে নানা আদেশ পালন করছি। ওয়াহিদ ভাইয়ের এক প্রাক্তন ছাত্র সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি একটু কষ্টের হাসি হাসলেন, ভাবলেন এবার শিক্ষকের মর্যাদা পুনরুদ্ধার হবে।

'ইউ ব্লাডি প্রফেসর টাইপ, ডোন্ট গ্রিন (হাসবে না)। ক্লাইম্ব দ্যাট ট্রি অ্যান্ড সিং আ সং,' প্রাক্তন ছাত্রের নির্দেশ।

হতভম্ব ওয়াহিদ ভাই একটি গাছের নিচু ডালে উঠে বললেন, 'আই ক্যান্ট সিং।'

'দিস ইজ পিএমএ, ইউর ফাদার উইল সিং,' সিনিয়র ক্যাডেটের সদম্ভ ঘোষণা।

পশ্চিম পাকিস্তানি ক্যাডেটরা র‍্যাগিংয়ের শিকার হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। বাঙালি ক্যাডেট, বিশেষ করে আমাদের মতো তুলনামূলকভাবে বয়োজ্যেষ্ঠরা র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে কিছুটা অপ্রস্তুত, বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে আমাদের মুখমণ্ডলে।

বাঙালি সিনিয়রদের কয়েকজন আমাকে চিনেছে বলে মনে হলো। তারা আমাকে ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানি ক্যাডেটদের র‍্যাগিং করছে। আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা 'ডিল' করছে। এরা যেহেতু অপরিচিত, তাদের নির্দেশ মানতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। পরিচিত বাঙালি, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো জুনিয়রের হাতে হেনস্তা হলে খারাপ লাগত। পরনের নতুন স্যুটটির জন্য মায়া লাগছে, নর্দমায় ক্রল করার ফলে এর রং বোঝা যাচ্ছে না!

রাখাল যেভাবে গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায়, আমাদেরও অনেকটা সে কায়দায় হাটিয়ে ও হামাগুড়ি দিয়ে নিয়ে আসা হলো একাডেমির বারবার শপে। এখানে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে সদ্য আসা জুনিয়র ক্যাডেটরা। আমার পালা এলে ক্ষৌরকারকে উর্দুতে বললাম চুল বেশি ছোট না করতে।

সে জবাব না দিয়ে ক্ষৌরকর্ম দ্রুত শেষ করে। আয়নায় চেহারা দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল, নিজেকেই চিনতে পারছি না বাটি ছাঁটের কারণে। হেয়ারকাটের পর ব্যাটম্যান এসে নিয়ে গেল আমার ব্যারাকে (T-1)।

পরদিন শুরু হলো আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। ১৬তম ওয়ার কোর্স এবং এইসি, ইএমই ক্যাডেটদের ৩১ পিএমএ স্পেশাল কোর্সের প্রশিক্ষণ একই সঙ্গে শুরু হলো। প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল আট মাস, সিলেবাস ও কারিকুলাম অভিন্ন। এডুকেশন কোরের সদস্যকে কেন নিয়মিত কমব্যাটান্ট বাহিনীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বোঝা গেল না, কিন্তু পরবর্তীকালে এটি সারা জীবন কাজে লেগেছে। আমাদের কোম্পানির নাম টিপু এবং সিনিয়র কোর্স (১৫তম ওয়ার) গজনভি কোম্পানি। টিপু কোম্পানি সাতটি প্লাটুন নিয়ে গঠিত, প্লাটুন কমান্ডারের অধীনে প্রতি প্লাটুনে জনা ত্রিশেক ক্যাডেট রয়েছে। আমি আর ওয়াহিদ ভাই টিপু-১ প্লাটুনের সদস্য। স্পেশাল কোর্সের ৫ জন এবং ওয়ার কোর্সের ২৫ জন নিয়ে এ প্লাটুন গঠিত।

আমার প্লাটুন টি-ওয়ানের কমান্ডার (প্রশিক্ষক) সুদর্শন গোলন্দাজ অফিসার মেজর রাহাত আমানুল্লাহ খান ভাট্টি। আমেরিকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুদক্ষ কর্মকর্তা, নায়কোচিত চেহারা। প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসে তিনি আমাদের সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিলেন। সবাইকে দুই মিনিট নিজের সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দিলেন। আমরাও একে অন্যকে জানলাম। আট মাস সুখে-দুঃখে, রোদে-বৃষ্টিতে, শীত-গ্রীষ্মে একসঙ্গে কাকুলের প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমরা সতীর্থরা নিজেদের আবিষ্কার করব। ক্লাস শেষে মেজর ভাট্টি একটি ঘোষণা দিলেন, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমাকে টার্ম সিনিয়র জেন্টলম্যান ক্যাডেটের (টিএসজিসি) দায়িত্ব পালন করতে হবে। উপলব্ধি করলাম, আমার বিশ্রামের সময় ও সুযোগ কমে গেল, অন্য ছয়টি প্লাটুনের টুকটাক খোঁজখবর রাখতে হবে, ক্যাডেটদের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে।

সকালে ড্রিল, এরপর মধ্যাহ্নভোজনের আগ পর্যন্ত একের পর এক সামরিক বিষয়ের ক্লাস। লাঞ্চের পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম, এরপরই খেলাধুলা—ফুটবল, হকি, বাস্কেট বল, বক্সিং ইত্যাদি। খেলা শেষে হাতমুখ ধুয়ে ব্যারাকে পড়ার টেবিলে বসার আগের সময়টুকু আমাদের জন্য বিভীষিকাময়। সিনিয়র ক্যাডেটরা এসে আমাদের ব্যারাকের বাইরে কঙ্কর বিছানো রাস্তায় নানা ধরনের শাস্তি প্রদান উপভোগ করেন। সারা দিন পরিশ্রমের পর এহেন উৎপাত মেজাজ বিগড়ে দেয়।

আমার মনোভাব লক্ষ করে বাঙালি সিনিয়ররা আমাকে র‍্যাগিংয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগী হলেন। ক্যাডেট এনামুল হক, শাহরিয়ার, মাহফুজ প্রমুখ পালা করে আমাকে সন্ধ্যায় সময় দিতেন। ফলে সিনিয়রদের

বিরক্তিকর হুকুম তামিল করা থেকে রক্ষা পেতাম।

এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। একাডেমির পরিবেশ আমার কাছে অসহ্য মনে হতে লাগল। স্থির করলাম, চাকরিতে রিজাইন করে ঢাকায় ফিরে যাব। এ খবর বাঙালি ক্যাডেটদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তারা পালাক্রমে এসে আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করায়। এভাবে তিন সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর কিছুটা ধাতস্থ হলাম।

মাস দুয়েক পর ১৫ ওয়ার কোর্স পাস আউট করে একাডেমি ছেড়ে গেলে আমরাই সিনিয়র হলাম। পরিস্থিতি তত দিনে অনেকটাই সহনীয় হয়ে উঠেছে। একদিন লাঞ্চের টেবিলে সামান্য কিছু মুখে দিয়েই ওয়াহিদ ভাই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রশ্ন করলাম, 'এত তাড়া কিসের?'

'একাডেমির গেটে যাচ্ছি। একটু পরই ১৭ ওয়ার কোর্সের ক্যাডেটরা আসছে। ট্যাক্সি থেকে নামার পরই ওদের পাকড়াও করে র‍্যাগিং কত প্রকার, কী কী—এসব বিষয়ে শিক্ষা দেব। তাদের টাফ করে গড়ে তুলতে হবে। আমাকে প্রথম দিন যতটুকু র‍্যাগিং করা হয়েছে, তার দশ গুণ ফিরিয়ে দেব। সিনিয়র ক্যাডেট হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে না?'

কোমরে বেল্ট লাগাতে লাগাতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন হালে সিনিয়র ক্যাডেট, সাবেক শিক্ষক।

পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি সামরিক বাহিনীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য ও পরম্পরার ধারক-বাহক। অফিসারদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাহসের ওপর মূলত সেনাবাহিনীর কার্যকারিতা নির্ভর করে। একাডেমির মূল দায়িত্ব সেনাবাহিনীর জন্য যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। পারিবারিক আবহে লালিত এক তরুণকে ভেঙেচুরে সামরিক ফর্মায় ঢুকিয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত করা কঠিন কাজ। এ কঠিন কাজকে সহজ করার জন্য প্রয়োজন মেধাবী প্রশিক্ষক। এ কারণেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে মেধাবী, চৌকস ও ব্রিলিয়ান্ট অফিসারদের প্রশিক্ষক হিসেবে পিএমএতে নিয়োগ দেওয়া হয়। একাডেমির শীর্ষ কর্মকর্তা (কমান্ড্যান্ট) ব্রিগেডিয়ার আবু বকর উসমান মিঠ্ঠা দুর্ধর্ষ কমান্ডো অফিসার হিসেবে সুপরিচিত। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল সাদুল্লাহ মৃদুভাষী, বিচক্ষণ কর্মকর্তা। কোম্পানি কমান্ডার মেজর শাহেদ জান পদাতিক রেজিমেন্ট ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের অফিসার। টিপু কোম্পানির সাতটি প্লাটুনের কমান্ডাররা দক্ষতা, স্মার্টনেস ও যোগ্যতার কারণে ক্যাডেটদের কাছে রোল মডেল। এঁদের মধ্যে মাত্র একজন বাঙালি, ক্যাপ্টেন মো. জিয়াউদ্দিন* ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুদক্ষ অফিসার। তিনি রেজিমেন্টের প্রথম

---

* পরবর্তীকালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, বীর উত্তম।

ব্যাটালিয়নে কমিশন লাভ করেন। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুট্যান্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১ম ইস্ট বেঙ্গল পাকিস্তানি বাহিনীতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড (সাহসিকতা পুরস্কার) অর্জন করেন। অ্যাডজুট্যান্ট জিয়াউদ্দিনের বুদ্ধিদীপ্ত কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সুপরামর্শের জন্যই ব্যাটালিয়ন কমান্ডার (সিও) লে. কর্নেল এ টি কে হক সিতারায়ে জুরাত পদক লাভ করেন। তিনি এককথায় গ্রন্থকীট ছিলেন, একাডেমির প্রশিক্ষকেরাই বলাবলি করতেন, ইংরেজি শিখতে হলে জিয়াউদ্দিনের কাছে যাও।

আমার প্লাটুন কমান্ডার মেজর ভাট্টি প্রশিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র ও সুদর্শন। প্লাটুন কমান্ডাররা হার্ড টাস্ক মাস্টার, কঠিনভাবে ক্যাডেটদের পরিচালনা করেন। এর মধ্যেও স্নেহ, সৌহার্দ্যের পরশে কঠিন প্রশিক্ষণও সহজসাধ্য মনে হয়। প্লাটুন কমান্ডার ভাট্টি আমাকে খুবই পছন্দ করতেন, যদিও বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

একাডেমি পাঠক্রমে বিভিন্ন সামরিক বিষয় আমাদের অধ্যয়ন করতে হয়, যেমন সামরিক ইতিহাস, ম্যাপ রিডিং সামরিক কৌশল, মিলিটারি আইন ইত্যাদি। অস্ত্রচালনা ও লক্ষ্যভেদের প্রশিক্ষণের ওপর বোধগম্য কারণেই জোর দেওয়া হয়। প্রশিক্ষকেরা প্রত্যেক ক্যাডেটকে গভীরভাবে পর্যক্ষেণ করেন, তার দোষ-গুণ ইত্যাদি মূল্যায়ন করেন। কমিশন পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয় ক্যারেক্টারের ওপর। বাংলায় চরিত্র বলতে যা বোঝায়, তার চেয়ে অনেক ব্যাপক সামরিক পরিভাষার 'ক্যারেক্টার'। সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, আনুগত্য, ভ্রাতৃত্ববোধ—অনেক গুণের সমাহার এই ক্যারেক্টার। একজন ক্যাডেট পাঠ্য বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তেমন আসে-যায় না। কিন্তু সে যদি পরীক্ষায়—নকল করা তো অনেক বড় ব্যাপার—পাশে উপবিষ্ট অপর পরীক্ষার্থীর খাতার দিকে তাকানোর চেষ্টা করে, তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কৃত হবে। যদি মিথ্যা কথা বলে ধরা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে একাডেমি থেকে বিদায়। কেউ যদি শারীরিক অসুস্থতার ভান করে ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার জন্য, পরমুহূর্তেই একাডেমি থেকে তাকে বহিষ্কার করা হবে। যুক্তি, প্রতি ক্ষেত্রে একই, ক্যারেক্টারের অভাব। সৈনিকসুলভ সততার অভাবকে সবচেয়ে বড় অযোগ্যতারূপে গণ্য করা হয় মিলিটারি একাডেমিতে। একাডেমির সামগ্রিক পরিবেশ ও ঐতিহ্যের কারণে ক্যাডেটরা পারতপক্ষে মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। মিথ্যা বলে সিনিয়রদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তেমন ক্ষেত্রেও ক্যাডেটরা সত্যি কথা বলে শাস্তির আওতায় এসেছে, এমন দৃশ্য অনেক দেখেছি একাডেমিতে।

মেধা, শারীরিক সক্ষমতা, ক্যারেক্টার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে ক্যাডেটদের

প্রশিক্ষণকালেই বিভিন্ন পদ দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন করপোরাল, সার্জেন্ট, সার্জেন্ট মেজর, আন্ডার অফিসার ইত্যাদি। সর্বোচ্চ পদবি বিএসইউও ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসার। বিএসইউও যেকোনো ক্যাডেটকে কিংবা পুরো কোর্সকে কঠিন ও দীর্ঘমেয়াদি শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ অতি কঠোর, যেহেতু শারীরিক ও মানসিক শক্তির বলেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে হয়। কাকুল একাডেমি চারদিক থেকে বিশাল উঁচু পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকায় অবস্থিত। পাহাড়ে আরোহণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, বিশেষ করে অনভ্যস্ত বাঙালিদের জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের তুলনায় বলশালী, মেশিনগানের মতো ভারী অস্ত্র বহন করে পর্বতারোহণ করা তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। বাঙালিরা এসবে অভ্যস্ত নয়। গ্রীষ্মকালে লু হাওয়া অস্থির করে তোলে, আবার প্রচণ্ড শীতে বরফে ঢেকে যায় প্রশিক্ষণ এলাকা। অনভ্যস্ত বাঙালিরা তখন হি হি করে কাঁপে। বাঙালিরা উর্দু ভাষায় দুর্বল, তাদের ভুল উচ্চারণ নিয়ে একাডেমির এনসিওরা (নন কমিশন্ড অফিসার) আড়ালে-আবডালে হাসাহাসি করে।

আউটডোর প্রশিক্ষণ মহড়াসমূহ (ট্রেনিং এক্সারসাইজ) ক্যাডেটদের কষ্টসহিষ্ণু, দৃঢ় মনোভাবসম্পন্ন করে গড়ে তোলে। ভারী অস্ত্র কাঁধে নিয়ে, পিঠে বোঁচকাবুঁচকি ও অ্যামুনিশন বহন করে উঁচু পাহাড় অতিক্রম করে বিভিন্ন সামরিক কৌশল, যেমন আক্রমণ, প্রতিরক্ষা, রেইড, অ্যামবুশ ইত্যাদি আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য হলেও; আমরা ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যাই। পাথুরে মাটিতে পরিখা খনন বিরক্তিকর পরিশ্রম হলেও, সৈনিক জীবনে এর বিকল্প নেই। কষ্টসাধ্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একজন ক্যাডেট কেমন আচরণ করে, তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি দৃশ্যমান কি না, এটা প্রশিক্ষক কাছে থেকে লক্ষ করেন। মেস টিনে নিজেই রান্না করতে হয়। চাল-ডাল ফুরিয়ে গেলে গাছের কাঁচা ফল দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি। সামরিক প্রশিক্ষণের একটি উপকারিতা, সহজে পেট খারাপ হয় না। পাহাড়ি নালার পানি থেকে শুরু করে কাঁচা ফল, সবজি, অখাদ্য-কুখাদ্য—সবকিছু সহজেই হজম হয়ে যায়।

চার মাস পর মিডটার্ম পরীক্ষা শুরু হলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ার টেবিলে কাটানোর অভ্যাস আমার কোনোকালেই ছিল না, তবু মোটামুটি উতরে গেলাম। আউটডোর-ইনডোর মহড়া এবং বিভিন্ন সামরিক বিষয়ের সার্বিক মূল্যায়নে আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। আমাকে সর্বোচ্চ পদবি (অ্যাপয়েন্টমেন্ট) ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসার (বিএসইউও) পদে নিযুক্ত করা হলো। বাঙালি ক্যাডেটরা মহাখুশি, পশ্চিম পাকিস্তানি বন্ধুরাও অভিনন্দন জানাল। এডুকেশন কোরে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত পক্ককেশধারী অফিসার দেখে কিছুটা হতাশাগ্রস্ত ছিলাম। ইউনিফর্মের শোলডারে

বিএসইউওর সোনালি বর্ডার দেওয়া লাল এপুলেট এবং কোমরে ক্রস বেল্ট পরার পর সে হতাশা অনেকটাই কেটে গেল। মিডটার্ম ব্রেকে এক সপ্তাহ পিন্ডি ও লাহোরে কাটিয়ে ফিরে এলাম কাকুলে।

ছুটির পর ক্লাস শুরু হলে দিন দুয়েক পর আমার প্লাটুন কমান্ডার মেজর ভাট্টি আমাকে তাঁর অফিসরুমে তলব করলেন। দুরু দুরু বক্ষে হাজির হলাম, তারপর কথোপকথন এ রকম :

'ইউ গুফি, তোমাকে কে বলেছে এডুকেশন কোরে যোগ দিতে?'

'স্যার, আমার আর্মি সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না।'

'আমার ধারণা, তুমি সেনাবাহিনীর ফাইটিং আর্মে ইউজফুল হবে। আমার পরামর্শ, তুমি এডুকেশন কোর থেকে ফাইটিং আর্মে ট্রান্সফার চেয়ে (সেনা সদর দপ্তরে) জিএইচকিউ-এ আবেদন করবে। কাল দরখাস্ত নিয়ে আসবে আমার কাছে, আমি সুপারিশ করে পাঠাব, যাতে তোমার আবেদন মঞ্জুর হয়।'

'রাইট স্যার,' স্যালুট করে বেরিয়ে এলাম।

মনটা খুশিতে নেচে উঠল। পরদিন দরখাস্ত টাইপ করে মেজর ভাট্টির কাছে জমা দিলাম। তিনি যথাসময়ে সুপারিশ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা সেনা সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন। মাসখানেক পর দরখাস্তের উত্তর এল। আর্ম পরিবর্তন মঞ্জুর হতে পারে এক শর্তে, আমাকে নিয়মিত কমিশন সারেন্ডার করে শর্টসার্ভিস কমিশন গ্রহণ করতে হবে। মেজর ভাট্টি বললেন, 'রাজি হয়ে যাও।'

আমি সম্মত হলাম। এক সপ্তাহ পর চিঠি এল জিএইচকিউ থেকে, আমাকে এইসি থেকে ট্রান্সফার করে যেকোনো ফাইটিং আর্মে (ইনফ্যান্ট্রি, আর্মার্ড কোর ইত্যাদি) যোগদানের জন্য ১৬তম ওয়ার কোর্সে ন্যস্ত করা হলো। বিশেষ বিবেচনায় আমার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। একাডেমির সব বাঙালি ক্যাডেট আনন্দিত হয়ে আমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়। ১ম পাক ব্যাটালিয়নের লং কোর্সভুক্ত বাঙালি ক্যাডেটরা আমাকে তাদের ক্যাফেটেরিয়ায় নৈশভোজে আপ্যায়িত করে। এখানে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো, আনন্দমুখর কিছু সময় কাটালাম। তরুণ, সুদর্শন ক্যাডেট আফতাবুল কাদেরকে* একান্তে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন আর্মিতে যোগ দিয়েছ তুমি?'

'পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে।'

কাদেরের স্পষ্ট জবাব। অবাক হয়ে তাকালাম তার চোখের দিকে, বলে কী এই তরুণ! অনুভব করলাম, সে মোটেও ঠাট্টা করছে না। উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম।

---

* ক্যাপ্টেন আফতাবুল কাদের বীর উত্তম। ১৯৭১-এর এপ্রিলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন, মহালছড়ির যুদ্ধে শহীদ হন।

আমি আর্ম পরিবর্তন করার পর এইসির সব ক্যাডেট আমার রেফারেন্স দিয়ে আর্ম পরিবর্তনের জন্য আবেদন করে। কিন্তু জিএইচকিউ কারও আবেদন মঞ্জুর করেনি। একাডেমির এইসি কোরভুক্ত প্রশিক্ষকেরা আর্ম পরিবর্তনের কারণে আমার ওপর খুবই নাখোশ হলেন। তাঁদের ধারণা, আমি তাদের কোরকে অসম্মান করেছি। এডুকেশন কোরে ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁরা আমাকে চাপ দেন। আমি বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকি।

আর্ম পরিবর্তনের পর নিজেকে প্রকৃত সৈনিক বলে মনে হলো। মেজর ভাট্টির ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কারণে এটি সম্ভব হয়েছে, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তিনিও আশ্বস্ত করলেন, কমিশন লাভের পর বিশেষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নিয়মিত কমিশন অর্জন করা সম্ভব, সেনাবাহিনীতে অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার এ পদ্ধতিতে সফল হয়েছেন। ভাবলাম আপাতত এডুকেশন কোরের একই র‍্যাঙ্কে দীর্ঘকাল চাকরি করার বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পেয়েছি।

একদিন বিকেলে ১ম পাক ও ২য় পাক ব্যাটালিয়নের ক্যাডেটদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হলো। আমি ২য় পাকের অধিনায়ক। সাদা হাফপ্যান্ট, স্পোর্টস শার্ট, পাওয়ার 'সানগ্লাস' পরা রেফারি টস করার জন্য হুইসেল বাজিয়ে আমাকে মধ্যমাঠে ডাকলেন। হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'আই এম মেজর জিয়া।* তুমি কি ২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিমে খেলেছ?'

ভাবলাম জানিয়ে দিই যে আমি পাকিস্তান জাতীয় দলের খেলোয়াড়। কিন্তু বাড়তি কথা বলা ক্যাডেটের জন্য বিপদের কারণও হতে পারে। হয়তো শুনতে হবে, 'ব্লাডি ফুল, আমাকে ইমপ্রেস করতে চাও?'

'ইয়েস স্যার, ইউনিভার্সিটি টিমে খেলেছি।'

ঢোঁক গিলে উত্তর দিলাম।

'আই এম ফ্রম ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গল, আমার ব্যাটালিয়নের ফুটবল টিম সেনাবাহিনীর চ্যাম্পিয়ন। মাইন্ড ইট।' হেসে বললেন মেজর জিয়া।

'রাইট স্যার।'

খেলার ফলাফল মনে নেই কিন্তু মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সে ঘটনা আজও স্মৃতিপটে অমলিন। একাডেমির প্রশিক্ষণ এক মূল্যবান সম্পদ, সারা জীবন কাজে লাগে। তা থেকে সামরিক জীবন সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা জন্মেছে। উপলব্ধি হলো, সৈনিকের চাকরি কোনো

---

* লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, পরবর্তীকালে সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্রপতি।

পেশা নয়, এটি এক ব্যতিক্রমী জীবনধারা, ওয়ে অব লাইফ। অন্য কোনো পেশার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। উপরন্তু কমান্ডারের আদেশ অলঙ্ঘনীয়, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও পালন করতে হয়। কমান্ডার ও অধীন সৈনিকের জীবন একই সূত্রে গাঁথা, তবে এই লয়ালিটি বা আনুগত্যের বিষয়টি একতরফা নয়। সম্পর্কটা এখানে টু ওয়ে ট্রাফিকের মতো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একে অন্যের সহযোগিতার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করা সৈনিকের ধর্ম, 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'।

দেখতে দেখতে ছয় মাস কেটে গেল। মাত্র দুই মাস পরই পাসিং আউট। কমিশন পাওয়ার পর কোন আর্মে যাব ভাবছি। মেজর ভাট্টির ইচ্ছা আমি আর্টিলারিতে তাঁর ইউনিট ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টে যোগ দিই, কিন্তু কোনো চাপ দিচ্ছেন না। কোম্পানি কমান্ডার মেজর শাহেদ জান একদিন তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি কমিশন পেয়ে আমার ইউনিট ১ম ফ্রন্টিয়ার কোর্সে যোগ দেবে। আমি এ ব্যাটালিয়নের সিওকে ইতিমধ্যেই বলে রেখেছি।'

তাঁর বক্তব্য আমার মনঃপূত হলো না।

'স্যার, চেষ্টা করব।' বলে অফিস কক্ষ থেকে বের হলাম।

কিছুদিন পর ৩৯তম লং কোর্সের পাসিং আউট দেখার জন্য একাডেমির প্যারেড গ্রাউন্ডে গেলাম। প্যারেড শেষে গাড়িতে উঠব, এ সময় আমাকে ডাকলেন মেজর জিয়াউর রহমান, 'বিএসইউও, কাম হিয়ার।'

আমি সামনে গিয়ে স্যালুট করলাম। এবার পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'শোনো, শিগগিরই তোমাদের চয়েস (পছন্দ) চাওয়া হবে আর্ম ও ইউনিট সম্পর্কে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাঙালিদের ভবিষ্যৎ। তুমি ইস্ট বেঙ্গল ও ফার্স্ট ব্যাটালিয়ন তোমার চয়েস হিসেবে জানিয়ে দেবে। ওকে?'

'রাইট স্যার।' দৃঢ়ভাবে জানালাম।

জিয়ার বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হলাম। প্রশিক্ষকেরা ক্যাডেটদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্কস্বরূপ। সেখানে তিনি কাছে ডেকে বাংলায় উপদেশ দিচ্ছেন আন্তরিকভাবে, মুগ্ধ হয়ে গেলাম। স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, পাসিং আউটের পর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে গড়া ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টেই যোগ দেব।

পাসিং আউটের দিন ঘনিয়ে এল। একদিন ক্লাসের মধ্যেই কোম্পানি কমান্ডার মেজর শাহেদ জান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাফিজ, তুমি কোন আর্মে বা রেজিমেন্টে যেতে চাও?'

'স্যার, আমি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যেতে চাই।'

'হোয়াই?'

মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'বিকজ, আই অ্যাম ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল।' শাহেদ জান

মহা বিরক্ত। তিনি আশা করেছিলেন আমি ফ্রন্টিয়ার ফোর্সে যাব। কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'ইউ আর প্যারোকিয়াল। সেনাবাহিনী প্রাদেশিকতায় বিশ্বাস করে না। আমি নিশ্চিত করব তুমি অর্ডিন্যান্স কিংবা সাপ্লাই কোরে (এএসসি) যাবে।' পুরো ক্লাস হতভম্ব। হতাশায় ছেয়ে গেল মন।

কাকুলে আমাদের অবস্থানের মেয়াদ শেষের দিকে। পাসিং আউট প্যারেডের রিহার্সাল চলছে প্রতিদিন। একদিন চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হলো। সেরা ক্যাডেটের পুরস্কার সি-ইন-সি'স কেইন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিএসইউওকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। আমাদের কোর্সে এটি দেওয়া হলো বিজেইউও মুনাওয়ারকে। দুই শতাধিক ক্যাডেট কমিশন পেল, সম্মিলিত মেধাতালিকায় আমি ২য় স্থান পেলাম। কেইন না পাওয়ায় মনটা খারাপ হলো, বাঙালি ক্যাডেটরা আমার চেয়েও বেশি দুঃখ পেল।

৩০ নভেম্বর আমাদের কোর্সের পাসিং আউট প্যারেড যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হলো। আমি প্যারেড কমান্ডার। মার্চপাস্টে সালাম নিলেন লে. জেনারেল টিক্কা খান, যিনি বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত ছিলেন।

আট মাসের কঠিন প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আবার স্বাভাবিক জীবনের মুক্ত বাতাসে পরিচিতজনের সান্নিধ্যে ফিরে আসব ভেবে দিন গুনছি। আমি লিখিতভাবে পছন্দ জানালাম, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন, যারা সিনিয়র টাইগার্স নামে সুপরিচিত। পাসিং আউট ক্যাডেটদের তালিকায় প্রথম তিনটি স্থান অধিকারীদের চয়েস সেনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে থাকে। এ কারণেই আমি আমার পছন্দের রেজিমেন্টে পোস্টিং পেলাম। কমিশনপ্রাপ্ত বাঙালিরা সবাই প্রথম পছন্দ হিসেবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের কোর্সে মাত্র একজন, অর্থাৎ আমি এ রেজিমেন্টে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলাম।

ক্যাডেটরা কে কোন আর্ম বা সার্ভিসে যাবে, জানিয়ে পোস্টিংয়ের তালিকা যথাসময়ে প্রকাশ করা হলো। আমার ইউনিট ১ম ইস্ট বেঙ্গল যশোর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছে। ট্র্যাডিশন অনুযায়ী একাডেমির প্রশিক্ষকেরা নিজ রেজিমেন্টে বা কোরে পোস্টিংপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের অ্যাবোটাবাদের রেস্টুরেন্টে নিয়ে ওয়েলকাম ডিনারে আপ্যায়ন করেন। পাসিং আউটের চার দিন আগে ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন আমাকে ডেকে বললেন, 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তুমি একমাত্র যোগদানকারী। তোমাকে কোনো রেস্টুরেন্টে নেব না। তোমাকে অন্য জায়গায় আপ্যায়ন করা হবে। কাল বিকেলে তৈরি হয়ে থাকবে। আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

'রাইট স্যার।' জানিয়ে দিলাম।

পরদিন বিকেলে একটি কার নিয়ে এসে আমাকে পিকআপ করলেন

ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন আব্বাস হায়দার (ইস্ট বেঙ্গল)। ১৫ মিনিট পর আমরা এসে নামলাম কাকুলের এক টিলার ওপর অবস্থিত বাংলো টাইপ বাড়ির পোর্টিকোতে। বেল টিপতেই দরজা খুলে দিলেন মেজর জিয়াউর রহমান, বললেন, 'ওয়েল কাম টু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, কাম ইন।'

ড্রয়িংরুমে গদি আঁটা সোফায় বসেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। আগেই বলেছি, একাডেমির প্রশিক্ষকেরা ক্যাডেটদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। অথচ আজ তিনজন প্রশিক্ষক হোস্ট আর আমি একমাত্র গেস্ট, অবস্থা সঙিন বটে। আমি ক্যাডেট, কথা শুনেই অভ্যস্ত, মাঝেমধ্যে ইয়েস স্যার, রাইট স্যার, অফকোর্স স্যার—এতেই আমার জবাব সীমাবদ্ধ। সেখানে হোস্টরা আমাকে বলছেন, 'রিলাক্স ম্যান। তুমি আর ক্যাডেট নও, একজন অফিসার। সো, এনজয় ইউরসেলফ।'

একটু পরই নাশতার ট্রে ঠেলে নিয়ে এলেন বেগম জিয়াউর রহমান।* জানালার ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের নরম আলো ঘরে প্রবেশ করছিল। সে কনে দেখা আলোতে ২৫ বছর বয়সী বেগম জিয়াকে দেখে বিস্ময়াবিভূত হলাম। বাঙালিদের মধ্যে এমন সুশ্রী নারী খুব কমই দেখা যায়। তিনি সুস্বাদু সেসব খাবার খেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু অফিসারদের উপস্থিতিতে টেবিল ম্যানার বজায় রেখে আমি স্বচ্ছন্দে খেতে পারছিলাম না। হোস্টরা আমাকে বেশি করে খাওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন কিন্তু আমি জড়তা কাটাতে পারছি না। আমার চুলের বাটি ছাঁট আর 'ইয়েস স্যার', 'রাইট স্যার' শুনে স্বল্পবাক বেগম জিয়া মুচকি মুচকি হাসছিলেন। জিয়া আমাকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সম্পর্কে ধারণা দিলেন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে তিনি ১ম ইস্ট বেঙ্গলে আলফা কোম্পানির কমান্ডার ছিলেন। যুদ্ধে এই ব্যাটালিয়ন বেদিয়ান সেক্টরে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে বাঙালিদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। বাসাটা থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। জিয়াউদ্দিন ও আব্বাস গাড়ি করে আমাকে ব্যারাকে পৌঁছে দিলেন।

কমিশন লাভের পর ১০ দিনের ছুটি পেলাম। ১ ডিসেম্বর প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে রুক্ষ পাহাড়ঘেরা কাকুল উপত্যকাকে বিদায় জানিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করলাম। আমার ব্যাটম্যান আকবর খান নিকটবর্তী পাহাড়ের ঝুপড়িতে বসবাস করে। সজল চোখে সে আমাকে বিদায় জানাল, 'স্যার, আপ জেয়ছা কভি নেহি মিলেগা (আপনার মতো কাউকে পাব না)। খোদা হাফেজ, ফি আমানিল্লাহ।'

---

* খালেদা জিয়া, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

কমিশন পেলাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে

পিন্ডি থেকে লাহোরগামী ট্রেনের তাপানুকূল কামরায় বসে ভাবছি একাডেমিতে কাটানো দিনগুলোর কথা, কত দ্রুত বয়ে গেল সময়। সামনে এক নতুন জীবন, ক্যান্টনমেন্টে যাপিত জীবন। পিএমএ একজন তরুণকে ভেঙেচুরে নতুন ফর্মায় ফেলে নিজের মতো করে গড়ে নেয়। আমি কি বদলে গেছি?

আমি ছেলেবেলা থেকেই কিছুটা গোবেচারা টাইপের। মাঠে খেলাধুলা কিংবা হলের বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, এই ছিল আমার গতানুগতিক জীবন। কোনো মেয়েবন্ধু ছিল না। জীবনে কাউকে একটা ধমক দিইনি। একাডেমি আমার মতো জুনিয়র ক্যাডেটকে ইংরেজিতে ফৌজি গালি দিয়ে শাস্তি দিতে শিখিয়েছে। ব্লাডি ফুল, ডাবল আপস্টার্ট রোল ফ্রন্ট! আমার আদেশ শোনামাত্র একজন হামাগুড়ি দিচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। এতে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। ছিলাম মুখচোরা, স্বল্পবাক, জীবনে কখনো কোথাও বক্তৃতা দিইনি। একাডেমির পাবলিক স্পিকিং ক্লাসে বক্তৃতা দিতে দিতে এ-সংক্রান্ত জড়তা কেটে গেছে। যেকোনো পরিবেশে কিংবা সামরিক সমাবেশে বক্তৃতা দিতে স্বচ্ছন্দ অনুভব করি। জীবনে কারও সঙ্গে মারামারি করিনি, অথচ এখন বক্সিং করি, বেয়োনেট ফাইটিং করি। শত্রুনিধনে সদা প্রস্তুত। একাডেমি আমার মধ্যে লড়াই করার মানসিকতা সৃষ্টি করেছে। হাঁটার অভ্যাস কোনোকালেই ছিল না। স্কুল-কলেজে রিকশারোহী, বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটরবাইক নিত্যসঙ্গী। একাডেমি আমাকে পাহাড়ি পথে বোঝা কাঁধে নিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়ে কষ্টসহিষ্ণু করে তুলেছে। এখন হাঁটা আমার জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। ঢাকা থেকে বরিশাল ইচ্ছা করলে হেঁটেই যেতে পারি, এ আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। একাডেমি অবশ্যই আমাকে অনেক বদলে দিয়েছে। লাজুক, মুখচোরা, আত্মমগ্ন এক যুবককে আত্মবিশ্বাসী যোদ্ধায় পরিণত করেছে মাত্র আট মাসে। থ্যাংক ইউ পিএমএ।

২ ডিসেম্বর '৬৮ বিকেলে ঢাকায় এসে নামলাম। সবকিছুই আগের মতো। একসময়কার রুমমেট এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনোয়ার মাহমুদ ইউনাইটেড ব্যাংকের কর্মকর্তা। সে বিমানবন্দরে এসে আমাকে স্বাগত জানিয়ে তার মোহাম্মদপুরের বাসায় নিয়ে গেল। পরদিন বরিশালে গেলাম পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এবার আব্বাকে খুশি মনে হলো। অন্যরাও প্রায় এক বছর পর আমার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আনন্দিত। সরকারের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্যে সেনা অফিসারদের বেতন স্কেল সর্বোচ্চ, সুযোগ-সুবিধাও

তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রলম্বিত সামরিক শাসনের কারণে সামাজিক পরিমণ্ডলেও তাদের কদর বেড়েছে বলে মনে হলো।

বাঙালিদের পরম আরাধ্য ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশন পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। এই রেজিমেন্টের সৈনিকেরা সবাই বাঙালি, অফিসারদের গড় অনুপাত বাঙালি ৫০ শতাংশ, পশ্চিম পাকিস্তানি ৫০ শতাংশ। ১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ আর্মির পাইওনিয়ার কোরের দুটি কোম্পানির বাঙালি সৈনিকদের সমন্বয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১ম ব্যাটালিয়ন (৭০০ সৈনিক) গঠন করা হয়। ব্যাটালিয়নের প্রথম কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লে. কর্নেল ভি জে ই প্যাটারসন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কুমিল্লার অধিবাসী ব্রিটিশ আর্মির কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন আবদুল গনি। বাঙালিরা যোদ্ধা জাতি নয়, এরকম একটি প্রচারণা অনেক বছর ধরেই চলে আসছিল। সুতরাং এ রেজিমেন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে পশ্চিমাদের মনে সংশয় ছিল। '৬৫ সালের যুদ্ধে বেদিয়ান সেক্টরে অতুলনীয় শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে ১ম ইস্ট বেঙ্গল বাঙালিদের মুখ উজ্জ্বল করে। পাঞ্জাবিদের বিরূপ সমালোচনাও তাতে বন্ধ হয়। জন্মলগ্ন থেকেই ট্রেনিং, খেলাধুলা—সব ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানি রেজিমেন্টসমূহ, যেমন বালুচ, পাঞ্জাব, ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ইউনিটসমূহের সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গলের অলিখিত দ্বন্দ্ব চলে আসছে। বাঙালি অফিসাররা এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে।

১১ ডিসেম্বর ১৯৬৮ যশোর সেনানিবাসে আমার যোগদানের নির্ধারিত তারিখ। তার এক দিন আগেই, অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর শীতের এক মনোরম বিকেলে আমি ঢাকা থেকে ট্রেনযোগে যশোরে পৌঁছালাম। স্মার্ট উর্দি পরা একজন হাবিলদার একটি ডজ গাড়ি নিয়ে রেলস্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। প্রথমবারের মতো আমার এ সেনানিবাসে আগমন। উৎসুক দৃষ্টি মেলে সৈনিকদের কার্যক্রম, খেলাধুলা দেখতে দেখতে পিচঢালা পথ বেয়ে সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে আমি অফিসার মেসে এসে নামলাম। রমজান মাস চলছিল। ভ্রমণের কারণে আমি রোজা রাখিনি সেদিন। যশোর বিমানবন্দরের রানওয়ে ঘেঁষে অবস্থিত ১ম ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার মেস। ইটের দেয়ালের ওপর টিনশেড, বাংলো প্যাটার্নের সুরম্য ভবন। সৈনিক জীবনে মেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অফিসারদের মিলনমেলা ও বিনোদনের কেন্দ্র এই মেস।

সেনাবাহিনীর, বিশেষ করে ফাইটিং আর্ম, অর্থাৎ পদাতিক ও সাঁজোয়া রেজিমেন্টের অফিসার মেস হয় খুবই সমৃদ্ধ। ব্রিটিশ আমলের পুরোনো ব্যাটালিয়ন কিংবা রেজিমেন্টের মেসগুলো এমনিতেই সুসজ্জিত। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং অন্যান্য অভিযানের স্মারক ট্রফি, মেডেল, দামি সিলভারের উপঢৌকনসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে এসব মেসে প্রদর্শিত হয়। মেসের

নিয়মকানুন, এটিকেট সবার জন্য অবশ্যপালনীয়। সিনিয়র ক্যাডেটরা পিএমএতেই জুনিয়রদের মেস এটিকেট সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে। কাঁটাচামচ ব্যবহার ও ডাইনিংরুমে পালনীয় নিয়মকানুন সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়। ১ম ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার মেস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। '৬৫-র যুদ্ধের পর পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ১ম ইস্ট বেঙ্গলকে উচ্চ মানের বিদেশি সিলভারের তৈরি বেশ কয়েকটি ট্রফি উপঢৌকন দিয়েছিল। ঢাকার তৎকালীন নবাব পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক মূল্যবান উপহার দেন, যা মেসের শোভা বর্ধন করে। '৬৫-র যুদ্ধকালীন সময়ের ফিল্ড মেস ও যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক ফটোগ্রাফসংবলিত চারটি বড় অ্যালবাম সযত্নে রক্ষিত আছে।

অফিসার মেসের সামনে সবুজ লনের এক প্রান্তে আমগাছের নিচে ডেক চেয়ার পেতে গল্প করছেন পাঁচজন অফিসার। অ্যাডজুট্যান্ট লে. গোলাম সরোয়ার, লে. নাজির, লে. ইকরাম, কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপ্টেন সাজিদ মনসুর এবং একজন বহিরাগত ইনটেলিজেন্স অফিসার মেজর আওরঙ্গজেব। মনসুর ছাড়া সবাই পাঞ্জাবি। আমি কাছে গিয়ে তাঁদের অভিবাদন জানালাম। তাঁরা আন্তরিকভাবে আমাকে স্বাগত জানালেন, 'ওয়েলকাম টু সিনিয়র টাইগার্স।' তাঁরা সবাই রোজাদার, ইফতারির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি রোজা রাখিনি শুনে অ্যাডজুট্যান্ট আমার জন্য চায়ের অর্ডার দিলেন মেস ওয়েটারকে। রোজাদারদের সামনে চা পান করা রীতিমতো বেয়াদবি, তাই চায়ের প্রয়োজন নেই জানালাম। কিন্তু তাঁরা জোর করে আমাকে চা পান করালেন। বললেন, এতে তাঁদের ইমান আরও মজবুত হলো। আমার জড়তা কাটানোর জন্য গল্পসল্প করতে লাগলেন। বললেন, 'তুমি এখন ক্যাডেট নও, অফিসার। রিল্যাক্স অ্যান্ড এনজয়।' তাঁদের আন্তরিক ব্যবহারে আমার সব টেনশন উধাও হলো। উপলব্ধি হলো, আগামী দিনগুলো ভালোই কাটবে এঁদের সান্নিধ্যে।

লনে বসে সবার সঙ্গে ইফতার করার পর বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে আমার জন্য নির্ধারিত রুমে প্রবেশ করি। আমার ব্যাটম্যান সেপাই রফিক ইতিমধ্যে আমার বিছানা, কাপড়সহ যাবতীয় সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখেছে। খাকি ইউনিফর্ম কড়া ইস্তিরি করা আর বুট ঝকঝকে পলিশ করে রেখেছে। আমার রুমটি বেশ বড়সড়। আগের বাসিন্দা ক্যাপ্টেন মাহমুদুল হাসান* ইনফ্যান্ট্রি স্কুলে প্রশিক্ষকরূপে নিয়োগ পেয়ে সপ্তাহখানেক আগে কোয়েটায় চলে গেছেন। তাঁর হবি ছিল পাখি শিকার, চেস্ট ড্রয়ার খুলে দেখি .২২ বোরের অসংখ্য গুলির খোসা। মেস ওয়েটারকে সাহ্‌রির জন্য খাবারের অর্ডার দিয়ে

* পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল।

শুয়ে পড়লাম। অ্যাডজুট্যান্ট এক ফাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন, পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় আমাকে শর্ট রেঞ্জে সৈনিকদের রাইফেল ফায়ারিংয়ে বাট অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এখানে আসার পর চমৎকার কিছু সময় কাটানোর সুখস্মৃতি ধারণ করে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

১১ ডিসেম্বর ১৯৬৮, সামরিক বাহিনীতে আমার প্রথম কর্মদিবস। সকাল সাতটায় উর্দি পরে অফিসার মেস থেকে বেরিয়ে পল্টনের অফিসের উদ্দেশে হেঁটে যাত্রা করলাম। ৬০০ গজ দূরত্বে আমাদের অফিস এলাকা, কাছাকাছি যেতেই একজন হালকা-পাতলা গড়নের জেসিও (জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার) স্মার্টলি স্যালুট করে পরিচয় দিলেন, 'স্যার, ম্যায় সুবেদার মেজর আজিম খান সিতারায়ে জুরাত। আপকো খোশ আমদেদ।'

ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকেরা বাঙালি হলেও তাদের সঙ্গে উর্দুতে কথা বলতে হয়। জওয়ানদের ভাষা উর্দু এবং অফিসারদের জন্য ইংরেজি—এটাই সামরিক বাহিনীর নিয়ম। আমাদের সৈনিকদের উর্দু বলা শুনে অবাঙালিরা হাসাহাসি করত। বিচিত্র তাদের উচ্চারণ! সুবেদার মেজর নন-কমিশন্ড সৈনিকদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সৈনিকদের বিষয়ে কমান্ডিং অফিসারের (সিও) প্রধান পরামর্শক।

অফিস ঘেঁষে ইটবিছানো সড়ক পেরিয়ে দুই শ গজ পূর্বে 'শর্ট ফায়ারিং রেঞ্জ'। একটি কোম্পানি তাজা অ্যামুনিশন (গুলি) ফায়ার করে পিচবোর্ডের তৈরি মনুষ্য আকৃতির টার্গেটে লক্ষ্যভেদের জন্য প্রস্তুত বলে জানালেন সিনিয়র জেসিও। লাইভ এমু ফায়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সবাইকে সতর্ক থাকতে হয়, যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। একটানা পাঁচ ঘণ্টা ফায়ারিং পরিচালনা করার পর মধ্যাহ্নভোজের জন্য বিরতি দেওয়া হলো। রেঞ্জেই পরিচয় হলো বি কম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন সাইদ আখতার হোসাইনির সঙ্গে। জাতে পাঞ্জাবি কিন্তু গায়ের রং আমার চেয়েও কালো। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, কালো ব্রাহ্মণ এবং সাদা চণ্ডাল বিপজ্জনক, এদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখবে। অবশ্য হোসাইনিকে দিলদরিয়া টাইপ বলেই মনে হলো। তাঁর একটা বদভ্যাস পরবর্তীকালে লক্ষ করেছি, সাংঘাতিক ঘুমকাতুরে। সপ্তাহে এক দিন ছুটি রোববার, বাকি ছয় দিন কর্মদিবস। হোসাইনি শনিবার গেমসের পর সন্ধ্যায় মেসে ফিরে গোসল করেই বিছানায় আশ্রয় নেন। গাত্রোত্থান করেন সোমবার ভোরে সাড়ে ছয়টায় ফল ইনের (প্যারেডের জন্য একত্র) পূর্বক্ষণে। মাঝখানে নো ডিনার, শনিবারে নো ব্রেকফাস্ট, নো লাঞ্চ, রাতে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় একটা কিছু মুখে দিয়েই আবার ঘুম। সোমবার প্রত্যুষে ব্যাটম্যানের ক্রমাগত তাগাদার কারণেই কষ্টকর জাগরণ!

শর্ট রেঞ্জে দায়িত্ব পালনের পর পল্টনের অফিস এলাকায় ফিরে এলাম।

পদাতিক ব্যাটালিয়ন (পল্টন) ৭০০ সৈনিক নিয়ে গঠিত, ১৭ জন অফিসারসহ। ব্যাটালিয়নে চারটি রাইফেল কোম্পানি এবিসি এবং ডি ও একটি হেডকোয়ার্টার কোম্পানি থাকে, কোম্পানির জনবল ১৩০। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ব্যক্তি থাকে, যেমন পাচক, সুইপার, আর্মোরার ইত্যাদি। পদাতিক বাহিনীর প্রধান অস্ত্র রাইফেল, সাবমেশিনগান, লাইট মেশিনগান (এলএমজি) এবং হেভি মেশিনগান (এইটএমজি)। এ ছাড়া রয়েছে ছটি ৩ ইঞ্চি মর্টার।

১ম ইস্ট বেঙ্গলে সেদিন কর্মরত ছিলেন লে. কর্নেল জায়েদি কমান্ডিং অফিসার (সিও), মেজর কাজী গোলাম দস্তগীর*সহ অধিনায়ক (টুআইসি), মেজর আবদুস সামাদ** 'এ' (আলফা) কোম্পানির কমান্ডার, ক্যাপ্টেন হোসাইনি 'বি' (ব্রাভো) কোম্পানি কমান্ডার, লে. সানোয়ার হুদা 'সি' (চার্লি) কোম্পানি কমান্ডার, মেজর ফজল করিম 'ডি' (ডেল্টা) কোম্পানি কমান্ডার। লে. মো. ইকরাম কোম্পানি অফিসার ডেল্টা, লে. মো. নাজির কোম্পানি অফিসার ব্রাভো, লে. গোলাম সরওয়ার অ্যাডজুট্যান্ট, ক্যাপ্টেন সাজিদ মনসুর কোয়ার্টার মাস্টার। এদের মধ্যে চারজন বাঙালি দস্তগীর, সামাদ, সানোয়ার ও মনসুর।

মেজর ফজল করিম এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। ইতিমধ্যে সুপারসিডেড (প্রমোশনবঞ্চিত)। পরিবার রেখে এসেছেন পাঞ্জাবের এক গ্রামে। পরিবারের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে ক্ষীণ যোগাযোগ। পেশার প্রতি কোনো আগ্রহ অবশিষ্ট নেই, অবসরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁর প্রধান কাজ (একমাত্র বলা যায়) সারা দিন মদ্যপান। অফিসার মেসে ট্যাক্স ফ্রি সুরা স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়, এ কারণেই অফিসারকুল মদ্যপানে অভ্যস্ত। পানাভ্যাস না থাকলে অফিসারকে কেউ কেউ আনস্মার্ট ভাবেন ইসলামিক রিপাবলিক পাকিস্তানে। মেজর ফজল করিম অত্যন্ত সহজ-সরল দয়ালু ব্যক্তি। অফিসার ও অন্যান্য র‍্যাঙ্কের সৈনিকদের সঙ্গে মোলায়েম বা স্নেহের সুরে কথা বলেন, কাউকে কড়া কথা বলা তাঁর সাধ্যের অতীত। দুই পেগ পেটে পড়লেই দার্শনিকসুলভ উক্তি করেন।

পদাতিক বাহিনীর প্রাণপুরুষ কমান্ডিং অফিসার। লে. কর্নেল জায়েদি উত্তর প্রদেশ থেকে আসা মোহাজির পরিবারের সদস্য। মৃদুভাষী, নরম প্রকৃতির সাধারণ মানের অফিসার, পল্টন পরিচালনার দায়িত্ব টুআইসি মেজর দস্তগীরের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছেন। মেজর দস্তগীর স্টাফ কলেজের স্নাতক, ব্রিলিয়ান্ট অফিসার। সামরিক বিষয়ে সর্ববিদ্যাবিশারদ। অফিসারদের

---

* পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল, রাষ্ট্রদূত।

** পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল।

কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। সামনে পড়লেই জটিল সব প্রশ্ন করেন, যার উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। শীতকালীন প্রশিক্ষণ মহড়ার সময় পুরো পল্টন সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন করা হয়। দস্তগীর পশ্চিম পাকিস্তান অফিসারদের ব্রিফ করেন, 'তোমরা এ এলাকায় যুদ্ধ করতে এসেছ, এখানকার ভাষা শিখতে হবে। প্রকৃতি, গাছপালা ইত্যাদি চিনতে হবে। আমি মাঝেমধ্যে তোমাদের পরীক্ষা নেব এসব বিষয়ে।'

আতঙ্কিত পাঞ্জাবি অফিসাররা গ্রামের গাছপালার নাম মুখস্থ করা শুরু করে। আমাকে দেখলেই একটি বৃক্ষ দেখিয়ে বলে, 'ইয়ার হাফিজ, ইছ দারাখ্‌ত কা নাম কেয়া হ্যায়? (এ গাছের নাম কী?)'

আমি শহরে বড় হয়েছি। নিজেই অনেক গাছের নাম জানি না!

'স্যার, মুঝে মালুম নেহি' (আমি জানি না), আমার উত্তর।'

'ইয়ার জলদি পাতা করো, টুআইসি (দস্তগীর) আ রাহা হায়।' (শিগগির জেনে নাও, টুআইসি এসে পড়বে।)

পল্টনের সিও লে. কর্নেল জায়েদি একটু আত্মভোলা টাইপের। মিলিটারি বিয়ারিংয়ের (চালচলন) ঘাটতি রয়েছে। স্বল্প সময়ে ইন্টারভিউ নিলেন প্রথম দিনেই। একাডেমি থেকে প্রত্যেক ক্যাডেট সম্পর্কে শর্ট রিপোর্ট পাঠানো হয় তাঁর ইউনিটে। আমার রিপোর্ট পড়ে খুশি হয়েছেন বলে ধারণা হলো। তৃতীয় দিনেই আমাদের ইউনিট পরিদর্শনে এলেন ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্সের (আইএসআই) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আকবর খান। আমরা অফিসাররা এক সারিতে দাঁড়িয়েছি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য। টেনশনের কারণে সিও আমাদের তিন-চারজনের নাম মনে করতে পারছেন না, কয়েকবার মুখস্থ করেও। গাড়ি থেকে নেমেই জেনারেল আকবর প্রেজেন্টেশন লাইনের দিকে এগিয়ে এলেন, প্রথমেই জুনিয়র মোস্ট আমি, তারপর সিনিয়রিটি অনুযায়ী অন্য সাতজন। সিও একে একে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমি স্যালুট করে হ্যান্ডশেক করতেই জানালেন, 'এ হচ্ছে সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হানিফ, পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়। আমার পরই লে. নাজির, তার পরিচয় দিলেন 'স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়ন অব হাভেলিয়া। নাজিরের বাড়ি অ্যাবোটাদের পার্শ্ববর্তী ছোট শহর হাভেলিয়াতে।'

দুজন পরে দণ্ডায়মান ক্যাপ্টেন সাজিদ মনসুরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ন্যাশনাল শুটিং চ্যাম্পিয়ন।'

জেনারেল বললেন, 'ওয়ান্ডারফুল, তোমার পল্টনে এতজন টপ ক্লাস জাতীয় পর্যায়ের স্পোর্টসম্যানের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

লে. নাজির একটু হাঁদারাম টাইপের। আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'হাফিজ, স্কোয়াশ কেয়া চিজ হ্যায়? (স্কোয়াশ জিনিসটা কী?)'

'এটি একটি খেলা, নিয়মকানুন পরে জানাব।'

পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত ক্রিকেটারের নাম হানিফ মোহাম্মদ, সিও তার সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। ক্যাপ্টেন মনসুরের চট্টগ্রাম নিবাসী মা রাইফেল শুটিংয়ের এক ইভেন্টে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, টেনশন আক্রান্ত সিও মনসুরকেই চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে দিলেন!

আমাকে আলফা কোম্পানির কোম্পানি অফিসাররূপে পদায়ন করা হলো। মেজর সামাদ আমার কোম্পানি কমান্ডার, অত্যন্ত রাগী টাইপের অফিসার। পেশাগতভাবে দক্ষ, সে দক্ষতা জুনিয়রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সদা আগ্রহী। পান থেকে চুন খসলেই জুনিয়রের খবর হয়ে যায়।

খেলোয়াড়ের আলাদা কদর সেনাবাহিনীতে

আমি পল্টনে যোগ দেওয়ার সাত দিন পরই ১৮ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে বার্ষিক এক্সারসাইজ শীতকালীন কালেক্টিভ ট্রেনিং। দুই মাসব্যাপী এ ট্রেনিং চলবে যশোর-কুষ্টিয়ার পাকিস্তান-ভারত সীমান্তের গ্রামাঞ্চলে। এ প্রশিক্ষণকালে অফিসারদের, বিশেষ করে জুনিয়রদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে অধীন সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ মহড়ায় দিনের পর দিন ঘাম ঝরাতে হয়। যশোর ক্যান্টনমেন্টের অফিসাররা বলাবলি করতে লাগলেন, 'হাফিজের কপালটাই খারাপ। পিএমএতে আট মাস রগড়া খেয়ে এতটুকু বিশ্রাম পেল না, পল্টনে যোগ দিতে না-দিতেই ওকে ছুটতে হবে কালেক্টিভ ট্রেনিংয়ে। মেজর দস্তগীর ওর শরীরের সব রস বের করে নেবেন।'

মেজর সামাদ বলেই ফেললেন এক্সারসাইজের আগের দিন 'তোমাকে তো একটু বাজিয়ে নিতে হবে হে। দেখব পিএমএ তোমাকে কী শিখিয়েছে। কাল সকালে পিট্টু (প্যাক ০৮, পিঠে বহনযোগ্য ভারী ব্যাগ) পরে প্রস্তুত হয়ে এসো।'

আমি মনে মনে হাসলাম। আগেই জানা ছিল, এই ট্রেনিং এক্সারসাইজে আমাকে যেতে হবে না। কারণ, ২৫ ডিসেম্বর থেকে লাহোরে শুরু হচ্ছে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। এতে সেনাবাহিনী অংশগ্রহণ করবে, পুরো টিম আমার আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। টিমের দুজন বাঙালি খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ ও ক্যাপ্টেন মাহমুদ হাসান আমাকে ইতিমধ্যেই চিঠি লিখে জানিয়েছে যে আমাকে পল্টন থেকে রিলিজ করার জন্য

জিএইচকিউ অর্থাৎ সেনা সদর দপ্তর থেকে ঢাকায় ১৪তম পদাতিক ডিভিশনে অতি জরুরি সিগন্যাল মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। ওবায়েদ ও হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দুই বছর জুনিয়র হলেও একই টিমে খেলার সুবাদে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি যশোরে কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ অপেক্ষা করছি সিগন্যালের জন্য। ১৭ ডিসেম্বর বিকেলে জিএইচকিউ থেকে সিগন্যাল মেসেজ এল যশোর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে সেকেন্ড লে. হাফিজকে অবিলম্বে লাহোরে পাঠিয়ে দিতে। পুরো ক্যান্টনমেন্টে হুলস্থুল পড়ে গেল সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের জন্য জিএইচকিউ থেকে সিগন্যাল, টক অব দ্য টাউন! অ্যাডজুট্যান্ট সন্ধ্যার আগেই আমাকে মুভমেন্ট অর্ডার দিয়ে রিলিজ করে দিলেন। আমি পরদিন সকালের যশোর-ঢাকা-লাহোর এয়ার টিকিট কনফার্ম করলাম।

১৮ ডিসেম্বর সকাল সাতটায় পুরো পল্টন বিগ প্যাক পরে প্যারেড গ্রাউন্ডে সমবেত হয়েছে শীতকালীন কালেক্টিভ ট্রেনিংয়ে যাত্রার উদ্দেশ্যে। আমি আমার কোম্পানিকে বিদায় জানানোর জন্য সিভিল ড্রেসে প্যারেড স্কয়ারের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মেজর সামাদ আমাকে দেখে মহা বিরক্ত, জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্লাডি চ্যাপ, সিভিল ড্রেসে এসেছ কেন, তোমার বিগ প্যাক কই?'

'স্যার, হাফিজের জন্য জিএইচকিউ থেকে সিগন্যাল এসেছে। সে লাহোর যাচ্ছে দুপুরের ফ্লাইটে,' জানাল অ্যাডজুট্যান্ট সরোয়ার। সামাদ খুবই হতাশ হলেন, বাঘের মুখ থেকে কেউ শিকার কেড়ে নিলে যে অবস্থা হয়, তাঁর তেমনটি হয়েছে। বললেন, 'বড় বাঁচা বেঁচে গেলে হে।' মনের দুঃখে স্বগতোক্তি করলেন, 'হোয়াট দ্য হেল। আমরা সবাই হাওরে-জঙ্গলে যাচ্ছি স্ক্রিউড (ধর্ষিত) হতে আর কেউ শালিমার বাগে (লাহোর) যাচ্ছে আয়েশ করতে।'

খেলোয়াড়দের কদর আছে সেনাবাহিনীতে। পল্টনের সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন। মেজর দস্তগীর বললেন, 'আর কত খেলবে হে, এবার প্রফেশনে মনোযোগ দাও।' এঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যশোর বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম এবং সন্ধ্যার আগেই লাহোর পৌঁছে গেলাম।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সেনাবাহিনী দল লাহোর ক্যান্টনমেন্টে ক্যাম্প করেছে। ক্যাপ্টেন ওবায়েদ ও মাহমুদ হাসান আর এ বাজার এলাকায় অবস্থিত ইএমই অফিসার মেসে অবস্থান করছে। আমিও সেখানে তাদের সঙ্গী হলাম। আমাকে পেয়ে তারা খুবই উল্লসিত, প্রায় দুই বছর পর তাদের সঙ্গে দেখা। আর্মিতে তারা আমার সিনিয়র। তারা সিনিয়র ক্যাপ্টেন আর আমি সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত ২/লেফটেন্যান্ট। কিন্তু তারা আমাকে ছাত্রজীবনের সিনিয়র হিসেবে সম্মান দেখাচ্ছে, বলে, 'হাফিজ ভাই, আমাদের আগের মতোই নাম ধরে ডাকবেন।' আর্মির জিপে সিনিয়র অফিসার ড্রাইভারের পাশের সিটে

বসে, এটাই নিয়ম। এরা দুজন পেছনের সিটে বসে আমাকে বাধ্য করে ড্রাইভারের পাশে বসতে। আমি এতে বিব্রত হই। বলি, আর্মিতে এসে আমি নিয়ম ভাঙতে পারি না। তারা নাছোড়বান্দা, তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। দলের ম্যানেজার মেজর মোহাম্মদ হোসেন মালিক পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার। তিনি পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনেরও সাধারণ সম্পাদক। আমাকে খুবই স্নেহ করেন। বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওয়েলকাম টু আর্মি।'

পরদিন সকালে প্র্যাকটিস সেশনে আর্মি টিমের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তারা আমাকে পেয়ে খুবই খুশি। ঘড়িশাউ রেলওয়ে মাঠে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেনাবাহিনী টিম মাঝারি মানের। কিন্তু আমরা উন্নত মানের নৈপুণ্য প্রদর্শন করে প্রথমবারের মতো জাতীয় প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উন্নীত হই। এ পর্যায়ে শক্তিশালী পাক ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে টিমের সঙ্গে এক গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিই।

আর্মি টিম বছরে ছয়-সাত মাস ধরে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন শহরে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। একবার টিমে জয়েন করলে মাসের পর মাস নিজ ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে সদস্যরা। আমি, ওবায়েদ ও হাসান লাহোর ক্যান্টনমেন্টে মহানন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দুপুর হলে বিনা নোটিশে বাঙালি কোনো অফিসারের বাড়িতে হাজির হয়ে তাঁর মিসেসকে বলতাম, 'ভাবি, ক্ষুধা পেয়েছে, জলদি টেবিলে খানা লাগান।' ভাবিরা এ ধরনের উৎপাতে খুশিই হতেন। একটি গোলন্দাজ ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লে. কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমানের* বাসায় আমাদের জন্য অবারিত দ্বার, এ দম্পতির উষ্ণ আতিথেয়তা বহুবার উপভোগ করেছি। খাওয়ার পর হাসানের ভেসপা মোটরবাইকে চড়ে সিনেমা হলে গমন। সেনাসদস্যদের জন্য সিনেমা টিকিটের দাম অর্ধেক, আলাদা কাউন্টার রয়েছে ফৌজিদের জন্য। প্রায় প্রতিদিনই হলে গিয়ে ছবি দেখতাম।

পাকিস্তানে সেনাসদস্যদের জন্য নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সিনেমায় কনসেশন, সড়কপথে টোল ফ্রি, রেলপথে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে ফ্রি ট্রাভেল। যেকোনো ব্যাংকে গেলে আইডি কার্ড দেখিয়ে এক মাসের বেতনের সমান অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে লোন হিসেবে পাওয়া যায়। আমি, হাসান, ওবায়েদ ও ক্যাপ্টেন আহসানউল্লাহ—আর্মি টিমের এই চার বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে দুই বছর ধরে অত্যন্ত আনন্দমুখর সময় কাটিয়েছি। কাজ বলতে ফুটবল খেলা, সিনেমা দেখা, দাওয়াত খাওয়া এবং অফিসার মেসে আড্ডা মারা। লাহোরের ১১ ডিভিশনের জিওসি (জেনারেল

---

* পরবর্তীকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

অফিসার কমান্ডিং) মেজর জেনারেল বাহাদুর শের খুবই কট্টরপন্থী কমান্ডার। তিনি হুকুম জারি করলেন, অফিসাররা অফিস আওয়ারে সার্বক্ষণিকভাবে স্টিল হেলমেট পরে থাকবেন। সকালে মেসে ব্রেকফাস্ট সেরে যখন অফিসাররা হেলমেট, বিগ প্যাক পরে রুট মার্চে যাচ্ছে, আমরা তখন সিভিল ড্রেস পরে মোটরবাইকে চড়ে সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। ওদের অতিক্রম করার সময় হাত নেড়ে টা-টা বাই-বাই জানালে বন্ধুরা আমাদের অভিসম্পাত জানাত। ঈর্ষাকাতর হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, 'লাকি বাগারস।'

লাহোরে প্রতিযোগিতা শেষে জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে করাচি গেলাম জানুয়ারির ('৬৯) মাঝামাঝি। সোভিয়েট রাশিয়ার চ্যাম্পিয়ন দল 'জেসকা' পাকিস্তান সফরে এল চারটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার জন্য। পাকিস্তান জাতীয় দলে আমরা চারজন বাঙালি স্থান পেলাম—আমি, পিন্টু, শান্টু ও টিপু। প্রথম ম্যাচ যশোরে। আমি ও গোলরক্ষক শান্টু প্রথম একাদশে খেললাম, ১-০ গোলে রাশিয়ান টিম জিতল। খেলার পর ১ম ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার মেসে গেলাম। একমাত্র ক্যাপ্টেন মনসুরকে পেলাম। পল্টন সীমান্ত এলাকায় শীতকালীন ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত রয়েছে।

পরদিন জাতীয় দলের সঙ্গে ঢাকায় চলে এলাম। ২য় ম্যাচ ঢাকা স্টেডিয়ামে। আমাদের দল শাহবাগ হোটেলে অবস্থান করছে। ইতিমধ্যে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন বেগবান হয়েছে। উনসত্তরের গণ-আন্দোলন ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। ঢাকার ম্যাচের দিন সকালে আমাদের টিমের ম্যানেজারকে ফোন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, তাদের দাবি বাঙালি চার খেলোয়াড়কেই মাঠে নামাতে হবে নতুবা তারা খেলা বন্ধ করে দেবে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা ক্ষুব্ধ কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুপ থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। খেলা চালাতে হলে ছাত্রদের দাবি মানতেই হবে। অবশেষে ঢাকার ম্যাচে আমরা চারজনই খেলি। রাশিয়ান টিম ৩-১ গোলে জয়লাভ করে, পাকিস্তানের পক্ষে আমিই গোল করি। স্টেডিয়ামে বাঙালি চারজনের কাছে বল এলেই দর্শকেরা উল্লাস ধ্বনি করে, অন্যদের বেলায় নিরুত্তাপ।

ইতিমধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকাজ শুরু হয়েছে। কয়েকজন সামরিক বাহিনীর সদস্যের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকেও এ মামলায় জড়িত করা হয়েছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এ মামলার বিচারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে। আমরা আইয়ুবের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের পদধ্বনি শুনতে পেলাম।

মার্চে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গেলাম তেহরানে। ইরান, রাশিয়া, ইরাক, তুরস্ক ও পাকিস্তান দল অংশগ্রহণ করে ফ্রেন্ডশিপ কাপ টুর্নামেন্টে। রাশিয়ার স্পার্টাক দল চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করে, আমরা চতুর্থ স্থানে।

শক্তিশালী ইরাকের জাতীয় দলকে আমরা ২-১ গোলে পরাজিত করি।

ইরানের বাদশাহ রেজা শাহ পাহলভির শাসনকালে প্রথমবারের মতো ইরানে এসে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তেহরান আধুনিক শহর, এর বাসিন্দারাও ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। পুরুষদের পরনে স্যুট, নারীরা স্কার্ট পরে চলাফেরা করছে। এটি মুসলিমদের রাষ্ট্র বোঝাই যায় না, পশ্চিমা কালচারকে আত্মস্থ করছে বাসিন্দারা। আমরা পাঁচ তারকা হোটেল মায়ামিতে অবস্থান করছিলাম। হোটেলের নাইট ক্লাবে এক রাতে বিখ্যাত গায়িকা মাদাম গুগুশের সুরেলা কণ্ঠের গান শুনলাম। ফারসি খুবই মিষ্টি ভাষা, গানের সুরেলা মূর্ছনায় অভিভূত হলাম।

তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্র ইরান আমেরিকার ছত্রচ্ছায়ায় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শামিল কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশ ধূমায়িত হচ্ছে। অবশ্য বাইরে থেকে পরিস্থিতি বোঝা মুশকিল। শাহের মণি-মুক্তা-হীরা-জহরতের প্রদর্শনী 'নিয়াভরন প্যালেস' দেখে পর্যটকমাত্রই মুগ্ধ হবেন। রাস্তায় আধুনিক দামি গাড়ির জ্যাম। বাম্পার টু বাম্পার। রীতি অনুযায়ী আমরা রেজা শাহর পিতার মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করলাম। পরবর্তীকালে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে বিপ্লবের পর এ মাজারকে পাবলিক টয়লেটে রূপান্তর করা হয়েছিল।

ইরান সফরের পর ফিরে আসি যশোর ক্যান্টনমেন্টে। পল্টন ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে কালেক্টিভ ট্রেনিং শেষ করে। পল্টনের অফিসারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল। সন্ধ্যার পর অফিসার মেসে হুইস্কির গ্লাস হাতে সবাই আসর গুলজার করছে। আমি কখনো মদ্যপান করিনি, কোকা-কোলা হাতে সিনিয়রদের সঙ্গ দিচ্ছি। সবাই আমাকে ড্রিংক নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, 'কেয়া ইয়ার ফৌজি হো, পিতে নেহি (কেমন সৈনিক তুমি, মদ্যপান করছ না)।' আমি এটা-সেটা বলে এড়িয়ে যাই। একদিন তাদের চাপে পড়ে এক ঢোঁক নিলাম। অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হলো। এসব খেয়ে কী মজা পায়, তারাই জানে। লাহোরের স্টেশন মেসের এক ওয়েটারের স্বগতোক্তি মনে পড়ে গেল। এক তরুণ অফিসার দু-চার পেগ পান করেই ওয়েটারদের ওপর হম্বিতম্বি করত। এ আচরণ দেখে এক অফিসার তার বন্ধুকে পাঞ্জাবি ভাষায় বলছে, 'শালে পিন্ডু কর কদি লাচ্ছি নেহি পিন্দি, হোঁড় এথে হুইস্কি সে রোব জমায়া (বাড়িতে লাচ্ছি পান করার সংস্থান ছিল না, গেঁয়োটা এখানে এসে হুইস্কি খেয়ে ঠাট দেখাচ্ছে)।'

পল্টনে ফিরে আসার দুই দিন পরই মেজর সামাদ স্টাফ কলেজ কোয়েটায় এক বছরের স্টাফ কোর্স করার জন্য চলে গেলেন। যাওয়ার আগের দিন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে মেসে এলেন। আমি শহরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। পরনে তেহরান শপিং মল থেকে কেনা সুন্দর একটি উলেন

জ্যাকেট। সামাদ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোয়েটায় যে ভয়াবহ শীত পড়ে, আমার তো অবস্থা কাহিল হবে।' আমি আমার জ্যাকেটটি খুলে তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'স্যার, এটি আপনার কাজে লাগবে।' তিনি খুবই প্রীত হলেন। বছরখানেক পর পিএসসি ডিগ্রি লাভ করে পল্টনে ফিরে এসে জ্যাকেটটি ফিরিয়ে দেন, বললেন, 'হাফিজ, আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এটি আমার খুবই কাজে লেগেছে। ধন্যবাদ।' কোয়েটায় আউটডোরের তুষারপাত এবং কনকনে ঠান্ডা বাতাসে জ্যাকেটটির জেল্লা হারিয়ে গেছে! পরবর্তীকালে মেজর সামাদের সঙ্গে আমার চমৎকার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একে অন্যকে সহায়তা করা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ঐতিহ্য। পিএমএতে সিনিয়র ক্যাডেটরা শিখিয়ে ছিলেন, 'Senior's desire is an order for juniors.' উদাহরণস্বরূপ গ্রীষ্মকালে ঘর্মাক্ত কলেবর একজন ক্যাপ্টেন যদি অফিসার মেসের অ্যান্টিরুমে সোফায় হেলান দিয়ে স্বগতোক্তি করে, 'ইশ্, এই গরমে যদি এক গ্লাস ঠান্ডা ম্যাঙ্গো জুস পাওয়া যেত!' কাছে উপবিষ্ট ২/লেফটেন্যান্টের শোনামাত্র কর্তব্য হচ্ছে মেস হাবিলদারের কাছে খোঁজ নেওয়া বাজারে পাকা আম উঠেছে কি না। যদি আম পাওয়া যায়, তাহলে স্বল্পতম সময়ে জুস পরিবেশন করা। যদি আমের মৌসুম শুরু না হয়ে থাকে, তবে ক্যাপ্টেন সাহেবকে সবিনয়ে জানাতে হবে যে বাজারে আম এলেই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করা হবে। এই হলো সেনা ঐতিহ্য এবং সেনাবাহিনী এই ঐতিহ্যের ওপর ভর করেই এগিয়ে যায়।

সৈনিকের পেশা অতি বিচিত্র। এর সঙ্গে অন্য কোনো পেশার তুলনা হয় না। এখানে সিনিয়রের নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করতে হয়, জীবনের বিনিময়ে হলেও। শৃঙ্খলা রক্ষা এবং চেইন অব কমান্ড বজায় রাখা সৈনিক জীবনের মূলমন্ত্র। তবে সম্পর্কটা এখানে টু ওয়ে ট্রাফিকের মতো। জুনিয়র সিনিয়রের নির্দেশ পালনে বাধ্য। একইভাবে সিনিয়রের দায়িত্ব জুনিয়রের কল্যাণ (ওয়েলফেয়ার) নিশ্চিত করা। সিনিয়র লেফটেন্যান্টের দায়িত্ব জুনিয়রদের সঙ্গে নিয়ে বিবাহিত অফিসারের বাসায় সন্ধ্যার পর নিয়মিত 'কল অন' করা। অফিসার-পত্নী আনন্দের সঙ্গে অতিথিদের চা-নাশতা পরিবেশন করেন। সেখানে অফিসের কোনো বিষয় সাধারণত আলোচনা করা হয় না, এমনকি মেজর দস্তগীরের মতো কট্টর অফিসারও দয়ালু হোস্টে রূপান্তরিত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙালির মহাজাগরণ

জারি হলো সামরিক শাসন

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্র-শ্রমিকদের সম্মিলিত তুমুল আন্দোলনের ফলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। ২৫ এপ্রিল '৬৯ ইয়াহিয়া নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে এবং সারা দেশে মার্শাল ল (সামরিক শাসন) জারি করলেন।

সামরিক আইন জারির নির্দেশ পেয়েই অফিসাররা মানসিকভাবে চাঙা হয়ে ওঠেন। সেনা কর্মকর্তারা সাধারণত রাজনীতিবিদদের অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ গণ্য করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকেন। 'ব্লাডি সিভিলিয়ান' গালিটি তাঁদের মুখে মুখে ফেরে। আমাদের বাপ-দাদা, চৌদ্দপুরুষ যে সিভিলিয়ান, এটা অনেকেই ভুলে যান।

সন্ধ্যার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতারে ভাষণ দিয়ে সামরিক আইন জারির ঘোষণা দেন। কিন্তু এর আগেই মধ্যাহ্নভোজনের পরপরই যশোর সেনানিবাসের বিভিন্ন সেনা ইউনিট খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবস্থান নেয়। আমি ও ক্যাপ্টেন হোসাইনি মহকুমা শহর কোটচাঁদপুরে 'বি' কোম্পানি নিয়ে একটি পুরোনো ডাকবাংলোর মাঠে আস্তানা গাড়ি।

সন্ধ্যার পরপরই 'বি' কোম্পানির একটি প্লাটুন গাড়িতে মেশিনগান ফিট করে কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন সড়কে শক্তি প্রদর্শনের জন্য টহল দেয়। রাতটি শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হলো, কোনো ধরনের প্রতিবাদ ছাড়াই। পরদিন সকাল ১০টায় স্থানীয় হাইস্কুলে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত

হয়। সভায় ক্যাপ্টেন হোসাইনি সবাইকে সামরিক আইন মান্য করার নির্দেশ দেন এবং অমান্যকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। শ্রোতারা কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করেননি এবং সভা শেষ হওয়ার পর দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।

সন্ধ্যার পর হোসাইনি আমাকে বললেন, 'চলো অভিযানে যাওয়া যাক।' 'কোথায় যাব?' আমার প্রশ্ন। 'গেলেই দেখবে।' হোসাইনির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

গভীর রাতে একটি প্লাটুন সঙ্গে নিয়ে আমরা দুজন ডাকবাংলো থেকে বের হলাম। রাস্তায় কোনো জনপ্রাণী নেই, ঝিঁঝি পোকার একঘেয়ে ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। মাঝেমধ্যে কুকুরের ডাক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। সরু গ্রামীণ রাস্তায় পায়ে হেঁটে কয়েক মাইল পেরোনোর পর দুর্গম গ্রামাঞ্চলে একটি বাড়ির সামনে উপস্থিত হলাম আমরা। বাড়িটি সৈনিকেরা ঘিরে ফেলে। আমি বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। বাড়িটি দেখেই বোঝা যায়, গৃহকর্তা দীনহীন, খেটে খাওয়া মানুষ। হোসাইনি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নির্মিত দরজাটি লাথি মেরে খুলেই হুংকার দেন, 'হ্যান্ডস আপ।' আতঙ্কিত হয়ে নারীরা চিৎকার করে কান্না শুরু করে দেয়। 'হারুন কিধার হায়,' হোসাইনি রূঢ়ভাবে বৃদ্ধ গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করে। সঙ্গের সৈনিকটি বাংলায় প্রশ্নটির তরজমা করে।

'আমরা জানি না, হুজুর। কয়েক মাস ধরেই বাড়িতে আসে না সে।' বৃদ্ধের উত্তর।

হোসাইনি তাঁকে থাপ্পড় মারে এবং ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে আসে। তাঁর চোখ বেঁধে, হাত পিছমোড়া করে রাস্তার পাশে বসিয়ে রাখা হয়।

কাছাকাছি আরেকটি হিন্দু বাড়িতে একই ধরনের অভিযান চালানো হয়। প্রার্থিত যুবককে না পেয়ে তার খুড়োকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে আসা হয়। আমি একটি আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এসব কী হচ্ছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কোম্পানির সিনিয়র জেসিও (জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার) সুবেদার মোহাম্মদ আলী সিতারায়ে জুরাত। তিনি একসময় আমাকে ফিসফিস করে বলেন, 'এসব কী হচ্ছে, স্যার? এ ধরনের অমানবিক আচরণ করা কি ঠিক? এরা তো আমাদের দেশেরই নিতান্ত গরিব মানুষ।' আমি অবাক হলাম এই বীরযোদ্ধার কথা শুনে, সেনাবাহিনীতে চাকরি নিলেই কারও বিবেক মরে যায় না। আমি উত্তর না দিয়ে নীরব রইলাম।

দ্বিতীয় অভিযানের পর আমাদের আবাসস্থল ডাকবাংলোর পথে ফিরতি যাত্রা শুরু হলো দুই বৃদ্ধসহকারে। আমি হোসাইনিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাদের খুঁজতে এসেছি আমরা?'

'দুজন দুর্ধর্ষ নকশাল যুবককে ধরতে এসেছিলাম, পাখি খাঁচা ছেড়ে আগেই উড়ে গেছে। ওদের অভিভাবককে নিয়ে এসেছি যুবকদের আস্তানার

খবর পেতে।' বললেন হোসাইনি।

'স্যার, ওদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করুন, সেটাই সঠিক কাজ হবে। পুলিশই এসব কাজে দক্ষ।' আমি দৃঢ়ভাবে বললাম।

হোসাইনি কোনো মন্তব্য করলেন না।

সূর্যোদয়ের কিছু সময় আগে আমরা ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম। ধৃত দুজনকে হোসাইনি স্থানীয় থানায় পাঠিয়ে দিলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

সকালের নাশতা খেয়েই বিছানায় আশ্রয় নিলাম কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য। ঘুম আর এল না। কেবলই কানে বাজছিল কয়েক ঘণ্টা আগে শোনা অসহায় নারী-পুরুষের আর্তনাদ। এসব বামপন্থী, নকশাল নামে অভিহিত যুবকেরা আসলে কারা, এরা কোন মতবাদে দীক্ষিত, কী চায় এরা?

দুপুরে ক্যাপ্টেন হোসাইনিকে আমাদের ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি বীরদর্পে জিপে উঠে যশোরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ফিরে এলেন পরদিন সকাল ১০টায়। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি সটান বিছানায় লম্বা ঘুম দিলেন এবং পুরোনো অভ্যাস অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টা পর জাগ্রত হলেন। বিকেলে অ্যাডজুট্যান্ট সরওয়ারের ফোন কল পেলাম। তিনি জানালেন, হোসাইনিকে প্রবল তিরস্কার করেছেন সিও এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোনো ধরনের অভিযানে গেলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছেন। মনে মনে খুব খুশি হলাম, তবে বাইরে প্রকাশ করিনি।

পরদিন সকালে হোসাইনির রুমে প্রবেশ করে দেখি তিনি নির্জীব হয়ে শুয়ে আছেন, চোখ আধা খোলা। আমি বললাম, 'স্যার, আপনার ঘুমের কোটা তো পূরণ হয়েছে, এবার বলুন যশোরে সিও কী বললেন আপনাকে?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে দার্শনিকের মতো ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'পৃথিবীতে ভালো কাজ করে কোনো লাভ নেই। কোই ফায়দা নেহি।' পাশ ফিরে শুয়ে আরও এক সেশন ঘুমের প্রস্তুতি নিলেন। আমি দরজার বাইরে দণ্ডায়মান ব্যাটম্যানকে বললাম, 'সাবকে লিয়ে এক কাপ কড়ক চায়ে লে আও। (সাহেবকে এক কাপ কড়া চা দাও)।' সেনাসদস্য বাঙালি হলেও তাঁকে উর্দুতেই নির্দেশ দেওয়ার নিয়ম।

পরদিনই ক্যাপ্টেন হোসাইনিকে যশোরে ডেকে নেওয়া হলো। এখন থেকে আমিই কোটচাঁদপুর মহকুমার হর্তাকর্তা, বিধাতা!

১ম ইস্ট বেঙ্গল যশোর জেলায় সামরিক আইন কার্যকর করার দায়িত্ব পেল। লে. কর্নেল জায়েদি ডিস্ট্রিক্ট মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে বহাল হলেন। দেশের সাধারণ মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত। তারা প্রশাসন এবং এলাকার মাতব্বরদের নানা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তাঁরা এসবের প্রতিকার চেয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষের বরাবর লিখিতভাবে আবেদন

করেন। যশোর সার্কিট হাউসে আমরা হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি। সেখানে দরখাস্ত গ্রহণের জন্য একটি বাক্স রাখা হয়। শুরু হলো দরখাস্তের বন্যা। শত শত মানুষ সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে দরখাস্ত জমা দেওয়া শুরু করে। রাতে বাক্স খোলার পর স্তূপীকৃত আবেদনপত্রসমূহ দেখে আমাদেরই মুখ শুকিয়ে গেল। এসব পড়ে সুবিচার নিশ্চিত করতে গেলে অনেক সময় দরকার। অধিকাংশ দরখাস্তই জায়গাজমি-সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য। কোনো ব্যবস্থা না নিলে জনগণ সামরিক আইনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে। এ কারণেই কিছু আবেদনপত্র বাছাই করে প্রতিকারের উদ্যোগ নিলাম আমরা। অফিসারদের দায়িত্ব বণ্টন করে দিলেন সিও। আমি জুনিয়র কর্মকর্তা, আমায় ভাগে পড়ল দাম্পত্য কলহ ও নারী নির্যাতনের দরখাস্তসমূহ নিষ্পত্তির। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতন, খোরপোশ না দেওয়ার কারণে স্ত্রী অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মহা উৎসাহে দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পুলিশের মাধ্যমে বাদী-বিবাদীকে আমার সামনে হাজির করা হলো। সার্কিট হাউসের একটি ছোট কক্ষে বিচারকার্য শুরু হলো। একটি টেবিলের এক পাশে চেয়ারে উপবিষ্ট আমি, সামনে দণ্ডায়মান স্বামী-স্ত্রী। আমার ডাইনে ইউনিফর্ম পরিহিত বিশালদেহী, হেভিওয়েট বক্সার আবদুর রউফ, তার কোমরে পিস্তল। অভিযোগ দায়েরকারী স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং স্বামীর অকথ্য নির্যাতনের বিবরণ দেন। দরিদ্র মানুষও যে জীবনসংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে ঘরে অসহায় স্ত্রীর ওপর রাগ ঝাড়েন, তার বহু প্রমাণ প্রত্যক্ষ করলাম। স্বামী মার্শাল ল অফিসে এসে পরিবেশ দেখে ভয়ে জড়সড়, ক্ষীণ স্বরে অভিযোগ অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। শরীরে মারের দাগ, সহজেই বোঝা যায়, স্ত্রী নানাবিধ শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার। 'কী চাও তুমি,' আমার প্রশ্ন অবলা নারীকে।

'স্যার, আমি তালাক চাই, ওর ঘর আর করব না,' বললেন স্ত্রী। বাইরে বহু বিচারপ্রার্থী অপেক্ষমাণ। সুতরাং দ্রুত সিদ্ধান্ত দিতে হবে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'রায় হলো, তুমি আমাদের সামনেই তোমার স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তালাক দেবে। এর পরপরই করণিক আলী হোসেনের কাছে রক্ষিত স্ট্যাম্প কাগজে এই মর্মে টিপসই কিংবা স্বাক্ষর দেবে। ঠিক আছে?'

ভীতসন্ত্রস্ত স্বামীপ্রবর কামরা থেকে বেরোতে পারলেই বাঁচেন। একবার আমার দিকে একবার বিশালদেহী রউফের ক্রুদ্ধ মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করেন, 'জি স্যার, তালাক দিতে রাজি আছি। এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক।' কক্ষের এক কোনায় উপবিষ্ট হাবিলদার ক্লার্ক আলী হোসেন বাদী-বিবাদীর নাম লেখা স্ট্যাম্প কাগজ এগিয়ে দিলে দেনমোহরের

টাকা পরিশোধ করবেন মর্মে স্বাক্ষর করে স্বামী দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন। স্ত্রীপক্ষের মুরব্বিরা অনেক দিন ধরেই তালাক আদায়ের চেষ্টা করে আসছেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী তালাকের বিনিময়ে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করেন, যা কন্যাপক্ষের দ্বারা মেটানো সম্ভব হয় না। নিখরচায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পেয়ে স্ত্রী ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

এ ধরনের বিচার শরিয়ত অনুমোদন করে কি না, জানা নেই। সাধারণ জ্ঞানে উপলব্ধি হলো এটিই ন্যায়বিচার। প্রতিদিন এভাবে বেশ কিছু তালাক প্রদান সম্পন্ন হতে লাগল। যশোরের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে নিখরচায় তালাক পেতে হলে সার্কিট হাউসে লেফটেন্যান্ট সাহেবের কোর্টে ধরনা দাও। নির্যাতিত নারীদের দীর্ঘ সারি ক্রমেই দীর্ঘতর হতে লাগল।

একদিন ঘটে উল্টো ঘটনা। একদিন এক স্বামী জানান, তাঁর স্ত্রী পরকীয়ায় আসক্ত। ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি পালিয়ে গেছেন। স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে আগ্রহী নন। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই হাজির করা হলো আমার সামনে।

'স্যার, আমার ভাতকাপড় দিতে পারে না। ওর ঘর করুম না,' বললেন স্ত্রী।

'স্যার, আমি গরিব মানুষ কিন্তু ওরে খুশি করার জন্য চেষ্টা করি। ওকে ফিরে আসতে বলেন।' বললেন স্বামী।

আমি তরুণ স্বামীকে বোঝালাম, 'অনিচ্ছুক স্ত্রীকে ঘরে এনে লাভ নাই, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও।'

'স্যার, আমি ওরে ভালোবাসি, ওকে ছাড়া বাঁচব না,' স্বামীর সিনেমাটিক ডায়ালগ।

'স্যার, আমি ওর ভাত খামু না। যদি জোর করে ওর ঘরে পাঠান, তাহলে এখনই বিষ খাব।' একটি ছোট শিশি দেখিয়ে বলেন স্ত্রী।

মহা চিন্তায় পড়লাম। এমন কেস তো পাইনি এযাবৎ। যদি বিষ খায়, তাহলে তো আমিই বিপদে পড়ব। পরামর্শ করার জন্য পাশের কামরায় সিনিয়র অফিসার মেজর আলী আহমদ খানের শরণাপন্ন হলাম। কিশোরগঞ্জের অধিবাসী আলী আহমদ স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করে সপ্তাহখানেক আগে আমাদের পল্টনে যোগ দিয়েছেন। গাট্টাগোট্টা তাগড়া শরীর, পিএমএতে একসময় শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক প্রশিক্ষক পিটিএসও ছিলেন। ফুর্তিবাজ মানুষ, মুখে কিছুই আটকায় না। স্ত্রীর সঙ্গে বিছানায় কেমন আচরণ করেন, জুনিয়র অফিসারদের সামনে এহেন বিষয় নিয়েও অবলীলায় বাগাড়ম্বর করেন।

তরুণ দম্পতির সমস্যা জানাতেই তিনি বললেন, 'চলো তো দেখি।' ঢুকলেন আমার এজলাসে।

'এই শালার পুত, তোর বউ ভেগে যায় কেন? তুই পুরুষ পোলা না? তোর যন্ত্র নাই?' রাগত স্বরে মেজর আলী বললেন বিচারপ্রার্থী স্বামীকে।

স্ত্রী কিছু বলতে চাইলে আলী ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'চুপ থাক।' স্বামী ইতিমধ্যে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন। সেনা কর্মকর্তারা তাঁর পক্ষে, উপরন্তু তাঁর পৌরুষও প্রশ্নবিদ্ধ। এবার রায় দিলেন মেজর আলী। স্বামীকে বললেন, 'চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবি বউকে। রাতে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবি, পৌরুষের প্রমাণ দিবি। এরপর বউ ভেগে গেলে তোদের দুজনকেই পিটিয়ে তক্তা বানাব।'

আমাদের বলে বলীয়ান হয়ে তরুণ স্বামী সত্যি সত্যি স্ত্রীর চুল ধরে টেনে সার্কিট হাউসের গেটের বাইরে দাঁড়ানো রিকশায় তুলে নেন। বাইরে দণ্ডায়মান শত শত দর্শক এ দৃশ্য উপভোগ করে। স্ত্রী কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে একসময় নীরবে স্বামীর পাশে বসে শ্বশুরালয়ের পথ ধরে।

বছরের মাঝামাঝি সময়ে লে. কর্নেল র‍্যাঙ্কে পদোন্নতি পেয়ে সুদক্ষ কর্মকর্তা কাজী গোলাম দস্তগীর ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার (সিও) পদে নিয়োগ পেলেন। বিদায়ী ব্যাটালিয়ন দরবারে লে. কর্নেল জায়েদি জানালেন যে তাঁর চেয়ে অনেক গুণ দক্ষ কর্মকর্তার কাছে পল্টনের দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত। দস্তগীর আমেরিকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, একজন খাঁটি প্রফেশনাল। অধীনস্থ অফিসারদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে তিনি সদা তৎপর। সৈনিকদের ওয়েলফেয়ার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ জারি করেন। যদি শান্তিকালে একজন অফিসার সৈনিকদের ভালোমন্দের খোঁজখবর না রাখে, যুদ্ধকালে সংকটময় মুহূর্তে সৈনিকও অফিসারের জন্য জীবন বিপন্ন করে আদেশ পালন করবে না। আমরা একই পরিবারের সদস্য, আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহমর্মিতা হতে হবে উচ্চ মানের। এমনকি আমাদের অধীন সৈনিকের যদি পারিবারিক কোনো সমস্যা থেকে থাকে, এ ব্যাপারেও কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে তার আস্থাভাজন হতে হবে। যে আমার হুকুমে জীবন বিসর্জন দেবে, তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাকে শতভাগ অর্জন করতে হবে, এটাই সৈনিক জীবনের মর্মকথা। দস্তগীরের একটি উচ্চারণ এত বছর পরও আমার হৃদয়ে গ্রথিত রয়েছে, 'ভালো ব্যাটালিয়ন, খারাপ ব্যাটালিয়ন বলে কিছু নেই, There are only good officers and bad officers.'

মার্শাল ল ডিউটি করতে গিয়েই অফিসাররা ক্ষমতার স্বাদ লাভ করে, তাঁদের মধ্যে প্রভুত্বব্যঞ্জক মনোভাব গড়ে ওঠে অজান্তে। সামরিক অফিসাররা তাঁদের সিভিল কাউন্টার পার্টের চেয়ে ক্ষমতাধর, এটি প্রমাণের জন্য মুখিয়ে

থাকেন প্রায়শ। ক্যাপ্টেন খালেক নামের ৩য় ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের এক অফিসার সাতক্ষীরার ডাকবাংলোতে অবস্থান করছিলেন। একদিন তিনি সাতক্ষীরার এসডিওকে ডাকবাংলোতে তলব করেন। যেকোনো কারণেই হোক, এসডিও সাহেব আসেননি কিংবা আসতে পারেননি। খালেক সৈনিকসহ এসডিওর অফিসে গিয়ে তাঁকে ডাকবাংলোতে ধরে নিয়ে আসেন এবং গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখেন। বিষয়টি আমার মনঃপূত হয়নি। বিকেলে গ্যারিসন সিনেমা হলে ছায়াছবি দেখতে গেলাম। সেখানে অফিসাররা খালেককে পিঠ চাপড়ে বাহ্বা দিচ্ছে, বলাবলি করছে, 'he is hell of a chap।' মনে মনে বললাম, বাঙালি অফিসার পেয়ে গায়ে হাত তুলতে পেরেছ, এসডিও পাঞ্জাবি হলে কি এমন ব্যবহার করতে! আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধুরা আশপাশের এলাকা মাগুরা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুরে এসডিওরূপে কর্মরত, এদের কারও সঙ্গে এ ধরনের দুর্ব্যবহার করলে আমার জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

আবার ফুটবল

সেপ্টেম্বরের এক সকালে যশোর সার্কিট হাউসে বসে রুটিনকাজ করছি, এ সময় জিএইচকিউ থেকে সিগন্যাল মেসেজ এল আমার জন্য। পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দল তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় যাবে আরসিডি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমাকে অবিলম্বে করাচিতে দলের ক্যাম্পে যোগ দিতে হবে। পল্টন থেকে মুভমেন্ট অর্ডার নিয়ে পরদিন করাচি পৌঁছালাম।

সপ্তাহখানেক ক্যাম্পে ট্রেনিং, এরপর জাতীয় দল ঘোষণা করা হলো। এবার দলে চারজন সেনাসদস্য স্থান পেল—বন্ধু ক্যাপ্টেন মাহমুদ হাসান, ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ক্যাপ্টেন দুররানি, নায়েক মিসকিন খান ও আমি। ঢাকা থেকে যোগ দিয়েছে সান্টু, পিন্টু ও টিপু। আমরা পাঁচ বাঙালি গল্পসল্প করে খোশমেজাজে পিআইএর বিমানে আরোহণ করি ইস্তাম্বুল যাত্রার উদ্দেশ্যে। প্লেনে উঠেই দেখা হলো মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে। পিএমএ ছাড়ার পর এই তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। জিয়া বললেন, তিনি একটি সামরিক কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য জার্মানি যাচ্ছেন, আমাদেরও অভিনন্দন জানালেন। আলো-ঝলমল প্রভাতে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে অবতরণ করি আমরা। স্বল্প বিরতির পর তুর্কি এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে আমরা আঙ্কারায় পৌঁছালাম।

তুরস্ক মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক, সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। ভূখণ্ডের অধিকাংশ এশিয়ার অন্তর্গত, ইস্তাম্বুলসহ কিছু অংশ ইউরোপে পড়েছে। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস—যাবতীয় বিষয়ে তারা ইউরোপীয়

ঘরানার অন্তর্ভুক্ত। একসময় তুরস্ককে বলা হতো Sick man of Europe। রাজধানী আঙ্কারা পরিকল্পিত শহর, প্রশস্ত রাস্তা এবং উঁচু বহুতল ইমারতসমৃদ্ধ। পাকিস্তান ও ইরান দলকে রাখা হয়েছে পাঁচ তারকা হোটেল দিদেমানে। বিলাসবহুল হোটেল। এর ঘূর্ণমান রেস্তোরাঁ টপ ফ্লোরে অবস্থিত। ডিনারের সময় আলোকমালায় সুশোভিত রাত্রিকালীন আঙ্কারার সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। রেস্টুরেন্টের এক কোণে একটি ছোট টেবিলের পেছনে বসে থাকে প্রাচীন কালের রঙিন তুর্কি পোশাক পরা এক সুশ্রী তরুণী। টেবিলের ওপর পাখির খাঁচার মতো দেখতে অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে। এ খাঁচার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ফ্লেভারের টার্কিশ কফি। মেয়েটি চুপচাপ বসে থাকে। এক ওয়েটার আমাদের একজনকে বলেছে মেয়েটি বোবা। ডিনারের পর কেউ ইশারা করলে মেয়েটি খাঁচাসদৃশ ট্রে নিয়ে আসে। গ্রাহক নিজেই পরিমাণমতো কফি, চিনি, দুধ ইত্যাদি ঢেলে নেন। মেয়েটি আসা-যাওয়ার সময় খাঁচার সঙ্গে সংযুক্ত ঘুঙুরের টুংটাং শব্দ চমৎকার সুরলহরির সৃষ্টি করে। তার বর্ণাঢ্য রাজকীয় পোশাক, সুদৃশ খাঁচার সুরেলা আওয়াজ এবং রেস্টুরেন্টের নিচুস্বরের তুর্কি মিউজিক—সব মিলিয়ে এক মোহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হতো। কফি খেলে ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে, এ কারণে আমরা ডিনারের পরপরই নিজ কামরায় ফিরে যেতাম।

আঙ্কারার আধুনিক নবনির্মিত স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইটের উদ্ভাসিত আলোয় আরসিডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। বিশ্বমানের টিম তুরস্ক নিজ মাঠে উন্নত ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে চ্যাম্পিয়ন হলো। তারা শক্তিশালী ইরানকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। পাকিস্তানকে হারাতে তাদের অনেক ঘাম ঝরাতে হয়। খেলার ৭০ মিনিট পর্যন্ত আমরা ২-১ গোলে এগিয়ে ছিলাম, ৪০ হাজার দর্শক রুদ্ধশ্বাসে মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছিলেন। অবশেষে শেষ ২০ মিনিটে তুরস্ক দুটি গোল করে (৩-২) চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। সমাপ্তির ১০ মিনিট আগে আমি বাঁ পায়ের গোড়ালিতে মারাত্মক আঘাত পাই এবং প্রথমবারের মতো স্ট্রেচারে করে মাঠ ত্যাগ করি। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে এক্স-রে করে গোড়ালিতে পুরু ব্যান্ডেজ জড়িয়ে দেওয়া হয়। এক্স-রেতে কোনো ফ্র্যাকচার ধরা পড়েনি।

হোটেলে ফিরলাম গভীর রাতে। আমি খুবই ক্ষুধার্ত। একজন তুর্কি কর্মকর্তার কাঁধে ভর দিয়ে নির্জন রেস্টুরেন্টের টেবিলে বসলাম আমরা দুজন। একটু স্যুপ ও পাউরুটি খেয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। এ সময় সুমধুর টুংটাং মিউজিকসহ উপস্থিত হলো কফি খাঁচার বাহক মেয়েটি। উদ্বিগ্ন স্বরে তুর্কি ভাষায় জিজ্ঞাসা করে পায়ে এত মোটা ব্যান্ডেজ কেন। দোভাষীর মাধ্যমে জানালাম, খেলার মাঠে আঘাত পেয়েছি। আমার ধারণা ছিল তুমি বোবা।

শুনে মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে, যেন গহিন অরণ্যে ঝরনার মৃদুমন্দ জলতরঙ্গের ধ্বনি বাতাসে ভেসে এল।

পরদিন সকালে একটি বিলাসবহুল কোচে আমরা যাত্রা করলাম তুরস্কের সুন্দর শহর বলুর উদ্দেশে। মধ্যাহ্নভোজের বিরতি হলো অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত, নয়নাভিরাম অবন্ত লেকের পাড়ে সুসজ্জিত এক রিসোর্টে। লাঞ্চের পর কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রোয়িং বোটে চড়ে লেকে ভেসে বেড়ালাম কয়েক ঘণ্টা। অপূর্ব সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য। চারদিকে উঁচু পাহাড়ের সারি, দৃষ্টিনন্দন সবুজ বনাঞ্চল। মাঝখানে বয়ে চলেছে অবন্ত লেকের নীল জলরাশি। শরতের আকাশে উড়ছে শুভ্র মেঘমালা, নিচে নৌবিহারে ভেসে বেড়াচ্ছি আমরা একঝাঁক প্রাণচঞ্চল যুবকের দল। আমাদের হাসি-গানে, পাখির কলকাকলিতে অবন্ত লেক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বহু বছর পেরিয়ে গেছে, আজও সেই অপরূপ সুষমামণ্ডিত প্রাকৃতিক দৃশ্য, নৌবিহারের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

বলুতে এক দিন কাটিয়ে আমরা এলাম কোনিয়া শহরে। এটি অতি প্রাচীন, ইতিহাসখ্যাত জনপদ। কোনিয়া যাওয়ার পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি অতি মনোরম, রাস্তাঘাট প্রশস্ত। শহরটিতে পর্যটকদের ভিড় লেগেই আছে। শপিং মলের বিপণিবিতানসমূহে থরে থরে সাজানো রয়েছে মূল্যবান পণ্যসামগ্রী। টুকটাক কিছু স্যুভেনির সংগ্রহ করলাম আমরা।

কোনিয়া থেকে ফিরে এলাম আঙ্কারায়, হোটেল দিদেমানে। পরদিন দেশে ফেরার পালা। খুব ভোরে তুর্কি বিমানে আমরা অবতরণ করি ইস্তাম্বুলে। করাচির উদ্দেশে পিআইএ ফ্লাইট ছেড়ে যাবে রাত ১২টায়। পুরো একটি দিন কাটানোর সুযোগ পেলাম এই ঐতিহাসিক নগরীতে।

ইস্তাম্বুল তুরস্কের ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অতি প্রাচীন শহর। এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বয়ে চলেছে বসফোরাস প্রণালি, যা ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরকে সংযুক্ত করেছে। বসফোরাসের ওপর নির্মিত হয়েছে একটি দীর্ঘ ব্রিজ, যার এক প্রান্তে এশিয়া, অন্য প্রান্তে ইউরোপ। অসংখ্য পর্যটকের পদচারণে গমগম করছে ইস্তাম্বুল। বসফোরাস প্রণালিতে এক নৌবিহারে আনন্দঘন সময় কাটিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে উঁচু পাহাড়ি পথ বেয়ে আমাদের বাস এগিয়ে চলে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী সি বিচের উদ্দেশে। বিচ লাগোয়া এক বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয় আমাদের কফি ও স্ন্যাকস-সহযোগে আপ্যায়ন করা হয়। উঁচু পাহাড়ের ওপর এই রেস্তোরাঁয় থাকাকালে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমরা মুগ্ধ। নিচে সমুদ্রস্নান করছে বহু পর্যটক। আমাদের টিমের কোচ রহমতউল্লাহ সঙ্গে করে সুইমিং কস্টিউম নিয়ে এসেছেন। চট করে সমুদ্রে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে এলেন। খুবই আফসোস হলো সাঁতারের পোশাক

আনিনি বলে। ঘণ্টা দুয়েক এ রিসোর্টে কাটিয়ে সন্ধ্যার পরপরই ফিরে এলাম ইস্তাম্বুলে। বাসের জানালা দিয়ে কয়েকটি ট্যুরিস্ট স্পট, যেমন বৃহৎ মসজিদ আয়া সোফিয়া, ব্লু মস্ক, টপকাপি রাজপ্রাসাদ দেখতে পেলাম। আফসোস রয়ে গেল, ইস্তাম্বুল ভালোভাবে ঘুরে দেখা হলো না এ যাত্রায়। বসফোরাসের তীরে পাথরের বাঁধের ওপর নাইট ক্লাবে আমাদের নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়। আলোকমালায় উদ্ভাসিত রাতের ইস্তাম্বুলের মোহনীয় রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হলাম।

মধ্যরাতে দেশে ফেরার ফ্লাইটে চোখে ঘুম এল না। তুরস্কে কাটানো চমৎকার দিনগুলোর কথা বারবার মানসপটে ভেসে আসে, বিশেষ করে অবন্ত লেকে এবং ইস্তাম্বুলের স্বল্পকালীন অবস্থানের স্মৃতি ভোলার নয়।

পরদিন কাকডাকা ভোরে করাচি এয়ারপোর্টে আমরা অবতরণ করলাম। টিমের সদস্যরা নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে চলে গেল। এক সপ্তাহ পরই ইন্টার সার্ভিসেস ফুটবল প্রতিযোগিতা। এটি বাহিনীপ্রধান এবং অন্যদের জন্য মর্যাদার লড়াই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেনাবাহিনী টিম ১০ দিন ধরে করাচি ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করে প্র্যাকটিস চালাচ্ছে। জাতীয় দল-ফেরত আমরা চার খেলোয়াড় তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। বন্ধু ক্যাপ্টেন আহসানউল্লাহ ৬ ইস্ট বেঙ্গলে কর্মরত ছিল। সে-ও এসে আমাদের ক্যাম্পে যোগ দেয়। ট্রানজিট ক্যাম্পে অফিসার মেস ও করাচি রেসকোর্সের ব্যারিয়ারের দূরত্ব মাত্র ২০ গজ। সকালে প্র্যাকটিসের পর ব্রেকফাস্ট সেরে মেসের বারান্দায় আমরা চারজন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘোড়দৌড় উপভোগ করতাম। লাঞ্চের পর ম্যাটিনি শো দেখে কিছুক্ষণ উইন্ডো শপিং করে মেসে ফিরে আসতাম।

পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে ইন্টার সার্ভিসেস প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমরা বিমানবাহিনী দলকে ৪-০ গোলে পরাজিত করি। খেলার শেষ ভাগে দুই দলের কতিপয় খেলোয়াড় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সামনেই মারামারিতে লিপ্ত হয়। সুশৃঙ্খল বাহিনীতে এ ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। এ বিষয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কোর্ট অব এনকোয়ারি (তদন্ত কমিটি) গঠন করা হয়। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা গেল আমাদের দলের সবচেয়ে শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ খানকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।

বড় ব্যবধানে বিমানবাহিনীকে হারাতে পারায় সেনা সদর দপ্তর আর্মি টিমের ওপর খুশি হলেন এবং সিজিএস (চিফ অব জেনারেল স্টাফ) লে. জেনারেল গুল হাসান খান আমাদের রাওয়ালপিন্ডিতে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। করাচি থেকে পিন্ডি ট্রেনযাত্রা খুবই আনন্দমুখর ছিল। গুল হাসান হাসিখুশি টাইপের কর্মকর্তা। তাঁর একটা মুদ্রাদোষ ছিল, হাতের ব্যাটন দিয়ে

জুনিয়রদের পেটে আলতো গুঁতো মেরে বলতেন, 'হ্যালো কক, হোয়াটস আপ (কী হচ্ছে)?' আমরা পুরো টিম পিন্ডির ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হলাম নৈশভোজে অংশগ্রহণের জন্য। গুল হাসান ছাড়াও কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। একটিমাত্র লম্বা টেবিলের এক প্রান্তে সিজিএস, টিমের সদস্যরা টেবিলের দুই পাশে। ডাইনিং টেবিলে শুভ্র টেবিল ক্লথের ওপর অনেকগুলো চকচকে কাঁটাচামচ থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। টিমে রয়েছে ৪ জন অফিসার এবং ১৬ জন অন্যান্য র‍্যাঙ্কের জেসিও এনসিও। কাঁটাচামচ দেখেই ক্ষুধার্ত এনসিওদের মুখ মলিন হলো। জেনারেলদের সামনে টেবিল ম্যানার বজায় রেখে খাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সিজিএস আমাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'করাচিতে মারামারিতে কারা জিতেছে?' আমি ঢোঁক গিলে বললাম, 'অবশ্যই আর্মি জিতেছে।'

'গ্রেট, নো প্রবলেম।' জেনারেল গুল এনসিওদের বললেন, 'ওয়েল ডান বাচ্চু। হাত ছে খাও, আয়েশ করো।' (হাত দিয়ে খাও) হাত ব্যবহারের নির্দেশ পেয়ে তারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। লঙ্গরের ডাল-রুটি খেয়ে অভ্যস্ত খেলোয়াড় ন্যাপকিন কাঁধের ওপর রেখে খাবার খেতে মনোযোগী হলো মহা উৎসাহে।

১৯৬৯-এর অক্টোবরে যশোরে ফিরে এসে পল্টনে অন্যদের সঙ্গে যোগ দিলাম। অফিসাররা অধিকাংশই মার্শাল ল ডিউটিতে ব্যস্ত। আমাকে পাঠানো হলো কুষ্টিয়াতে। আমাদের টুআইসি (উপ-অধিনায়ক) মেজর ইকবাল কোরেশিও সেখানে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি '৬৫ সালের যুদ্ধে 'বি' কোম্পানি কমান্ডাররূপে সাহসী ভূমিকা পালন করেন এবং ইমতিয়াজী সনদ পুরস্কারে ভূষিত হন। কোনো কারণবশত তিনি প্রমোশনবঞ্চিত হন এবং পেশার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। সুপারসিডেড এই পাঞ্জাবি মেজর আমাদের সিও-র চেয়ে সিনিয়র ছিলেন, এ কারণে পারতপক্ষে কেউ তাকে ঘাঁটাত না। কুষ্টিয়াতে জনসাধারণের দরখাস্ত নিষ্পত্তি করতে গিয়ে তিনি কয়েকটি উল্টাপাল্টা রায় দিয়ে বসেন, ফলে স্থানীয় জনগণ তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়।

ইকবাল কোরেশি বাংলা ভাষায় কথোপকথনে দুর্বল ছিলেন। স্থানীয় একজন উকিল তাঁকে কোর্টে সাহায্য করতেন। একদিন তাঁর কোর্টে দাম্পত্য কলহের মামলাসংক্রান্ত শুনানি চলছিল। মেজর কোরেশি দরখাস্তকারী নারীকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, 'দেখো, স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া প্রতিটি সংসারে হয়েই থাকে আবার কিছু সময় পর মিটমাটও হয়ে যায়। তালাক কোনো সমাধান

নয় এ ক্ষেত্রে। সুতরাং তুমি তোমার স্বামীর ঘরে ফিরে যাও।'

'না স্যার, ওর ভাত আমি আর খামু না,' স্ত্রীর সাফ জবাব।

'বহুত আচ্ছা বাত হ্যায়। উসকো রোটি খিলাও, তনদুরস্ত বন জায়েগি' (ভালো কথা, ওকে রুটি খাওয়াবে, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে),' স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন কোরেশি।

উপস্থিত অনেকেই হেসে ওঠে, কোরেশি বিস্ময়ে বিমূঢ়!

নভেম্বরে ১ম ইস্ট বেঙ্গল সীমান্ত এলাকায় কালেক্টিভ ট্রেনিংয়ে নিয়োজিত হলো। আমি 'এ' কোম্পানির কমান্ডার। বিভিন্ন কোর্স এবং সামরিক আইন বলবৎ করার কাজে সিনিয়র অফিসাররা নিয়োজিত থাকার কারণে ট্রেনিংয়ে অল্প কয়েকজন যোগ দেন। সিও দস্তগীর সৈনিকদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের টাস্ক দেন বিভিন্ন কোম্পানিকে। আমরা দিবারাত্রি যুদ্ধ মহড়ায় নিজ নিজ সেনাদলকে প্রশিক্ষিত করে তুলি। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে এ এলাকাতেই আমাদের রক্ষণব্যূহ গড়ে তুলতে হবে। আমরা নিজ এলাকায় ভূমির গঠন, সড়ক যোগাযোগ, স্থানীয়দের মনোভাব সম্পর্কে নিবিড়ভাবে জ্ঞান আহরণ করি। অধীন সৈনিকদের সঙ্গেও গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলি। মাস ছয়েক আগে পল্টন যোগ দেয় সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শমসের মুবিন চৌধুরী, সিলেটের অধিবাসী। সে-ও কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে এ ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করে।

এক মাস সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে অবস্থানের ফলে প্রতিটি রাস্তাঘাট আমাদের নখদর্পণে আসে। এ অঞ্চলে রাস্তাঘাট, পুল কালভার্ট ইচ্ছাকৃতভাবে মেরামত করা হয় না, যাতে করে শত্রু ট্যাংক বা ভারী যানবাহন নিয়ে আক্রমণ চালাতে না পারে। শীতকালে যশোরের গ্রামাঞ্চলে মানুষ আনন্দমুখর পরিবেশে বসবাস করে। ধান কাটার মৌসুম আসায় কৃষকের মুখে হাসি ফোটে, অভাব-অনটন সাময়িকভাবে বিদায় নেয়। এ অঞ্চল খেজুরের রসের জন্য বিখ্যাত। সন্ধ্যার পর সম্পন্ন গৃহস্থের উঠানে চার কোনা বড়সড় পাত্রে রস জ্বাল করে গুড় তৈরি করা হয়। শিশু, কিশোর, এমনকি বড়দের জন্য এটি একটি উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করে। সারা দেশে গুড় সরবরাহ করে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হন।

শুক্রবার আমাদের বিশ্রামের দিন। টানা ছয় দিন কঠিন পরিশ্রমের পর রিল্যাক্স করার জন্য ফিল্ড অফিসার মেসে আনন্দঘন পরিবেশে গল্পগুজব করে সময় কাটাই। বৃহৎ প্রাকৃতিক জলাভূমি বলুহর হাওরের পাশে মেসের তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। এর তিন-চতুর্থাংশ মাটির নিচে, এক ভাগ ওপরে। রাতে হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে নৈশভোজের পর অনেক রাত অবধি গল্পগুজব চলে। পাঞ্জাবি অফিসারদের সঙ্গেও সখ্য ও বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। গাড়ি চালানো

শেখার জন্য শীতকালীন প্রশিক্ষণের সময়টি সর্বোত্তম। আমাদের ড্রাইভার সরু মিয়া একটি আমেরিকান এম-৩৮ জিপ নিয়ে আমাকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দেয়। মেসের পাশে একটি মাঠে এক সপ্তাহ প্র্যাকটিস করে গাড়ি চালনা মোটামুটিভাবে রপ্ত করি।

বেশ শীত পড়েছে এবার। সাইবেরিয়া থেকে আসা পাখিরা বরাবরের মতো জেঁকে বসেছে হাওরাঞ্চলে। খুব ভোরে মেসের সামনে ডেক চেয়ারে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে পাখি ওড়ার দৃশ্য দেখে মনটা প্রফুল্ল হয়ে যায়।

মেজর ফজল করিমকে সিও ট্রেনিং এরিয়ায় নিয়ে এসেছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে। ১৪তম ডিভিশন কমান্ডার (জিওসি) মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা আমাদের ট্রেনিং পরিদর্শনে আসবেন, আমাদের যুদ্ধপ্রস্তুতির মান সম্পর্কে সরাসরি ধারণা নেবেন। ফজল করিমকে জিওসির সামনে যোগ্যভাবে উপস্থাপন করার জন্যই তাঁকে সিও নিয়ে এসেছেন।

দিন দুয়েক পর জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ট্রেনিং এরিয়াতে এলেন। ফজল করিম অতি কষ্টে স্যান্ড মডেলে একটি ব্যাটালিয়ন অ্যাটাকের মৌখিক আদেশ উপস্থাপন করেন জিওসির সামনে। আদেশের শেষভাগে এসে চার কোম্পানি কমান্ডারকে নিয়মমাফিক জিজ্ঞাসা করেন, Any Question? আমরা প্রশ্ন করলেই তিনি খেই হারিয়ে ফেলবেন, এ কারণে আমরা কোনো প্রশ্নই করলাম না। ফজল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। আমাদের সামনেই দস্তগীর জিওসিকে ফজল সম্পর্কে উচ্চ ধারণা দিলেন। তিনি কোনো প্রশ্ন করলেই ফজল ধরা খেতেন, দস্তগীর কৌশলে তাঁকে রক্ষা করেন। জিওসি আমাকে ও শমসেরকে লেফটেন্যান্টের দ্বিতীয় পিপ পরিয়ে দিলেন।

একদিন কাকডাকা ভোরে আমি ও ফজল করিম মেস টেন্টের সামনে চেয়ারে বসে আছি। প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে এক বৃদ্ধ আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন। হয়তো কোনো সাহায্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। আত্মভোলা ফজল তাঁকে দেখেই গায়ের দামি কাশ্মীরি শালটি বৃদ্ধকে দিয়ে বললেন, 'যাও বাচ্চু।' হতদরিদ্র বৃদ্ধের চোখে অশ্রু নেমে এল। হয়তো এ ধরনের দুঃখী মানুষের দোয়ার বরকতেই অপ্রত্যাশিতভাবে ফজল দুই মাস পর লে. কর্নেল পদে প্রমোশন পেলেন। তাঁকে ৩য় ইস্ট বেঙ্গলের সিও পদে নিয়োগ দেওয়া হলো।

ফেব্রুয়ারি মাসে কোয়েটার ইনফ্যান্ট্রি স্কুলে এলাম অফিসার্স ওয়েপন (ওডব্লিউ) কোর্স করার জন্য, এটি পদাতিক বাহিনীর সব অফিসারের জন্য বাধ্যতামূলক। শীতকালে কোয়েটায় প্রচণ্ড ঠান্ডা। তুষারপাতের সঙ্গে আসা কনকনে বাতাস সুচের মতো শরীরে বেঁধে। ফেব্রুয়ারিতে শীত কমে আসে, তাই কিছুটা স্বচ্ছন্দ বোধ করি। আমরা দুই শতাধিক কর্মকর্তা পদাতিক বাহিনীর যাবতীয় অস্ত্রচালনায় দক্ষতা অর্জনের জন্য ওডব্লিউ-১০ কোর্সে

অংশগ্রহণ করি। প্রশিক্ষণার্থী অফিসারদের ১০টি সিন্ডিকেটে ভাগ করে থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নেন দক্ষ প্রশিক্ষকেরা। একজনমাত্র বাঙালি অফিসারের দেখা পেলাম, তিনি আমার পল্টনের ক্যাপ্টেন মাহমুদুল হাসান, ওয়েপন উইংয়ের উপ-অধিনায়ক।

অফিসার মেসের একই কক্ষে আমরা তিনজন বাঙালি লেফটেন্যান্ট অবস্থানের সুযোগ পেলাম—ইস্ট বেঙ্গলের ফারুক আহমদ চৌধুরী*, ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের মাহবুবুর রহমান** ও আমি। কোয়েটায় এসেই এদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা মেরে আমরা ঘনিষ্ঠ হই।

তোমার আমার ঠিকানা—পদ্মা, মেঘনা, যমুনা

১৯৭০ সাধারণ নির্বাচনের বছর। সেনা কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আলাপ না করলেও বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের মধ্যে বিভেদের অদৃশ্য দেয়াল ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। 'জয় বাংলা' স্লোগান বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সৈনিকদের সঙ্গে বাক্যালাপ চালাতে হয় উর্দুতে, এ কারণে এ ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হয় কর্মকর্তাদের। উর্দুতে বক্তব্য দিতে হয় (আইপি) ক্লাসে। কিন্তু উর্দু ভাষায় বাঙালিরা দুর্বল, আমাদের উচ্চারণ শুনে পাঞ্জাবিরা হাসাহাসি করে। আমাদের সিন্ডিকেটে আমরা তিনজন বাঙালি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছি। আমি, লেফটেন্যান্ট মাহবুব এবং সিগন্যাল কোরের ক্যাপ্টেন মনসুরুল আজিজ। মনসুর সংস্কৃতিমনা, ভদ্র অফিসার, উর্দু ভাষায় একবারেই আনাড়ি। তার উর্দু শুনে প্রশিক্ষক ও কোর্সের অন্য অফিসাররা খুবই মজা পাচ্ছে। পাহাড়ের চূড়ার উর্দু প্রতিশব্দ 'টেকড়ি'। মনসুর বক্তৃতার ক্লাসে উচ্চারণ করে 'টেকড়ু', শুনে পাঞ্জাবিরা হেসে গড়িয়ে পরে। সব প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে এই টেকড়ু শব্দটি ছড়িয়ে পড়ে। মনসুরকে দেখলেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা অন্যদিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করে 'টেকড়ু'। ক্রমেই মনসুর অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে। একদিন সকালে সে ইনফ্যান্ট্রি স্কুলের কমান্ড্যান্টের (ব্রিগেডিয়ার) রুমে ঢোকে। 'বাংলা আমার মাতৃভাষা, অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমি পূর্ব পাকিস্তানি বলেই পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে। আমি

---

* অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার।

** বীর উত্তম, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ।

এর প্রতিকার চাই।' মনসুরের বলিষ্ঠ বক্তব্য। কমান্ড্যান্ট বিব্রত হলেন এবং মনসুরকে আশ্বস্ত করেন। পরদিন পুরো কোর্সের দুই শতাধিক অফিসারকে একত্র করে তিনি কড়া বক্তব্য দেন মনসুরের পক্ষে। সবাইকে সতর্ক করে দেন, যদি কেউ পূর্ব পাকিস্তানিদের ভাষা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মনসুর তাৎক্ষণিক হিরো বনে গেল, সবাই সমীহ করে কথা বলে তার সঙ্গে।

সপ্তাহে দুই দিন বেয়নেট ফাইটিংয়ের ক্লাস হয়, প্রশিক্ষক পাঞ্জাবি সুবেদার। রাইফেলে বেয়নেট লাগিয়ে কয়েক গজ দৌড়ে, 'চার্জ' বলে চিৎকার করে খড় ও চটের তৈরি টার্গেটে আঘাত হানতে হয়। মনসুরের মাথায় হঠাৎ আইডিয়া এল, আমরা চার্জের পরিবর্তে 'জয় বাংলা' বলে বেয়নেট ফাইটিং করব। একদিন প্ল্যানমাফিক আমরা তিন বাঙালি 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করে টার্গেটে আঘাত করলাম। সিন্ডিকেটের পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এমন শব্দ কেউ শোনেনি। প্রশিক্ষক কাছে এসে বললেন, 'সাব, কেয়া বোলা আপলোগ (আপনারা কী বলছেন)?' মনসুর জানাল, 'চার্জ বলেছি। বাঙালিদের অ্যাকসেন্ট তো, তাই অন্য রকম শোনাচ্ছে।' মনসুরকে কেউ ঘাঁটাতে চাচ্ছে না। আমরাও 'জয় বাংলা' বলে ফাইটিং চালিয়ে গেলাম। কোর্সের শেষ ভাগে বেয়নেট ফাইটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভাগ্যক্রমে আমি এতে প্রথম স্থান অধিকার করে একটি সুদৃশ্য ট্রফি অর্জন করি। কোর্সের চূড়ান্ত ফলাফল বের হলো, কোনো মেরিট লিস্ট প্রকাশিত হয়নি। আমার গ্রেডিং এওয়াই+। ক্যাপ্টেন মাহমুদ জানালেন, এর চেয়ে উচ্চতর গ্রেডিং কেউ পায়নি।

পল্টনে ফিরে এসে দেখি কাজী গোলাম দস্তগীরের পরিবর্তে কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বাঙালি লে. কর্নেল রেজাউল জলিল। আমেরিকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুদক্ষ অফিসার, মেজাজ কিছুটা কড়া ধাঁচের।

কোয়েটা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরেই নির্বাচনের উত্তাপ অনুভূত হলো। নভেম্বর মাসে পার্লামেন্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে জনগণ ভোট দিতে পেরেছে ১৬ বছর আগে, ১৯৫৪ সালে। সে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে সমূলে উৎখাত করে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে যুক্তফ্রন্ট, যার নেতৃত্বে ছিলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ে শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং নির্বাচনের পথ পরিহার করে ষড়যন্ত্রের পথ ধরে। যার ফলে সাধারণ মানুষ পরে বহু বছর আর ব্যালট বাক্সের নাগাল পায়নি। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা দুই মাসও শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকার ৯২(ক) ধারা প্রয়োগ

করে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ গণতন্ত্রপ্রিয়। ১৯৩৭ সাল থেকে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আসছে। পূর্ব বাংলার জনগণ মুসলিম লীগকে ১৯৪৬ সালে ভোট দিয়ে পাকিস্তান অর্জনের পথ সুগম করেছে, অথচ সে নির্বাচনে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তানে মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তানপন্থীরা বিজয়ী হতে পারেনি।

পাকিস্তান অর্জনের পরপরই বাঙালিদের স্বপ্নভঙ্গ হয়। ভাষার দাবি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দাবি, গণতন্ত্রের দাবি প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত হয়। চেপে বসে সামরিক শাসন। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনিরূপে শাসিত হতে থাকে। অধিকারবঞ্চিত মানুষ স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শিরোনামে একটি প্রচারপত্র বাঙালিদের জাগিয়ে তোলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ স্বাধিকার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। 'তোমার আমার ঠিকানা — পদ্মা, মেঘনা, যমুনা', 'ঢাকা না পিন্ডি—ঢাকা, ঢাকা'—এ ধরনের স্লোগান অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের লক্ষ্যে প্রদত্ত ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য জনগণ ইস্পাতদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা ছয় দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতারূপে গণ্য করেন। পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত গোয়েন্দা বিভাগ ইয়াহিয়াকে ধারণা দেয় যে দুই প্রদেশ মিলিয়ে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হতে পারবে না।

পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনী প্রচারণা জমে উঠেছে, এ সময় উপকূলীয় অঞ্চলে ১২ নভেম্বর আঘাত হানে এক ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস। ভোলা ও পটুয়াখালীর নিম্নাঞ্চলে অন্তত চার লাখ মানুষ নিহত হয়। ঘরবাড়ি, গবাদিপশু ও ফসল হারিয়ে অগণিত মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সেকালে রাস্তাঘাট ও টেলিযোগাযোগব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল এবং নিম্নমানের। ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ সংগ্রহ করতেই কেন্দ্রীয় সরকারের এক সপ্তাহের বেশি সময় কেটে গেল। ১০-১২ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিংবা সরকারের অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কেউ দুর্যোগকবলিত এলাকা পরিদর্শন করতে আসেননি। সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলো, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চীন সফর শেষে ঢাকা হয়ে রাজধানী পিন্ডিতে উড়ে গেলেন, কিন্তু দুর্যোগকবলিত এলাকা পরিদর্শন করতে গেলেন না। দেশের এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি কী নিদারুণ অবহেলা, অমানবিক আচরণ। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সহায়-সম্বলহীন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছায়। বয়োবৃদ্ধ মওলানা ভাসানী দুর্যোগকবলিত এলাকা পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করে এসে পল্টন ময়দানে এক

জনসভায় তাঁর সেই বিখ্যাত বা বহুল প্রচারিত খেদোক্তিটি করেন, 'ওরা কেউ আসেনি।' আমারও জনা বিশেক নিকটাত্মীয় ভোলার সেই ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারান। আমার পিতা লালমোহন উপজেলায় নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলেন, ভাগ্যক্রমে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। আমি চার দিনের ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি লালমোহনে যাই। রাস্তায়, খেতে, নদী-নালায় তখন অগণিত লাশ ভেসে আসছে। স্মরণকালের এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা দেখে হতবাক হয়ে পড়ি।

১২ নভেম্বরের ধ্বংসলীলার বিবরণ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রসমূহ রিলিফ টিম পাঠাতে থাকে উপকূলীয় অঞ্চলে। সরকার অবশেষে ত্রাণকার্যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে। সিঙ্গাপুর থেকে হেলিকপ্টার বহর নিয়ে এল ব্রিটিশ আর্মির রয়্যাল মেরিন কমান্ডো দল। আমার পল্টন ১ম ইস্ট বেঙ্গল পটুয়াখালী জেলার ত্রাণকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পেল। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে আমি 'বি' কোম্পানি নিয়ে গলাচিপা থানায় ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করি। সঙ্গে আমার কোম্পানি অফিসার সেকেন্ড লে. শফি ওয়াসিউদ্দিন, জিএইচকিউতে কর্মরত লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিনের পুত্র। এঁরা ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য। শফি কিছুটা পাগলাটে ধরনের তরুণ। কীভাবে কমিশন পেলেন, এটাই আশ্চর্যের বিষয়। সম্ভবত তাঁর ক্ষমতাবান পিতা এ ক্ষেত্রে কলকাঠি নেড়েছেন। পুরুষানুক্রমে ঢাকার বাসিন্দা হলেও তাঁরা বাঙালি বলে পরিচয় দিতেন না, নিজেদের কাশ্মীরি বলে জাহির করতেন। খাজা ওয়াসিউদ্দিন আর্টিলারি কোরে সাধারণ মানের অফিসার ছিলেন, পিতা খাজা শাহাবুদ্দিন আইয়ুব খানের ক্যাবিনেটে প্রভাবশালী মন্ত্রী থাকায় এবং পারিবারিক প্রভাবে জেনারেল পদে অভিষিক্ত হন।

লে. কর্নেল জলিল পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। সাহায্যকারীরূপে সঙ্গে রয়েছেন অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন নিসার। আমার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের মাধ্যম জিআরসি-৯ বেতারযন্ত্র। টেলিফোন-সংযোগ নির্ভরযোগ্য নয়, চিৎকার করে কথা বলতে হয়। গলার স্বর আরেকটু উঁচু করতে পারলে সম্ভবত টেলিফোন ছাড়াই পটুয়াখালীতে শোনা যেত। জেলা সদরের সঙ্গে সেকালে সড়কপথে যোগাযোগ সম্ভব ছিল না, লঞ্চ ও নৌকাই ছিল প্রধান অবলম্বন। গলাচিপা হাইস্কুলের ক্লাসরুমে আমার সৈনিকেরা অবস্থান করছে, আমি স্কুল প্রাঙ্গণে একটি তাঁবুতে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। স্কুল প্রাঙ্গণে অন্য একটি তাঁবুতে ব্রিটিশ রয়্যাল মেরিনের একটি প্লাটুন ডেরা গেড়েছে। এদের অধিনায়ক লে. রবার্টের সঙ্গে দুই দিনেই অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে।

ব্রিটিশ হেলিকপ্টারে চড়ে আমি ও রবার্ট প্রায় প্রতিদিনই বিশাল আগুনমুখা

নদী পেরিয়ে উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিই। তখনো উপকূলে বহু আদম সন্তানের লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। মানুষ ও গবাদিপশুর মৃতদেহ পচে ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এলাকায় মহামারি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্পিডবোটে চড়ে বিভিন্ন দ্বীপে গিয়ে আমাদের সৈনিকেরা এসব দেহাবশেষ মাটিচাপা দিচ্ছে।

পটুয়াখালীর সাধারণ মানুষ ১৯৭০ সালের আগে হেলিকপ্টার দেখার সুযোগ পায়নি। হাজার হাজার মানুষ এই অদ্ভুত বস্তু দেখার জন্য হেলিপ্যাডে প্রখর রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। বারবার দেখেও তাদের আশ মেটে না। রবার্ট আমাকে একদিন বলে, 'এরা তো হেলিকপ্টারের ওঠানামা দেখেছে। এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? এদের কোনো কাজ নেই?'

'এসব হতদরিদ্র মানুষের জীবনে কোনো বিনোদন নেই, সুতরাং লেট দেম এনজয়,' আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

আমি প্রতিদিনই গলাচিপা থানার বিভিন্ন এলাকায় স্পিডবোট নিয়ে ত্রাণ তৎপরতা তদারক করছি। একদিন সকালে পটুয়াখালীতে অবস্থিত ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার থেকে অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন নিসার আমাকে ফোন করেন। ইংরেজি ভাষায় কথোপকথন এ রকম :

'হ্যালো হাফিজ, খবরটবর কী? সব ঠিকঠাক চলছে তো?' বললেন নিসার।

'ইয়েস স্যার, সবকিছুই ঠিকমতো চলছে।'

'আচ্ছা, বরিশালে কি কালো কুকুর পাওয়া যাবে?'

'কালো কুকুর তো সবখানেই পাওয়া যায়। রিলিফ ওয়ার্কে কালো কুকুরের প্রয়োজন কেন?'

'হা হা হা ইয়ার, এত দেশ-বিদেশ ঘুরেও ফুটবল ছাড়া কিছুই চিনলে না তুমি। আরে, ব্ল্যাক ডগ হলো একপ্রকার হুইস্কির নাম। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রিয় ড্রিঙ্ক হলো এটি। তিনি আগামী পরশু সকালে তোমার এলাকায় আসবেন ত্রাণকার্য পরিদর্শনের জন্য। দুপুরে লাঞ্চ করবেন আমাদের সঙ্গে পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে। এখানে তাঁকে ব্ল্যাক ডগ সার্ভ করা হবে।'

শুনে অবাক হলাম। একে তো দেরি করে এসেছেন প্রেসিডেন্ট, উপরন্তু ভয়াবহ দুর্যোগকবলিত এলাকায় এসে দিনের বেলা প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে তাঁর কোনো সংকোচ নেই! বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হারিয়েছি মহাপ্লাবনে, মনটা বিষণ্ন ছিল। ক্যাপ্টেন নিসারকে বললাম, 'ব্ল্যাক ডগের খালি বোতলটা ইয়াহিয়ার শরীরে প্রবিষ্ট করালে কেমন হয়?'

'মন্দ হয় না, গুড আইডিয়া,' নিসারের মন্তব্য।

দুদিন পর চরকাজলে আমরা মানুষ ও গবাদিপশুর মৃতদেহ মাটিচাপা

দিচ্ছি, এ সময় হেলিকপ্টার থেকে অবতরণ করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। সঙ্গে একঝাঁক উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা। বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজিদ-উল-হকও ছিলেন। সিও লে. কর্নেল জলিল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন যে হাফিজের বাড়ি ভোলায়, সে বেশ কয়েকজন নিকটাত্মীয়কে হারিয়েছে মহাদুর্যোগে। আমি আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে প্রেসিডেন্টকে জানালাম।

হেলিকপ্টার দেখে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ ছুটে এল খাদ্যপ্রাপ্তির আশায়। খাদ্য নয়, তারা পেল বক্তৃতা, তা-ও উর্দু ভাষায়। এক বৃদ্ধ কান্নাকাটি করে তাঁর স্বজন হারানোর ব্যথা প্রেসিডেন্টের কাছে ব্যক্ত করেন। তিনি ঘর্মাক্ত কলেবর, কিছুটা বিরক্ত হয়ে আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'তুমি এই ওল্ডম্যানকে বলো, তুমি কতজন নিকটাত্মীয়কে হারিয়েছ?' আমি বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'চাচা মিয়া, দুঃখ করবেন না, আমিও আপনার মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।' প্রেসিডেন্ট বললেন, কান্নাকাটি করে লাভ নেই, মনে ফুর্তি রেখে কাজ করো। ভাতের বদলে রুটি খেলে দেহে শক্তি পাবে। ব্রিগেডিয়ার মজিদ তাঁর বক্তব্য বাংলায় তরজমা করলেন। একটু পরই প্রেসিডেন্ট হেলিকপ্টারে চড়ে বিদায় হলে হতাশ বৃদ্ধের উক্তি আমার আজীবন মনে থাকবে। তাঁর জিজ্ঞাসা, 'এই হালারা কারা?' চকিতে আমার মনেও প্রশ্ন জাগল, তাই তো, এরা কারা? জনগণ এদের ভাষা বোঝে না, ক্ষয়ক্ষতির এত দিন পর এসে সমবেদনা জানানো তো দূরের কথা, উল্টো হম্বিতম্বি করে গেলেন। এঁরাই রাষ্ট্রের কর্ণধার! বন্দুকের জোরে প্রেসিডেন্ট হয়ে বেতারে ভাষণ দেন, 'জনগণই সব ক্ষমতার উৎস'। সুদূর রাজধানীতে বসে হুইস্কির গ্লাস হাতে দুঃখী জনগণের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। দুর্যোগকবলিত মানুষের প্রতি সীমাহীন অবহেলার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয় এবং সামরিক জান্তার অমানবিক আচরণের প্রতিবিধান করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আমূল বদলে যায়।

পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্টের ভোজন হলো খাসা, 'কালো কুকুর'ও জোগাড় করা হয়েছে ঢাকা থেকে। খাদ্য ও পানীয়ের ব্যয় বহন করা হয়েছে দুর্যোগকবলিত মানুষের জন্য প্রদত্ত রিলিফ ফান্ড থেকে। ইয়াহিয়া রাতে ত্রাণকার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে রেডিওতে ভাষণ দিলেন, একপর্যায়ে বললেন, সেনাবাহিনীর লে. হাফিজ বেশ কয়েকজন নিকটাত্মীয় হারানোর পরও উপদ্রুত এলাকায় রিলিফ কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। প্রেসিডেন্টের মুখে আমার মতো অভাজনের নাম! বেশ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা চিঠির মাধ্যমে আমার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সিভিল

অ্যাওয়ার্ড 'তমঘা-ই-খেদমত'-এর জন্য আমার নাম সুপারিশ করে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হলো।

জলোচ্ছ্বাস-কবলিত উপকূলীয় এলাকার ৯টি আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হলো। ৭ ডিসেম্বর যথাসময়ে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ক্ষমতাসীন জান্তার হিসাবনিকাশ ভন্ডুল করে আওয়ামী লীগ সারা দেশে ১৫১টি আসনে জয়লাভ করে। ১৭ জানুয়ারি '৭১ উপকূলীয় এলাকার ৯টি আসনেও সহজেই আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিজয়ী হলেন। ভোলায় জাতীয় সংসদের দুটি আসন, এমএনএ নির্বাচিত হলেন আমার পিতা এবং প্রখ্যাত ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ।

পূর্ব পাকিস্তানে দুটি ছাড়া সব কটি আসনে (১৬০টি) বিজয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন দল আওয়ামী লীগ। এ দল পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন পায়নি। অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক (৮১টি) আসনে বিজয়ী হয় জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি। পূর্ব পাকিস্তানে এ দল কোনো আসনে প্রার্থীই দিতে পারেনি। সাধারণ নির্বাচনের আগে এবং অব্যবহিত পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে নির্বাচিত সরকারের কাছে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং একপর্যায়ে শেখ মুজিবকে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে আখ্যায়িত করেন। ভুট্টো আওয়ামী লীগের কাছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করেন এবং তাঁর প্ররোচনায় ইয়াহিয়া এবং সামরিক জান্তা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করতে থাকেন। ৩ মার্চ '৭১ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বলে ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টি ছাড়া অন্যান্য দলের কয়েকজন নবনির্বাচিত এমএনএ ঢাকায় অধিবেশনে যোগদানের জন্য উপস্থিতও হয়েছিলেন। এ সময় ভুট্টোর কুমন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হয়ে ইয়াহিয়া জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করেন। ফলে সারা পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সামরিক জান্তা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেন কিন্তু সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হন। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ নিজেদের প্রতারিত বলে মনে করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাদের স্লোগান 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

একাত্তরের ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগে সেনাবাহিনী দলের হয়ে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য পাঞ্জাবের মুলতান শহরে পৌঁছালাম। আমি ও ক্যাপ্টেন মাহমুদ হাসান* ল্যান্সারের অফিসার্স মেসে অবস্থান করি। মার্চের প্রথম সপ্তাহে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে আমরা পরাজিত হয়ে বিদায় নিই। ১৪ মার্চ তারিখে সব খেলোয়াড়কে নিজ ইউনিটে ফিরে যাওয়ার জন্য সেনা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেয়।

ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে, কিন্তু মুলতানে এর কোনো উত্তাপ অনুভূত হয়নি। বাঙালি অফিসাররা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিলেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কারও সঠিক ধারণা ছিল না। সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ, কিন্তু তবু মাঝেমধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হতো।

ইতিমধ্যে একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই হওয়ার কারণে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে। ভারত তার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকাগামী বিমানের টিকিট পাওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুলতানের কোর কমান্ডার লে. জেনারেল ওয়াসি উদ্দিনের এডিসি পদে কর্মরত ছিলেন আমাদের পল্টনের ক্যাপ্টেন সানোয়ার হুদা। তাঁর সহযোগিতায় লাহোর-ঢাকা রুটে বিমানের একটি সিট পেলাম। ১৬ মার্চ '৭১ দুপুরে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করি। প্রায় এক মাস পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি মোটেই অবহিত ছিলাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ছাত্র সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব ছিল না পশ্চিম পাকিস্তানে।

ঢাকা বিমানবন্দরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত বলে মনে হলো। এয়ারপোর্টে শত শত বিহারি গাট্টি-বোঁচকা, পরিবার-পরিজন নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য কয়েক দিন ধরে অপেক্ষা করছে। সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা উদ্যত সঙিন নিয়ে তাদের পাহারা দিচ্ছে, বাঙালি পেলেই দুর্ব্যবহার করছে। আমাদের পল্টনের ক্যাপ্টেন মনসুর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত। তার মেসে রাত কাটানোর ইচ্ছা ছিল। কোনো গাড়ি পাওয়ার আশায় ইতিউতি তাকাচ্ছি ব্যাগেজ সংগ্রহ করার পর। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একজন হাবিলদার, ডিউটি এনসিও ব্যাজ লাগানো। আমি তাকে ফৌজি

---

* পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার।

স্টাইলে ডাকলাম, 'হাওয়ালদার, ইধার আও (এদিকে এসো)।' আমার পরনে সিভিল পোশাক। সে কাছে আসার পর আমার পরিচয় দিলাম। সে স্যালুট করা তো দূরের কথা, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে অন্যদিকে চলে গেল কথার কোনো জবাব না দিয়েই। এ সময় উদয় হলো পাঞ্জাব রেজিমেন্টের উর্দি পরা এক লেফটেন্যান্ট। মনে হলো পিএমএতে তাকে দেখেছি। সে আমাকে স্যালুট করে বলল, 'স্যার, আপনি আমাদের বিএসইউও ছিলেন। কী করতে পারি আমি?' হাবিলদারের ব্যবহারে তখন আমার গা জ্বলছে। পাকিস্তান আর্মিতে এ তো অকল্পনীয়।

'আগে তোমার এনসিওর ডিসিপ্লিন ঠিক করো,' বললাম আমি।

'সরি স্যার, আমি বিষয়টি দেখছি।' পাঞ্জাবি লেফটেন্যান্ট বলল।

'থ্যাঙ্কস, সি ইউ,' বলে চলে এলাম।

দুই পা এগোতেই আমার কাছে দ্রুত পদক্ষেপে চলে আসে ২য় ইস্ট বেঙ্গলের ডিউটি এনসিও। সে ঘটনাটি দূর থেকে দেখেছে বলে মনে হলো। উত্তেজিত স্বরে আমাকে বলে, 'স্যার, দেশের অবস্থা ভালো নয়। পাইয়াদের (পাঞ্জাবি) সঙ্গে কথা না বলাই ভালো, সময় খারাপ। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনি কোথায় যাবেন?'

এক মাস দেশের বাইরে থাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির কিছুই জানি না। চট্টগ্রামে, উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যে বাঙালি-বিহারি ছোটখাটো দাঙ্গা চলছে। পাঞ্জাবি সৈনিকেরা বিহারি কলোনিতে পাহারা বসিয়েছে বলে আমাকে জানাল বাঙালি হাবিলদার। আমি ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করে তাকে বললাম আমাকে কমলাপুর রেলস্টেশনে নামিয়ে দেওয়ার জন্য।

'অবশ্যই স্যার, চলুন,' এনসিও বলল।

রাস্তায় যানবাহন কম। সবকিছু কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। ফার্মগেট এলাকায় দেখলাম ছাত্ররা চেকপোস্ট বসিয়ে এয়ারপোর্টগামী বিহারিদের গাড়ি, বাক্সপ্যাটরা ইত্যাদি তল্লাশি করছে। সেনানিবাস এলাকার বাইরে ছাত্রদের শাসন চলছে বলে ধারণা হলো।

কমলাপুরে এসে রাতের ট্রেনে চেপে সকালে যশোর রেলস্টেশনে পৌঁছালাম। পল্টনে খবর দিতে পারিনি। কোনো গাড়িও আসেনি আমাকে নেওয়ার জন্য। অটোরিকশাওয়ালারা ক্যান্টনমেন্ট যেতে চাচ্ছে না। তাদের চোখেমুখে আতঙ্ক। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একজন অটোচালককে রাজি করিয়ে ক্যান্টনমেন্টে রওনা দিলাম। ক্যান্টনমেন্টের প্রবেশপথে শানতলায় একটি চেকপোস্ট বসিয়েছে ২৫ বালুচ। সেন্ট্রি মেশিনগান তাক করে ইশারায় থামাল আমার অটোরিকশা। আমি পরিচয় দিলাম, বললাম, ১ম ইস্ট বেঙ্গলে যাচ্ছি। পরিচয় পাওয়ার পরও বালুচ সৈনিক কোনো সম্মান প্রদর্শন না করে

বলল, 'অটো ভেতরে যাবে না, নেমে যান।'

'কেন যাবে না অটো?' আমি রাগত স্বরে শুধালাম।

'অর্ডার নেই, ব্যস,' রুক্ষভাবে জবাব দিল এবং অটোচালকের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল।

আতঙ্কিত অটোচালক বলল, 'স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি স্যুটকেসসহ রাস্তায় নামতেই আতঙ্কিত অটোচালক ভাড়া না নিয়েই দ্রুত অটো চালিয়ে চলে গেল। আমি চেকপোস্টের ভেতরে ঢুকে ফিল্ড টেলিফোনে পল্টনে কল দিলাম গাড়ি পাঠাতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পল্টনের জিপ নিয়ে এল দুজন সশস্ত্র সৈনিক। জিপে উঠে অফিসার্স মেসে এলাম। জিপ ড্রাইভার বলল, 'স্যার, পাইয়ারা খুবই বাড়াবাড়ি করতাছে।' আরও জানাল, যশোর কাঁচাবাজারে দোকানিরা পাঞ্জাবিদের কাছে শাকসবজি, মাছ-মাংস বিক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আমাদের পল্টনের সৈনিকেরা সাদাপোশাকে বাজারে গিয়ে ওদের ইউনিটের জন্য বাজার নিয়ে আসে। শুনে অবাক হলাম বাঙালিদের এত ঘৃণা জমেছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ওপর।

৪মেসে এসে দেখি সব রুম খালি। সিও লে. কর্নেল রেজাউল জলিল এবং টুআইসি মেজর ইকবাল কোরেশি ছাড়া পল্টনের সবাইকে সীমান্ত এলাকায় ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দুই সপ্তাহ আগে। এ সময় আমাদের পল্টনে সৈনিকের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন শ। একটি পদাতিক ব্যাটালিয়নে সাত শ সৈনিক থাকার কথা। আমাদের পল্টন জুন মাসে দুই বছরের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোটে যাওয়ার জন্য নির্দেশ পেয়েছে। এ কারণে সাড়ে তিন শ সৈনিক প্রি-এমবারকেশন ছুটি ভোগ করছিল। এরা ফিরে এলে বাকি সাড়ে তিন শ ছুটিতে যাবে।

পরদিন ১৮ মার্চ আমাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে। মহেশপুর থানার এক গন্ডগ্রামে এসে 'এ' কোম্পানির দায়িত্ব নিলাম। যুদ্ধবিদ্যার নানা কার্যক্রম, যেমন আক্রমণ, রেইড, অ্যামবুশ ইত্যাদির মহড়া চলছে দিবারাত্রিব্যাপী। পল্টনের সিও লে. কর্নেল জলিল অবস্থান করছেন যশোর সেনানিবাসে। সপ্তাহে এক দিন এক্সারসাইজ এরিয়ায় এসে পরবর্তী ছয় দিনের প্রোগ্রাম দিয়ে, ঘণ্টা তিনেক থেকে ফিরে যান সেনানিবাসে। আমাদের সৈনিকদের জন্য রেডিও শোনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে কী ঘটছে, এ সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা দূরবর্তী সীমান্ত এলাকায় ট্রেনিংয়ে নিমগ্ন ছিলাম।

গৌরবের মুক্তিযুদ্ধ

২৫ মার্চ তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা শহরের বিভিন্ন জনপদে, ছাত্রাবাসে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে ভয়াবহ গণহত্যা চালায়। নিহত হয় অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর সৈনিক ও সাধারণ মানুষ। আমরা এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোনো সংবাদই পাইনি। ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল, জয়দেবপুরে ২য় ইস্ট বেঙ্গল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, ২৮ মার্চ সৈয়দপুরে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল গণহত্যার প্রতিবাদে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং প্রতিরোধসংগ্রামে লিপ্ত হয়। চট্টগ্রামে ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আশ্চর্যের বিষয়, সীমান্ত এলাকার গন্ডগ্রামে অবস্থান করার কারণে এসব চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারিনি।

২৯ মার্চ বেতার মারফত নির্দেশ পেলাম যশোর সেনানিবাসে ফিরে আসার জন্য। মধ্যাহ্নভোজের পর আমরা সাড়ে তিন শ সৈনিক যশোরের উদ্দেশে মার্চ করা শুরু করি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, রাত গভীর হলো, আমরা একটানা মার্চ করেই চলেছি। লোকালয় অতিক্রম করার সময় লক্ষ করলাম, আমাদের দেখে গ্রামবাসী পালিয়ে যাচ্ছে। অবাক হলাম, এমনটি তো কখনো হয়নি। ক্যান্টনমেন্টের প্রবেশপথে একদল সৈনিকসহ সুবেদার মেজর আজিম খান আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে অপেক্ষা করছেন। আমরা আমাদের আবাসস্থলে পৌঁছালাম। মেসে নিজ কক্ষে ঢুকে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

৩০ মার্চ '৭১। সকাল সাড়ে সাতটায় ১০৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আবদুর রহিম দুররানি ১ম ইস্ট বেঙ্গলে এসে সিও লে. কর্নেল জলিলকে জানালেন যে এই মুহূর্ত থেকে ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হলো। সৈনিকেরা কোনো অস্ত্র বহন করতে পারবে না। আদেশ জারি করেই তিনি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে চলে গেলেন। আমার ব্যাটম্যান দৌড়ে এসে অফিসার মেসে আমাকে জানায়, 'স্যার, আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে। একটু পরই বালুচ অফিসার এসে আমাদের কোতের (অস্ত্রাগার) চাবি নিয়ে যাবে।' হতভম্ব হয়ে গেলাম! একজন সৈনিকের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া চরম অবমাননার শামিল। সেকেন্ড লে. আনোয়ার আমার রুমেই ছিল। তাকে এ খবর জানাতেই সে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'স্যার, পাকিস্তান আর্মিতে আর চাকরি করব না। আমি অফিসে গিয়েই সিওর সামনে বেল্ট খুলে পদত্যাগ করব।' 'চলো, আগে অফিসে যাই, হারি আপ।' শান্তভাবে বললাম। পাশের রুমে তিনজন পাঞ্জাবি অফিসার নিসার, নাজির, ইকরামকে নিরস্ত্র করার খবর জানালাম। তারাও

অবাক হলো। বললাম, চলো, সবাই অফিসে যাই।

আমরা পাঁচজন ইউনিফর্ম পরে দ্রুত অফিস অভিমুখে ছুটলাম। অফিস এলাকায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ, ট্যা-টা, ঠা-ঠা-ঠা। দৌড়ে সিওর অফিসরুমে ঢুকলাম আমরা। তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে পায়চারি করছেন, দুচোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যার, হোয়াট হ্যাপেন্ড (কী হয়েছে)?'

'উই হ্যাভ বিন ডিসআর্মড (আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে)।' তাঁর জবাব।

এ সময় দৌড়ে রুমে এলেন সুবেদার মেজর আজিম খান, 'স্যার, গজব হো গিয়া। জওয়ানেরা কোত ভেঙে হাতিয়ার বের করে নিয়ে পার্শ্ববর্তী ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানির (পাঞ্জাবি) ওপর গুলিবর্ষণ করছে। বাঘাওয়াত হো গিয়া (বিদ্রোহ করেছে আমাদের জওয়ানেরা)। খোদাকে লিয়ে কুছ কিজিয়ে (আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু একটা করুন)। কান্নাভেজা কণ্ঠে মিনতি আজিম খানের। সবাই স্তম্ভিত। পাকিস্তানি বাহিনীতে বিদ্রোহ, এও কি সম্ভব? নিরস্ত্র করার খবর পেয়েই বাঙালি সৈনিকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা কমবেশি ক্ষিপ্ত ছিল, নিরস্ত্র করার পেছনে পাঞ্জাবিদের দুরভিসন্ধি রয়েছে ভেবে তারা চরমভাবে উত্তেজিত হয়ে অস্ত্রাগার ভেঙে হাতিয়ার বের করে নেয়। আমাদের সৈনিকেরাই প্রথম গুলিবর্ষণ করে পাঞ্জাবি ইউনিটের ওপর। পাঞ্জাবিরা এ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল। কারণ, ইতিমধ্যেই ইস্ট বেঙ্গলের চারটি ব্যাটালিয়ন পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এ খবর অবশ্য আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকেরা বিদ্রোহ দমনের প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিল। যশোর সেনানিবাসে আমাদের বিদ্রোহের ২০ মিনিটের মধ্যেই তারা পাল্টা গুলিবর্ষণ করে এবং তিন দিক থেকে আমাদের অফিস এরিয়ার ওপর আক্রমণ চালায়।

আমি একসময় সিওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যার, আমাদের ওপর আক্রমণ আসছে। আমরা এখন কী করব?' তিনি জবাব দিলেন না, শুধু বললেন, 'ও মাই গড, এখন কী হবে?' উপ-অধিনায়ক মেজর ইকবাল কোরেশি সাহসী পুরুষ। সিওর চার কোর্স সিনিয়র ছিলেন পিএমএতে। তিনি টেলিফোন হাতে নিলেন এবং ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন করে পাঞ্জাবি ভাষায় ব্রিগেড মেজর আসলাম খানকে আমাদের ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলেন। ব্রিগেড মেজর জানালেন, আগে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করুক।

পরিস্থিতি ভালোভাবে দেখার জন্য অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে পেছনের আমবাগানে গেলাম। আমাদের অফিস এরিয়ার চারদিকে পরিখা খনন করা ছিল আগে থেকেই। আমাদের সৈনিকেরা অস্ত্র হাতে নিয়ে পরিখায় অবস্থান

নিয়েছে। ২৫ বালুচ এবং ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সৈনিকেরা উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে এবং আক্রমণের চেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের সৈনিকেরা ইতিমধ্যেই কয়েকটি আক্রমণ প্রতিহত করেছে। শত্রুর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে।

একদল সৈনিক ও এনসিও নিয়ে এগিয়ে এলেন 'সি' কোম্পানির সিনিয়র জেসিও সুবেদার আবদুল মজিদ।

'স্যার, একটু কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে। ধৈর্য ধরে শুনবেন?' বললেন মজিদ।

'অবশ্যই, বলুন।' আমার উত্তর।

'স্যার, ২০ বছর চাকরি করেছি এ পল্টনে, আর এক সপ্তাহ পরই আমার রিটায়ারমেন্ট। আজ এক মহাবিপদ এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি আমরা। হয় বিজয়, নয়তো ধ্বংস অনিবার্য। আমরা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি কিন্তু আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি অতি সামান্য। একজন অফিসারও নেই আমাদের সঙ্গে। আপনি এখন থেকে আমাদের নেতৃত্ব দেবেন, প্লিজ।' মজিদ মিনতি করেন।

'আমি কেন, কমান্ডিং অফিসার আছেন। তাঁর কাছে যান।' আমার পরামর্শ।

'গিয়েছিলাম স্যার, ওনার বয়স হয়েছে। তাঁর পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব নয়। এখন আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।' বললেন মজিদ।

'ঠিক আছে। আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি সিওর সঙ্গে কথা বলে দেখি।' আমি বললাম।

অফিস ঘরে ফিরে এলাম। মেজর কোরেশি পাঞ্জাবি ভাষায় তখন পর্যন্ত ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। শত্রু থেমে থেমে গুলিবর্ষণ করছে। কয়েকটি এসে আমাদের অফিসের দেয়ালে আঘাত করেছে। মাঝেমধ্যে মর্টারের গোলা বিকট শব্দ করে অফিসের আশপাশে ফাটছে। ভাবলাম, এই তাহলে যুদ্ধ, এত দিন যার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। শত শত উড়ন্ত বুলেটের একটিই একজনের জন্য যথেষ্ট।

আমাকে দেখে সিও বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। বাংলাতে বললাম, 'স্যার, এভাবে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। আপনি নির্দেশ দিন আমাদের, লেট আস ফাইট ইট আউট।' তিনি কিছু বলার উদ্যোগ নিলেন, এ সময় পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন ইকরাম। কোনো জবাব পেলাম না, তিনি তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন।

বারান্দায় একটি খামের আড়ালে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছি, আমার করণীয় কী? এখানে অফিসরুমে ছয়জন অফিসারের সঙ্গে বসে থাকব, নাকি বিদ্রোহীদের

সঙ্গে যোগ দেব? এ বিদ্রোহের পরিণতিই-বা কী হবে? দুই মিনিট চিন্তাভাবনা করেই সিদ্ধান্ত নিলাম জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। আমি বিদ্রোহ করব এবং পল্টনের সৈনিকদের নেতৃত্ব দেব।

ফিরে এলাম আমবাগানে। সুবেদার মজিদ ও অন্যরা অপেক্ষা করছেন আমার জন্য।

সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম, 'আমি আছি আপনাদের সঙ্গে। তবে যুদ্ধ চলবে আমার নির্দেশে, সবাইকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।' আমার কথা শুনে যুদ্ধরত সৈনিকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে যায়। তারা চিৎকার করে ওঠে, 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার।'

আমি জেসিওদের ডেকে এনে যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলাম। কোথায় মেশিনগান বসাতে হবে, কীভাবে ফায়ার কন্ট্রোল করতে হবে, কীভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে—এসব বিষয়ে নির্দেশ দিলাম। আমাদের সৈনিকেরা একটি মর্টারও বের করতে পারেনি। কারণ, শত্রুর গোলায় আমাদের অস্ত্রাগার ধ্বংস হয়ে যায়। হঠাৎ মেগাফোনের শব্দ ভেসে আসে, 'শোনো জওয়ান, আমি সুবেদার মোজাম্মেল হক মণ্ডল বলছি। তোমরা ফায়ার বন্ধ করো। ব্রিগেড কমান্ডার সাহেব জানিয়েছেন, বিদ্রোহের কারণে কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না। আমরা পাকিস্তান আর্মির সৈনিকেরা একে অন্যের ভাই। সিও সাহেবের নির্দেশ, ফায়ার বন্ধ করো।'

আমি সৈনিকদের গুলিবর্ষণ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিলাম। ঘোষণা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অফিস ঘরের দিকে এগোলাম। সিও এবং অন্য অফিসাররা অফিস ঘর ছেড়ে পুকুরপাড়ে গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছেন, মেজর কোরেশি টেলিফোনে বাক্যালাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে দেখেই তিনি বলেন, 'হাফিজ, মেগাফোন হাতে নাও, সৈনিকদের ফায়ার বন্ধ করতে নির্দেশ দাও। আমাদের পক্ষ থেকে যেন আর একটি গুলিও ছোড়া না হয়।'

'স্যার, আমার পক্ষে এ ধরনের নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। ২৫ বালুচরা ফায়ার বন্ধ করছে না কেন?' আমি বললাম।

'তোমার মতলবটা কী? এটা ফুটবল খেলা নয়।' কোরেশি বললেন।

'আমি জানি এটা ফুটবল খেলা নয়। দুঃখিত,' বলে ফিরে এলাম বিদ্রোহীদের মধ্যে। একসময় সেকেন্ড লে. আনোয়ারকে ইশারায় ডেকে নিলাম।

'আমি বিদ্রোহ করেছি, তুমি কী করবে?' আমার প্রশ্ন।

'স্যার, আমি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে আছি, লেট আস ফাইট ইট আউট,' আনোয়ার তেজোদীপ্ত কণ্ঠে জানাল।

একসময় ক্যাপ্টেন নিসার পরিস্থিতি জানার জন্য আমাদের দিকে এগিয়ে এল। কৃতী সাঁতারু হাবিলদার সাহেব মিয়া তাকে জাপটে ধরে লাইট মেশিনগানের নল ঠেকায় তার মাথায়, গুলি করতে উদ্যত হয়।

'আরে আরে, কেয়া কর রহে হো (কী করছ),' বলে আমার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে। আমি সাহেব মিয়াকে কলার ধরে টেনে আনলাম এবং কড়া ধমক দিলাম। বললাম, এরা তো নির্দোষ, এ ধরনের কাপুরুষতা আমাদের সাজে না। এলএমজিসহ সাহেব মিয়াকে উত্তর দিকের ট্রেঞ্চে পাঠিয়ে দিলাম। কৃতজ্ঞ নিসার বলে, 'আমিও সিনিয়র টাইগার, একটি হাতিয়ার দাও, আমিও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে শামিল হব।' আমি বললাম, তার প্রয়োজন হবে না। তুমি অন্য অফিসারদের সঙ্গে বসে থাকো এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করো। সে দ্রুত পায়ে সিওর কাছে ফিরে গেল।

বিকেল চারটা প্রায় বাজে। আট ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলছে। আমাদের সৈনিকেরা কয়েকটি আক্রমণ সফলভাবে প্রতিহত করেছে। সুবেদার মজিদ এসে জানালেন যে অ্যামুনিশন প্রায় শেষ। মুহূর্তের উত্তেজনায় বিদ্রোহ করেছে সৈনিকেরা, অ্যামুনিশন দুই পকেটে ভরেছে তাড়াহুড়ো করে। আমাদের কোতের পাশেই ছিল ৭ম ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অফিস। এদের কিছু সৈনিকও আমাদের বিদ্রোহে যোগ দেয়। আমাদের সৈনিকেরা তাদের চায়নিজ রাইফেলে গুলি ছোড়া শিখিয়ে দেয়। তারাও মহা উৎসাহে আকাশে এবং পাশের পাঞ্জাবি ইউনিটের দিকে গুলি ছুড়তে থাকে। গুলি যেহেতু ফুরিয়ে যাচ্ছে, জেসিওদের ডেকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম, ছোট ছোট গ্রুপে ফায়ার অ্যান্ড মুভ কৌশল ব্যবহার করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আরভি, অর্থাৎ একত্র হওয়ার স্থান নির্ধারণ করলাম চৌগাছা বাজার এলাকা।

তিন-চারজনের গ্রুপে ধীরে ধীরে সৈনিকেরা পরিখা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া শুরু করে। শত্রু তিন দিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে। চতুর্থ দিক, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে রয়েছে খোলা ফসলের খেত। ফসলহীন খেত শত্রুপক্ষ ফায়ার দিয়ে কভার করছে। গুলির আঘাতে ধুলা উড়ছে। এই গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়েই আমাদের বেরোতে হবে। অন্য কোনো পথ নেই। শত্রু আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পশ্চিম দিকে গুলিবর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিল। আমরা তাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যেই রয়েছি। আমাদের অবশিষ্ট মেশিনগানসমূহ গুলিবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে তারা দেখেশুনে অ্যাইমড ফায়ার না করতে পারে।

সাড়ে চারটার দিকে আমি ও আনোয়ার আলাদা আলাদা গ্রুপে শুকনা খেতের মধ্য দিয়ে পার্শ্ববর্তী খিতিবদিয়া গ্রামের দিকে এগিয়ে গেলাম গুলিবর্ষণ করতে করতে। প্রায় আট শ গজ দূরে অবস্থিত গ্রামে পৌঁছেই দেখি এক

অবিশ্বাস্য দৃশ্য। শত শত গ্রামবাসী কোদাল, খন্তা, কুড়াল, বর্শা ইত্যাদি দেশি অস্ত্র হাতে নিয়ে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে। 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে তারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তারা ডাব, কলা ও গ্রামীণ খাবার দিয়ে আমাদের সৈনিকদের আপ্যায়ন করে। এখানেই এক সাংবাদিকের কাছে শুনলাম ঢাকায় গণহত্যা চালিয়ে বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি সেনারা। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি সেনারা আটক করেছে। চট্টগ্রামে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করেছেন। সারা দেশে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর সৈনিকেরা বিদ্রোহ করে প্রতিরোধসংগ্রাম গড়ে তুলেছে। অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে মন। এতক্ষণ ধারণা ছিল, দেশে একমাত্র আমরাই বিদ্রোহ করেছি। এর পরিণতি নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলাম। সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়েছে জেনে স্বস্তি বোধ করি। জনতার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে অসীম বল ফিরে পেলাম। আমরা ক্ষুদ্র দল নই, লাখ লাখ, কোটি দেশবাসী রয়েছে আমাদের সঙ্গে। বিজয় আমাদের হবেই।

চৌগাছার কাছাকাছি গিয়ে জানতে পারলাম, সীমান্তবর্তী এলাকার ইপিআর সৈনিকেরাও বিদ্রোহ করেছে। তারা আমাদের সৈনিকদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিকটস্থ মাসিলা বিওপিতে নিয়ে গেছে। স্থানীয় এক যুবক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাসিলার উদ্দেশে। ইতিমধ্যে রাত গভীর হওয়ায় এক গ্রামে যাত্রাবিরতি করি। এক গৃহস্থের বাড়িতে রাত কাটিয়ে সকালবেলা পৌঁছে যাই মাসিলা বিওপিতে। ইপিআর সৈনিকেরা পুরি ও চা দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করে।

আমাদের বিদ্রোহী সৈনিকেরা ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে সেখানে। তারা এসে আনন্দে জড়িয়ে ধরে আমাকে। কিছুক্ষণ পর পেলাম এক দুঃসংবাদ। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় খেতের মাঝামাঝি স্থানে লে. আনোয়ারের কোমরে শত্রুর মেশিনগানের বার্স্ট বিদ্ধ হয় এবং রক্তক্ষরণের ফলে সেখানেই সে শাহাদত বরণ করে। সঙ্গের সৈনিকেরা তাকে বহন করে নিয়ে যায় হযরতপুর গ্রামে, কবি নজরুল ইসলাম কলেজের সামনে যশোর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের পাশে তাকে দাফন করা হয়। নায়েক তাজুল ইসলাম তার রক্তমাখা বেল্টটি আমার হাতে তুলে দেয়। আমার বেল্ট খুলে আনোয়ারের বেল্টটি পরে নিই। তার তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল মানসপটে ভেসে ওঠে, Heroes die young। গতকাল বলেছিল, সিওর সামনে গিয়ে বেল্ট খুলে চাকরিতে ইস্তফা দেবে, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সেই বেল্ট শহীদের রক্তে রঞ্জিত হলো।

চৌগাছার হাজার হাজার ছাত্র-যুবক পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত, তারা শুধু অস্ত্র চায়। দেশের জন্য তাদের প্রাণ উৎসর্গ করার এই মনোভাব দেখে অভিভূত হলাম। একজন সাংবাদিকের কাছ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্বে গঠিত মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা সম্পর্ক অবহিত হলাম। ৩০ মার্চ ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরীর নেতৃত্বে ইপিআর ও ছাত্র-জনতা কুষ্টিয়ায় অবস্থানরত ২৭ বালুচের একটি কোম্পানিকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে। কোম্পানি কমান্ডার মেজর শোয়েব নিহত এবং লে. আতাউল্লাহ জীবিত অবস্থায় বন্দী হয়।

সকাল নয়টায় ১ম ইস্ট বেঙ্গলের বিদ্রোহী সৈনিকদের উদ্দেশে বক্তব্য দিলাম। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে তাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানালাম। ২০০ সৈনিক এবং ৯ জন জেসিও মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ নেয়। জানালাম যে এখন থেকে তারা মুক্তিবাহিনীর সৈনিক, সামরিক বাহিনীর নিয়মকানুন-শৃঙ্খলা পেশাদার বাহিনীর মতোই তাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে। এভাবেই নবজন্ম লাভ করে ১ম ইস্ট বেঙ্গল, এক তরুণ অফিসারের নেতৃত্বে তারা স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যশোর আমাদের বিদ্রোহ করার আধা ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানি সেনারা ৭ম ফিল্ডের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল ডা. আবদুল হাই এবং কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপ্টেন শেখকে হত্যা করে। ১ম ইস্ট বেঙ্গলের ১০০ সৈনিক ক্যান্টনমেন্টে থেকে যায়। তাদের বন্দী করা হয় এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। লে. কর্নেল রেজাউল জলিলকেও বন্দী করা হয় এবং কয়েক মাস পর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইপিআর উইং কমান্ডার মেজর ওসমান চৌধুরী চুয়াডাঙ্গায় বিদ্রোহ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ২ এপ্রিল তারিখে চুয়াডাঙ্গায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। আমরা সার্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি। তিনি দুটি রিকোইলেস রাইফেল (ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র), জিপ ও চায়নিজ অ্যামুনিশন আমাকে দেন। এখানেই দেখা হলো আমার বাল্যবন্ধু মেহেরপুরের এসডিও তওফিক-ই-এলাহী চৌধুরী এবং ঝিনাইদহের মহকুমা পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন আহমদের সঙ্গে। তিন বন্ধু সারা রাত এসডিওর বেডরুমে শুয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করলাম। তওফিক মেহেরপুরে এবং মাহবুব ঝিনাইদহে পুলিশ ও আনসারদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চুয়াডাঙ্গার এসডিও সিদ্দি, সদ্য বিবাহিত। এ দম্পতির নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র বেডরুমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, শুধু তারাই নেই। তওফিক

বলল, 'বহুবার এ দম্পতির উষ্ণ আতিথেয়তা উপভোগ করেছি, আজ তাদের বাঁচিয়ে রাখাই মুশকিল। উন্মত্ত জনতা তাদের হত্যা করতে চায়। এ দম্পতিকে মেহেরপুর কারাগারে রাখা হয়েছে জীবন রক্ষা করার জন্য।' একসময় এ দম্পতিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

এক মহান সংগ্রামের পটভূমিতে তিন বন্ধুর পুনর্মিলন এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। পরদিন দুটি মিগ জেট বিমান এসে চুয়াডাঙ্গায় রকেট নিক্ষেপ করে। বিমান আক্রমণের মুখে অসহায় মেজর ওসমান বিনা প্রতিরোধে চুয়াডাঙ্গা ত্যাগ করে মেহেরপুরে রক্ষণব্যূহ গড়ে তোলেন।

৩ এপ্রিল ফিরে এলাম চৌগাছায়। বাজারকে পেছনে রেখে যশোরের দিকে মুখ করে প্রধান সড়কের ওপর রক্ষণব্যূহ তৈরি করি। স্থানীয় জনগণ আমাদের খাদ্য, রসদ ইত্যাদি জোগান দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। মহেশপুরের খাদ্যগুদামের তালা ভেঙে স্থানীয় জনগণ চৌগাছায় যুদ্ধরত সৈনিকদের খাদ্য সরবরাহ করে।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে মাসিলা বিওপিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) কর্মকর্তা লে. কর্নেল মেঘ সিং, কমান্ডার মুখার্জি এবং ক্যাপ্টেন কে বি সিং। তাঁরা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিলেন। মেঘ সিং ১৮ বিএসএফের সিও, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডো অফিসার। '৬৫-এর যুদ্ধে 'বীরচক্র' খেতাব পান। সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমাদের মধ্যে।

মেঘ সিংয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আমার ব্যাটালিয়নকে বেনাপোল এলাকায় নিয়ে এলাম। যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে (গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড) কাগজপুকুর গ্রামে যশোরের দিকে মুখ করে রক্ষণব্যূহ গড়ে তুলি। আমার ২০০ সৈনিক এবং ইপিআরের দেড় শ সৈনিক নিয়ে বাঙ্কার খুঁড়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তুলি। প্রধান সমস্যা যোগাযোগের মাধ্যম বেতারযন্ত্র না থাকা। মর্টারের অভাবে ডিফেন্স অনেকটা দুর্বল রয়ে গেল।

১৭ এপ্রিল আমি ও মেঘ সিং মেজর ওসমানের সঙ্গে দেখা করার জন্য ভারতীয় ভূখণ্ডে সড়কপথে যাত্রা করি। সকালে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে মেহেরপুরের পতন ঘটে। ওসমান ও ইপিআর বাহিনী ভারতীয় বিওপি বেতাইতে অবস্থান নেন। মিসেস ওসমান অত্যন্ত সাহসী নারী। এহেন দুর্যোগের মধ্যেও তিনি আমাদের সুগৃহিণীর মতো মাংস-পরোটা দিয়ে আপ্যায়ন করেন। ওসমান জানালেন, সেদিন দুপুরে সদ্য গঠিত বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবে।

গঠিত হলো বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা অর্থাৎ মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর সফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে একত্র হন। কর্নেল ওসমানীও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ইতিমধ্যে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ক্র্যাকডাউনের পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা অনেকে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। কর্নেল ওসমানী '৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। সেনা কর্মকর্তারা জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সরকার গঠনের জন্য আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের কাছে প্রস্তাব করেন। নির্বাচিত সরকার গঠিত হলে বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তাকে স্বীকৃতি দেবে। ১০ এপ্রিল ভারতের সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল সে সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম বৈদ্যনাথতলা, তিন দিক থেকে ভারতীয় ভূখণ্ড বেষ্টিত। এখানে বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে আমবাগান। সেখানে দুটি কাঠের চৌকি জোড়া দিয়ে মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। কোনো সাজসজ্জা বা জৌলুশ নেই। হাজার হাজার জনতা সীমান্তের উভয় পার থেকে এসে আমবাগানে সমবেত হয়েছে। সবার চোখেমুখে ঔৎসুক্য। আমরা বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বৈদ্যনাথতলায় পৌঁছলাম। নেতারা যথাসময়েই সেখানে এসে পৌঁছেছেন। রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার দেওয়ার দায়িত্ব ইপিআর সেনাদলের, কিন্তু আমাদের পৌঁছতে কিছুটা দেরি হওয়ায় এসডিপিও মাহবুবউদ্দিন আটজন আনসারের সমন্বয়ে একটি দল নিয়ে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার দেন। এখানেই দেখা হলো প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে। তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে আর্মি সার্ভিস কোরে কমিশনপ্রাপ্ত, ২য় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর চালচলন বা ম্যানারিজমে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ঐতিহ্য দৃশ্যমান। হালকা-পাতলা গড়ন, প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বিশাল গোঁফ তাঁর মুখমণ্ডলের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সহজেই সমীহ আদায় করে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে তিনি পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হন এবং ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসাররূপে দায়িত্ব পালন করেন।

আমাকে দেখে ভারি খুশি হলেন প্রধান সেনাপতি ওসমানী। পিঠ চাপড়ে দিয়ে অভিনন্দন জানালেন, 'ওহ মাই বয়, জলি গুড শো।'

'থ্যাংক ইউ স্যার,' আমি বললাম।

'আমি পরশুদিন বেনাপোলে যাব সিনিয়র টাইগারদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।' ওসমানী বললেন।

'মোস্ট ওয়েলকাম স্যার, আমরা অপেক্ষায় থাকব।' আমি বললাম।

উপস্থিত চারজন—সেনা কর্মকর্তা মেজর ওসমান, ক্যাপ্টেন এ টি সালাহউদ্দিন, ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমানের* সঙ্গে পরিচিত হলেন প্রধান সেনাপতি। ছোট মঞ্চের পাশে ছয়টি কাঠের ফোল্ডিং চেয়ারে উপবিষ্ট হলাম ভারতের লে. কর্নেল মেঘ সিংসহ আমরা ছয় অফিসার।

একটু পরই অনুষ্ঠান শুরু হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হলো। কিন্তু তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। ফলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিরূপে শপথ গ্রহণ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমদ মন্ত্রীরূপে শপথ নেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক মো. ইউসুফ আলী। কর্নেল ওসমানীকে মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে প্রধান সেনাপতি পদে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দেওয়া হলো। শতাধিক বিদেশি সাংবাদিক মুভি ক্যামেরা নিয়ে এ অনুষ্ঠান কাভার করেন। শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ইংরেজি ভাষায় চমৎকার একটি বক্তব্য দেন। বাঙালিদের বঞ্চনার ইতিহাস, ২৫ মার্চের গণহত্যা, পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার কথা তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় উত্থাপন করেন। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আবেদন জানান। হাজার হাজার শ্রোতা-দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর সে বক্তব্য শোনে।

আম্রকাননের অনুষ্ঠান, পরিবেশ, পরিস্থিতি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী, হাজারো মুক্তিকামী মানুষের পদভারে প্রকম্পিত। কয়েক কিলোমিটার দূরেই পলাশীর আম্রকানন, ১৭৫৭ সালে সেখানেই বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। আজ আরেক আম্রকাননে স্বাধীনতার সূর্য আবার উদিত হলো। একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে, আর আমরা তার কুশীলবের ভূমিকায়। অবিশ্বাস্য এক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। প্রকৃতি আজ নিজের হাতে এই আম্রকাননকে সাজিয়েছে। পড়ন্ত বেলায় সূর্যের আলো পাতার ফাঁকে ফাঁকে, মঞ্চের ওপরে, আমাদের চোখেমুখে পড়ছে। আলোছায়ার খেলা আমাদের যেন অন্য ভুবনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা সে আলোর পথের অভিযাত্রী। একসময় অনুষ্ঠান শেষ হলো, কিন্তু মুগ্ধতার রেশ ছড়িয়ে রইল আমাদের মনে। আমরা ফিরে চললাম রক্ষণব্যূহ অভিমুখে।

---

* জেনারেল, পরবর্তীকালে সেনাপ্রধান।

মেজর ওসমানকে অনুরোধ করলাম ইপিআর বাহিনীকে বেনাপোলে নিয়ে আসার জন্য। তিনি রাজি হলেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে কয়েকটি সেক্টরে ভাগ করে সেনানায়কদের সেসব সেক্টর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো। ওসমান ৮ নম্বর সেক্টরের, আমি বেনাপোল সাব-সেক্টরের কমান্ডার। ১৯ এপ্রিল কর্নেল ওসমানী সিনিয়র টাইগারদের সঙ্গে মিলিত হতে বেনাপোলে আসেন। তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পেরে উৎসাহিত বোধ করি। তিনি ১ম ইস্ট বেঙ্গলকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ৬০০ যুবককে রিক্রুট করার জন্য নির্দেশ দেন আমাকে। দুই দিন পর সেনা সদর দপ্তর থেকে অফিশিয়াল চিঠি নিয়ে এল ক্যাপ্টেন শরিফুল হক ডালিম। সে কয়েক দিন আগে লে. নূর ও লে. মতিকে সঙ্গে নিয়ে কোয়েটা থেকে পালিয়ে ভারতে আসে এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। ডালিমকে গেরিলা বাহিনীর জন্য ৫০০ যুবক রিক্রুট করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

রণাঙ্গনে প্রাণপণ লড়াই

২৩ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন মিডিয়াম কামানের সহায়তা নিয়ে কাগজপুকুরের ওপর আক্রমণ চালায়। আমাদের রক্ষণব্যূহের সামনে ইপিআরের দুই কোম্পানি, পেছনে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের দুই কোম্পানি। ইপিআর সৈনিকেরা মুহুর্মুহু কামানের গোলার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। হাবিলদার মুজিবুর রহমান বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে শহীদ হন। তাঁকে মরণোত্তর বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়। কাগজপুকুরে দীর্ঘ সময় পাকিস্তানি বাহিনীকে ঠেকানো সম্ভবপর ছিল না। আমার প্ল্যান ছিল শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে পিছিয়ে এসে আবার রক্ষণব্যূহ গড়া। ১ম ইস্ট বেঙ্গলের দুই কোম্পানি বেনাপোল চেকপোস্টের এক কিলোমিটার পূর্বে নতুনভাবে ডিফেন্স নেয়। সৈনিকদের নির্দেশ দিলাম, মাতৃভূমির এই ক্ষুদ্র অংশটুকু জীবনের বিনিময়েও রক্ষা করতে হবে। বেনাপোল চেকপোস্টে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা পতপত করে উড়ছে, পৃথিবীর বহু দেশে টেলিভিশনের মাধ্যমে এ দৃশ্য সবাই দেখছে। পাকিস্তান সরকার স্থানীয় কমান্ডারকে আদেশ দিয়েছে এ পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলনের জন্য।

গ্রান্ড ট্রাংক রোড মাঝখানে রেখে আমাদের দুটি কোম্পানি বাঙ্কার খুঁড়ে শক্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। প্রতিদিন পাকিস্তানি বাহিনী কামানের সাহায্য নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করে, আমরা প্রতিটি আক্রমণ

সফলভাবে প্রতিরোধ করি। লে. মেঘ সিংকে অনুরোধ করে ৬টি ৩ ইঞ্চি মর্টার সংগ্রহ করি তাঁর কাছ থেকে। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধাদের পক্ষে এলাকা রক্ষা করা খুব কঠিন নয়। আমরা মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছি। প্রতিদিন শেলের আঘাতে আমাদের পক্ষে হতাহত হচ্ছে কিন্তু শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি আমাদের তুলনায় অনেক বেশি। মহাসড়কের ওপর রয়েছে শতবর্ষী বিশাল বৃক্ষরাজি, যা আমাদের কামানের গোলা থেকে কিছুটা প্রটেকশন দেয়।

ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের বীরোচিত সংগ্রামের কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী জনমত সংগঠিত হয় স্বাধীনতার সপক্ষে। পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের কয়েকজন লন্ডন, ওয়াশিংটন, কলকাতা, দিল্লি, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। অন্যদিকে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে তাদের অত্যাচার-নির্যাতন ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে নিরীহ মানুষ হত্যা, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নারী নির্যাতন করে পাকিস্তানি সেনারা এক নারকীয় তাণ্ডব সৃষ্টি করে। প্রায় এক কোটি নির্যাতিত মানুষ প্রাণভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। সেদেশের সরকার তাদের আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। শরণার্থীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হাজার হাজার ছাত্র-যুবকের দল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। তাদের দেওয়ার মতো অস্ত্র আমাদের নেই। ভারত সরকার সমরাস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে তখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। সীমান্তে ছাত্র-যুবকদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বহু ইউথ ক্যাম্প। অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামীণ যুবকেরা। অস্ত্র ও ট্রেনিং পেলেই তারা গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাদের দেখে অবাক হলাম, বাঙালির এই শৌর্যবীর্য, দেশাত্মবোধ এত দিন কোথায় ছিল? পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা ঘুমন্ত বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে দিয়েছে। সামান্য অস্ত্র সম্বল করে তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে যাচ্ছে। বিশ্বে কেউ আর আমাদের ভেতো বাঙালি বলে সম্বোধন করে না। পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে এবং ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মুক্তিবাহিনীকে সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়ার জন্য। ভারতীয় বাহিনীর চার্লি সেক্টরের হেডকোয়ার্টার পেট্রাপোলে অবস্থিত। এর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সালিক এবং বিএম বাঙালি মেজর শঙ্কর রায় চৌধুরী।* শঙ্কর একদিন

---

* পরবর্তীকালে জেনারেল, ভারতের সেনাপ্রধান।

আলাপচারিতায় আমাকে বলেন, 'তোমাদের মুক্তিযুদ্ধ ভারতীয় বাঙালিদের জাতে তুলে দিয়েছে। এখন শিখ, রাজপুতরা আমাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে।' ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসাররা মাঝেমধ্যে ছুটি নিয়ে বেনাপোলে আসতেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, মুক্তিযুদ্ধের উত্তাপ অনুভব করার জন্য। মেঘ সিং তো মুক্তিবাহিনীর সাহসিকতা দেখে অভিভূত। একদিন আমাকে বললেন তিনি চাকরি থেকে অকালীন অবসর নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে চান। অনেক বলেকয়ে তাঁকে নিরস্ত করি।

পাকিস্তানি বাহিনী বহু আক্রমণের পরও বেনাপোল চেকপোস্ট এলাকা দখল করতে পারছে না। তারা উপর্যুপরি কামানের গোলা ছুড়ছে, যার কয়েকটি পেট্রাপোল-বনগাঁতে আঘাত হেনে কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু ঘটিয়েছে। এ অবস্থায় এলাকার জনগণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে গোলাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য। একদিন সকালে ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা পেট্রাপোলে এলেন এবং দেখা করার জন্য আমাকে খবর পাঠালেন। আমি ডিফেন্স পজিশন থেকে চেকপোস্ট পেরিয়ে পেট্রাপোলে এলাম। এমন সময় কাকতালীয়ভাবে পাকিস্তানি সেনাদের কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হলে তাতে অরোরা বিচলিত না হয়ে এগিয়ে এসে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। যশোরে বিদ্রোহের জন্য আমার ভূয়সী প্রসংসা করে তিনি আসল কথা পাড়লেন। তিনি বললেন, বেনাপোল চেকপোস্টের ক্ষুদ্র এলাকা দখলে রেখে খুব একটা লাভ হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অন্যান্য চেকপোস্ট পাকিস্তানি বাহিনী দখল করে নিয়েছে। একটানা যুদ্ধ করার কারণে আমার সৈনিকেরা শ্রান্ত-ক্লান্ত, বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছে। আমার উচিত হবে বেনাপোল এলাকা ছেড়ে দিয়ে ভারতের পেট্রাপোল এলাকায় প্রবেশ করে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া। তিনি সব ধরনের সহযোগিতা করবেন আমার ব্যাটালিয়নকে। এত দিনের শক্ত ডিফেন্স ছেড়ে চলে আসা আমার মনঃপূত নয়, আমি ইতস্তত করছিলাম। এমন সময় এগিয়ে এলেন লে. কর্নেল মেঘ সিং। আজই তাঁকে প্রথমবার ইউনিফর্ম পরা দেখলাম। স্মার্ট স্যালুট করে অরোরাকে বললেন, 'স্যার, আমি মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেন হাফিজকে কথা দিয়েছি, চেকপোস্টে উড্ডীয়মান বাংলাদেশের পতাকা কেবল আমার মৃতদেহের ওপর দিয়েই নামানো সম্ভব। আমি পদত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

লে. জেনারেলের সামনে লে. কর্নেলের এমন মন্তব্য একেবারেই অশোভন। অরোরা অবাক হলেন কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিলেন নিজেকে। একটু হেসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করলেন এবং মেঘ সিংয়ের পেটে ব্যাটন দিয়ে হালকা গুঁতো দিয়ে বললেন 'ইউ ক্রেজি গুফি, তুমি এখানেও

আছ। রিল্যাক্স ম্যান।' বোঝা গেল, মেঘ তাঁর পূর্বপরিচিত ও স্নেহভাজন। ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ককে আশ্বস্ত করলাম যে আমি বেনাপোল ডিফেন্স ছেড়ে আসতে পারি, তবে বাংলাদেশ বাহিনী সদর দপ্তর থেকে আমাকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হোক। অরোরা হেসে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'অফকোর্স, অল দ্য বেস্ট' এবং কলকাতার উদ্দেশে ফিরে গেলেন।

আমি মেঘ সিংয়ের স্মার্ট বক্তব্যে অভিভূত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মানবতার জন্য সংগ্রাম। বিদেশিদেরও যে তা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, এ ঘটনা তার প্রমাণ।

দুই দিন বাংলাদেশ বাহিনী সদর দপ্তর থেকে চিঠি এল ১ম ইস্ট বেঙ্গলকে বেনাপোল এলাকা ছেড়ে নতুন ৬০০ রিক্রুটসহ মেঘালয়ের তেলঢালা যেতে হবে। সেখানে সদ্য ভর্তি করা ছাত্র-যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ১ম ইস্ট বেঙ্গল একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাটালিয়নে পরিণত হয়েছে। আমি একমাত্র অফিসার হিসেবে কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করছি। আমি ১৫ জন এনসিওকে জেসিও (নায়েব সুবেদার) ও ১০ জন নায়েব সুবেদারকে সুবেদার পদে প্রমোশন দিলাম। জ্যেষ্ঠতম জেসিও সুবেদার আবদুল মজিদকে সুবেদার মেজর পদে প্রমোশন দিয়ে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সেনা সদরে পাঠিয়ে দিলাম। মুক্তিবাহিনীতে কোনো বেতন নেই, কিন্তু পদোন্নতিপ্রাপ্তরা খুবই উৎসাহিত হলো। বাংলাদেশ বাহিনী সদর দপ্তর এ ধরনের ঢালাও পদোন্নতি অনুমোদন করতে চায়নি। আমি প্রধান সেনাপতিকে অনেক বুঝিয়ে অনুমোদন নিলাম। সিনিয়র টাইগারদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা সর্বজনবিদিত।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি স্পেশাল ট্রেনে চড়ে ব্যাটালিয়ন নিয়ে আমি বেনাপোল থেকে গুয়াহাটি পৌঁছলাম। ট্রেনযাত্রার ঘণ্টাখানেক আগে ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান নিয়োগপত্র নিয়ে পল্টনে যোগ দিলেন। এত দিন পর একজন অফিসারকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। মাহবুব ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের অফিসার, আমার পূর্বপরিচিত। কোয়েটার ইনফ্যান্ট্রি স্কুলে একই রুমে বাস করে আমরা ওয়েপন কোর্স করেছিলাম। দুই দিনের ট্রেনযাত্রায় অনেক গল্পগুজব হলো তাঁর সঙ্গে। কোয়েটার আনন্দমুখর দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করে চমৎকার সময় কাটালাম। যাত্রার সূচনায় বহুল আলোচিত ফারাক্কা ব্যারাজের ওপর দিয়ে গঙ্গা নদী পার হলাম। গুয়াহাটিতে আমাদের অভ্যর্থনা জানান বাঙালি ব্রিগেডিয়ার কে পি লাহিড়ী। তিনি দেরাদুন একাডেমিতে কর্নেল ওসমানীর ব্যাচমেট ছিলেন বলে জানালেন। গুয়াহাটিতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে ট্রাকে সওয়ার হয়ে দীর্ঘ পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে আমরা মেঘালয় রাজ্যের তেলঢালায় পৌঁছলাম।

মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী তুরার মাইল দশেক উত্তরে ঘন বনাঞ্চলঘেরা

পাহাড়ি উপত্যকার নাম তেলঢালা। এখানে একত্র হয়েছে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১ম, ৩য় ও ৮ম ব্যাটালিয়ন। এদের নিয়ে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম পদাতিক ব্রিগেড, জেড ফোর্স। কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমানের নামের আদ্যক্ষর নিয়েই নাম করা হয়েছে এই ব্রিগেডের। তিন ব্যাটালিয়নেই অর্ধেকের বেশি সদস্য সদ্য রিক্রুট করা ছাত্র ও বিভিন্ন পেশা থেকে আসা যুবক। ছয় সপ্তাহব্যাপী প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যই এদের তেলঢালার জঙ্গলে আনা হয়েছে। এই ফোর্স সব অর্থেই এক গণবাহিনী। এদের মধ্যে রয়েছে ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, কৃষক, ড্রাইভার, হেলপার, দোকানদারসহ নানা পেশা থেকে আসা যুবকেরা। অস্ত্রচালনা শিখে, যুদ্ধকৌশল আয়ত্ত করে পাকিস্তানি সেনাদের রণাঙ্গনে পরাস্ত করে দেশকে হানাদারমুক্ত করার জন্যই তারা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছে।

বিশাল এলাকার জঙ্গল কেটে বাসোপযোগী করেছে সৈনিকেরা। পানীয় জলের জন্য কয়েকটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। খাদ্য, রসদ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পেয়েছে এফজে সেক্টর। ধীরস্থির স্বভাবের অমায়িক ব্যক্তিত্ব ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং এর কমান্ডার। তুরার মাইল পাঁচেক পশ্চিমে এফজে সেক্টর সদর দপ্তর। তেলঢালা থেকে সপ্তাহে দু-একবার ব্রিফিংয়ের জন্য আমাকে যেতে হবে। পাহাড়ি বিপৎসংকুল রাস্তায় এম৩৮ আমেরিকান জিপ চালিয়ে সেখানে যাই। একটু অসতর্ক হলেই কয়েক শ ফুট নিচে পড়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্তির আশঙ্কা। খুবই সাবধানে গাড়ি চালাই। মাঝেমধ্যে যাত্রাবিরতি করি তুরায়। রাস্তার পাশে জিপ থামিয়ে চুপচাপ বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু মন যে অশান্ত। সুবেশধারী গারো নর-নারীরা প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাজারে কেনাকাটা করছে। তাদের কলহাস্যে বিপণিবিতান মুখর। আনন্দমুখর, নিরুদ্বেগ তাদের জীবন! অথচ আমরা স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত, অসম যুদ্ধে লিপ্ত। যৌবনের প্রারম্ভেই মৃত্যু আমাদের হাতছানি দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তিন ব্যাটালিয়নে পূর্ণোদ্যমে রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ শুরু হলো। প্রশিক্ষক নিজস্ব অফিসার, জেসিওরা। তৃতীয় বেঙ্গলের সিও মেজর শাফায়াত জামিল, ৮ম বেঙ্গলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এ জে এম আমিনুল হক। আমি জুন মাসের মাঝামাঝি ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব হস্তান্তর করি মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরীর কাছে। তেলঢালায় আমাদের পল্টনে যোগ দেয় লে. কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুল মান্নান এবং ফ্লাইং অফিসার লিয়াকত আলী খান। মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেল ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র মুজিবুর রহমান ফকির, খুবই রসিক প্রকৃতির যুবক। ব্যাটালিয়নকে পিআরসি-৭ বেতারযন্ত্রে সজ্জিত করা হলো। নতুন অস্ত্র,

সরঞ্জাম এবং এতজন অফিসারের যোগদানে ব্যাটালিয়নের কমব্যাট-সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেল।

সামরিক প্রশিক্ষণ কঠিন, কষ্টসাধ্য বিষয়। রিক্রুটরা গ্রামীণ যুবক, মধ্যবিত্ত কিংবা দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে। নিকটজন থেকে বিচ্ছিন্ন, বৈরী পরিবেশে অনভ্যস্ত। কিন্তু সব কষ্ট তারা হাসিমুখে সহ্য করছে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। দিনের বেলায় রাইফেল, মেশিনগানের গুলিবর্ষণের শব্দে পাহাড় কেঁপে ওঠে। রাতে ভারী বোঝা প্যাক ০৮ নিয়ে মাইলের পর মাইল পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে উদ্যমী যুবকের দল। রাতে বের হলেই কিছুক্ষণ পরপর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, 'হল্ট, হু কামস দেয়ার?'

উত্তরে নির্ধারিত পাসওয়ার্ড উচ্চারণ করি বাধা অতিক্রমের জন্য।

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তেলঢালায় এলেন কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান। একটি ছোট টিলার ওপর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হলো। ব্রিগেড মেজর ও ডিকিউ পদে দায়িত্ব পালন করছেন ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ও ক্যাপ্টেন মো. সাদেক। মেডিকেল অফিসার ডা. আবদুল হাই সৈনিকদের চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করেন। ৮ম ইস্ট বেঙ্গলে ডা. প্রেমাঙ্কুর রায় এবং তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গলে ক্যাপ্টেন ডা. এম চৌধুরী আরএমও হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

সপ্তাহে এক দিন বিশ্রাম পায় রিক্রুটরা। সন্ধ্যার পর তাঁবুতে গিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার খোঁজখবর নিই। আমিই এদের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে রিক্রুট করেছিলাম। তাই এরাও মন খুলে আমার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলে। আমারও ওদের সঙ্গে থেকে মায়া পড়ে গেছে, এক অদৃশ্য সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে আমাদের মধ্যে। আমার সামনে এরা দিব্যি সিগারেট খেতে পারে কিন্তু প্রশিক্ষক হাবিলদার এলে শশব্যস্ত হয়ে সিগারেট লুকিয়ে ফেলে।

ট্রেনিংয়ের অবসরে এবং বিশ্রামের দিন আমরা বিভিন্ন ইউনিটের অফিসাররা গল্পগুজব করে চমৎকার সময় কাটাই। পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হলো তৃতীয় বেঙ্গলের মেজর শাফায়াত, ক্যাপ্টেন আকবর, ক্যাপ্টেন আনোয়ার, লে. নুরুন্নবী, ফ্লাইং অফিসার আশরাফ এবং অষ্টম বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন খালিকুজ্জামান, ক্যাডেট মুদাসসর ও এমদাদের সঙ্গে। এদের সবারই যুদ্ধক্ষেত্রে নানা দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশ্রামের সময় এসব ঘটনার চর্বিত চর্বণ করে ভালোই কাটছিল দিনগুলো। সবাই জানতাম, আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো চিরতরে হারিয়ে যাব যুদ্ধক্ষেত্রে, সবার ভাগ্যে দেশের স্বাধীনতা অর্জন দেখে যাওয়া সম্ভব হবে না, হয়ওনি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো একঝাঁক উচ্ছল যুবকের প্রাণখোলা হাসিতে তেলঢালার পাহাড়ও কেঁপে উঠত মাঝেমধ্যেই।

তেলঢালার প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে সন্ত সিং ছাড়াও দুজন সিনিয়র ভারতীয় অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হলো। কমিউনিকেশন জোন কমান্ডার মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং গিল এবং মাউন্টেন ব্রিগেড কমান্ডার হরদেব সিং ক্লের। গিল কথাবার্তায় রসকষহীন, কিন্তু ব্যবহারে দিলদরিয়া টাইপ। ক্লের সাহেবি কেতাদুরস্ত, স্মার্ট অফিসার। '৬৫ সালের যুদ্ধে পাকিস্তান ভারতের কাছে নাস্তানাবুদ হয়, ভারতীয় সেনা অফিসাররা পাকিস্তানিদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতেন। কিন্তু আমাদের মতো মুক্তিবাহিনী অফিসারদের তাঁরা যথেষ্ট সমীহ করতেন এবং কারও সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় ভূয়সী প্রশংসা করতেন। সেনাপ্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশ একদিন আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করার জন্য তেলঢালায় এলেন। আমরা জেড ফোর্স কমান্ডারসহ তাঁকে হেলিপ্যাডে স্বাগত জানালাম। গুর্খা রেজিমেন্টের বেল্ট পরা মানেকশ অত্যন্ত প্রাণবন্ত মানুষ, আমাদের মতো জুনিয়রদের সঙ্গেও হাস্যকৌতুক করলেন।

পাকিস্তান ও ভারতীয় বাহিনীর সিনিয়র অফিসাররা একসঙ্গেই ব্রিটিশ বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। এ কারণেই উভয় বাহিনী মোটামুটি ব্রিটিশ ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। অফিসার মেসের নিয়মকানুন-ট্র্যাডিশন একই ধরনের। তবে একটি বিষয় লক্ষ করেছি, ভারতীয় সেনা অফিসাররা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান না এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অপর পক্ষে পাকিস্তানি কর্মকর্তারা রাজনৈতিক আলোচনায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং নিজ দেশের বেসামরিক জনগণের প্রতি প্রকাশ্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। কয়েকটি মার্শাল ল কার্যকর করার অভিজ্ঞতা থাকায় পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রভুত্ববাদী মনোভাব চাড়া দিয়ে ওঠে এবং করদাতা বেসামরিক দেশবাসীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের সংস্কৃতি চালু হয়।

জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ ১ম ইস্ট বেঙ্গলের পুরোনো অফিসার। '৭১ সালের প্রথম দিকে একটি কোর্স করার জন্য কোয়েটা গিয়েছিলেন। ঢাকায় ক্র্যাকডাউনের পর তাঁকে লাহোরে এক বালুচ ব্যাটালিয়নে পোস্টিং দেওয়া হয়। সেখানে কয়েক মাস কাটিয়ে এক সুযোগে পালিয়ে এসে ভারতে প্রবেশ করে। কলকাতায় অবস্থিত সেনা সদর তাঁকে আমাদের পল্টনে পাঠিয়ে দেয়। তিনি বরাবরই আবেগপ্রবণ। তেলঢালায় আমার সঙ্গে দেখা হতেই জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন।

ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন সৈনিকদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব। বিকেলে গেমস শেষ হলে আমরা যখন মেসে ফিরে আসতাম, তিনি পিটি ড্রেস পরেই সৈনিকদের

ব্যারাকে যেতেন। আমরা যখন মেসে প্রাণবন্ত আড্ডায় মেতে থাকতাম, তিনি তখন ব্যারাকে সৈনিকদের সঙ্গে গল্পগুজব করে তাদের ভালো-মন্দের খোঁজখবর নিতেন। পল্টনের সৈনিকেরা তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিল। তিনি লাহোরে বালুচ ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুট্যান্টরূপে কর্মরত ছিলেন। তাঁর কাছে পল্টনের কয়েক হাজার টাকা (পেটি ক্যাশ) রক্ষিত ছিল। পালিয়ে আসার আগে তিনি তাঁর কক্ষের ড্রয়ারে টাকাগুলো বিভিন্ন খামে খাতওয়ারি হিসাবসহ রেখে আসেন। এমনই ছিল তাঁর সৈনিকসুলভ সততা।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি নবীন সৈনিকদের ট্রেনিং শেষ হলে জেড ফোর্স একটি দক্ষ সেনাদলে পরিণত হয়। এবার তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষা দেওয়ার পালা। ভারতীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করে মেজর জিয়া ১ম ইস্ট বেঙ্গলকে কামালপুর বর্ডার আউট পোস্ট আক্রমণের নির্দেশ দেন।

শেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম কামালপুর। এখানে বিওপিতে ঘাঁটি গেড়েছে ৩১ বালুচের একটি কোম্পানি। তাদের ডিফেন্সে রয়েছে কংক্রিটের বাঙ্কার, বিছানো হয়েছে মাইন ফিল্ড। এ ঘাঁটি দখলের জন্য আক্রমণকারীদের জন্য মিডিয়াম কামানের ভারী গোলার সহায়তা অত্যাবশ্যক। শত্রুর সহায়তার জন্য ১২০ মিলিমিটার কামান সদা প্রস্তুত রয়েছে। এ রকম একটা শক্ত শত্রুঘাঁটি কামানের সাহায্য ছাড়াই আক্রমণ করার দায়িত্ব দেওয়া হলো আমার অধীন ব্রাভো কোম্পানি এবং সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে ডেল্টা কোম্পানিকে।

জুলাই মাসের এক বিকেলে কৃষকের ছদ্মবেশে আমি আমার প্লাটুন কমান্ডার নায়েব সুবেদার সিদ্দিক, ফয়েজ ও হোসেন আলীকে নিয়ে টার্গেট এরিয়া রেকি করে এলাম। পরদিন রাতে সালাউদ্দিন তার প্লাটুন কমান্ডারদের নিয়ে বিওপি রেকি করার জন্য যায়। তারা অন্ধকারে শত্রু বাঙ্কারের খুবই কাছাকাছি পৌঁছালে একজন পাকিস্তানি সেনা সালাউদ্দিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, শুরু হয় কয়েক সেকেন্ডের মল্লযুদ্ধ। সুবেদার হাই পাকিস্তানি সেনার পিঠে সাবমেশিনগানের নল ঠেকাতেই সে সালাউদ্দিনকে ছেড়ে দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। হাইয়ের এসএমজি গর্জে ওঠে, মুহূর্তেই সে ধরাশায়ী হয়। সুবেদার হাশেমের গুলিতে অপর এক পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এ দুঃসাহসী অপারেশন সমাপ্ত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের দুটি জিথ্রি রাইফেল এবং বালুচ রেজিমেন্টের দুটি ক্যাপ ব্যাজ নিয়ে বীরদর্পে ফিরে আসে রেকি পার্টি। এ সফল অপারেশনের পর আমাদের সৈনিকদের মনোবল তুঙ্গে ওঠে। নিজ বাঙ্কারের সামনে দুজন সৈনিক নিহত হওয়ার ফলে পাকিস্তানি সেনারা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। তারা ধারণা করে, ভারতীয় কমান্ডোরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। শিগগিরই ভারতীয় বাহিনী বিওপি আক্রমণ করবে,

এই ধারণা থেকে তারা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করে, গাছপালা কেটে ফিল্ড অব ফায়ার পরিষ্কার করে এবং সতর্কতামূলক প্যাট্রলিং বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে আমাদের দিক থেকে সারপ্রাইজ অর্থাৎ শত্রুকে চমকে দেওয়ার সুযোগ নষ্ট হলো।

১ জুলাই ভোর ৪টা ৩০ মিনিট কামালপুর আক্রমণের সময় (এইচ আওয়ার) নির্ধারিত হলো। আমি কমান্ডার মেজর জিয়াকে অনুরোধ করলাম আক্রমণের তারিখ অন্তত ১০ দিন পিছিয়ে দিতে। কারণ, শত্রু অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ রয়েছে। আমরা হঠাৎ আক্রমণ করে সারপ্রাইজ দিতে চাই। জিয়া জানালেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অনমনীয়, তারিখ পেছানো যাবে না।

৩১ জুলাই সন্ধ্যা সাতটায় ট্রাকে চড়ে আমরা ব্রাভো ও ডেল্টা কোম্পানি তেলঢালা থেকে ভারতীয় সীমান্তে অবস্থিত মহেন্দ্রগঞ্জ বিওপির উদ্দেশে যাত্রা করি। শুরু হলো প্রবল বৃষ্টি। আমি কাভার্ড জিপে থাকায় তেমন ভিজিনি। কিন্তু খোলা জিপে সালাউদ্দিন এবং ট্রাকে আমাদের সৈনিকেরা ভিজে গেল। মহেন্দ্রগঞ্জ বিওপির উল্টো দিকে বাংলাদেশের কিছুটা ভেতরে অ্যাসেম্বলি এরিয়া। এখানে সৈনিকেরা বিশ্রাম পেল এবং চা পান করে অনেকটা চাঙা হয়ে ওঠে। এখানেই প্রথমবারের মতো ভারতীয় মাউন্টেন ব্যাটারির অফিসারের সঙ্গে অপারেশন প্ল্যান নিয়ে আমাদের আলোচনা হলো, সামরিক পরিভাষায় যার নাম Marrying up। মাউন্টেন গানের বোমা বা শেল অত্যন্ত হালকা। ১৩ পাউন্ড ওজনের, এতে শত্রুর বাঙ্কারের কোনো প্রকার ক্ষতি হয় না। তবু ভাবলাম ফিল্ড বা মিডিয়াম কামানের গোলার সহায়তা যেহেতু পাচ্ছি না, ১৩ পাউন্ডের হালকা বোমাই মন্দের ভালো। স্থির হলো, ফরমিং আপ প্লেস এফইউপিতে (টার্গেটের ৫০০-৬০০ গজ দূরে আক্রমণকারী সৈন্যদের অ্যাটাকিং ফরমেশনে অবস্থান গ্রহণের স্থান) টার্গেটের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর পর আমি বেতারযন্ত্রে একটি সংকেত দিলেই মাউন্টেন ব্যাটারি গোলাবর্ষণ শুরু করবে।

অ্যাসেম্বলি এরিয়া থেকে আমরা প্রায় ২২০ জন সৈনিক এক সারিতে নীরবে এগিয়ে চলেছি বিওপির ৬০০ গজ উত্তরে ধানখেতে নির্ধারিত এফইউপির দিকে। সবার মনে একই প্রশ্ন, এই আক্রমণের ফলাফল কী হবে? কতজন জীবিত অবস্থায় ফেরত আসতে পারব। অ্যাসেম্বলি এরিয়ায় আমি ও সালাউদ্দিন শেষবারের মতো নিজ নিজ কোম্পানিকে ব্রিফ করেছি। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছি। ছয় সপ্তাহের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নবীন সৈনিকেরা অনভিজ্ঞ হলেও তাদের মনোবল অত্যন্ত দৃঢ়।

এফইউপিতে আসার পর লে. মান্নান আমাদের পজিশন নেওয়ার স্থান

দেখিয়ে দিল। কিন্তু প্রথমেই একটা বিপর্যয় ঘটল। আমার পূর্বনির্ধারিত সংকেত দেওয়ার আগেই ভারতীয় মাউন্টেন ব্যাটারি গোলাবর্ষণ শুরু করে। একটি গোলাও শত্রু অবস্থানের ওপর পড়েনি। দু-একটি বরং আমাদের সৈনিকদের কাছাকাছি ফাটে। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো। সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকদের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। শত্রুরা আক্রমণের আভাস পেয়ে ভারী কামানের গোলা ফেলে আমাদের ওপর। Hell let loose এমন পরিস্থিতিতেও আমরা এফইউপিতে অবস্থান নিয়ে 'আল্লাহ আকবর', 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে আক্রমণ চালাই।

আক্রমণের দৃশ্য বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। শত্রু বাঙ্কারের দিকে এগিয়ে চলেছি। শত্রু আমাদের অগ্রসরমাণ পুরো শরীর দেখতে পাচ্ছে। আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না, দেখি শুধু বাঙ্কারের মধ্যে কালো মেশিনগানের নল ও গুলির ফ্ল্যাশ। একটা ছোট নালা পেরিয়েই মাইন ফিল্ডে পড়ে গেলাম। এক ফুট দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলেছি হ্যান্ডসেট হাতে আমি ও বেতারযন্ত্র পিঠে নিয়ে অপারেটর সিরাজ। হঠাৎ অ্যান্টি পারসোনেল মাইনে সিরাজের একটি পা উড়ে গেল, আমার হাত থেকে হ্যান্ডসেট ছিটকে পড়ল। বেতারযন্ত্র আরেকজনের কাঁধে দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম এবং সর্ববাঁয়ে একটি বাঙ্কার দখল করলাম। কামান ও মর্টারের গোলায় এলাকা আতশবাজির আলোর মতো আলোকিত হলো। ইতিমধ্যে ভোরের আলো ফুটেছে এবং আকাশ ফরসা হয়ে উঠেছে। হঠাৎ একটি মর্টারের শেলের টুকরা আমার হাতের চায়নিজ স্টেনের বাঁটে আঘাত করে। ব্যারেল ছিটকে পড়ে কয়েক ফুট দূরে। গোলার বিকট শব্দের সঙ্গে যোগ হয়েছে আমাদের হতাহত সৈনিকদের আর্তনাদ। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। বেতার সেটে সালাউদ্দিন এবং মেজর মইনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বেতারযন্ত্র কাজ করছে না। শত্রুর একটি অংশ পিছিয়ে গিয়ে আমাদের ওপর কাউন্টার আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমার কোম্পানির সিনিয়র জেসিও সুবেদার খায়রুল বাশার হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে এসে জানাল, আমাদের ও ডেল্টা কোম্পানির অনেক সৈনিক হতাহত হয়েছে। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনও শহীদ হয়েছেন। এ সময় আমার কাছেই একটি কামানের গোলা ফাটল। কয়েকটি স্প্লিন্টার আমার কাঁধে ও হাতে আঘাত হানল। কয়েকজন ধরাধরি করে আমাকে পেছনে নিয়ে গেল। এভাবে দুটি কোম্পানি কমান্ডারবিহীন হয়ে পড়ে। অধিকসংখ্যক হতাহত (৩০ জন শহীদ, ৬৬ জন আহত) হওয়ার কারণে একপর্যায়ে আমাদের পিছিয়ে আসতে হয়।

সামান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ যুবকেরা কামানের সাহায্য ছাড়াই মাইন ফিল্ড পেরিয়ে কামানের গোলাগুলির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কীভাবে

শত্রুঘাঁটির কিছু অংশ দখল করেছিল, ভেবে আজও বিস্ময়ে অভিভূত হই। গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য ছাড়া দক্ষ পেশাদার সৈনিকের পক্ষে এ ধরনের স্ট্রং পয়েন্ট দখল করা সম্ভব নয়। একমাত্র গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, মৃত্যুঞ্জয়ী সুইসাইড স্কোয়াডের পক্ষেই এমন আক্রমণে অংশ নেওয়া সম্ভব। আমাকে তুরা মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। সেদিনই ভারতীয় চিকিৎসক আমার শরীরের ভেতর থেকে কয়েকটি শেলের টুকরা বের করেন। আমি দ্রুত সেরে উঠি এবং দু-তিন দিন পরই ফিরে আসি তেলঢালা ক্যাম্পে।

কামালপুর আক্রমণের ভয়াবহ স্মৃতি আজও আমাকে আলোড়িত করে। কেন এত অধিকসংখ্যক যোদ্ধা হতাহত হলো আমাদের? সামান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নবীনদের নিয়ে এ ধরনের শক্ত অবস্থান কামানের সাহায্য ছাড়া দখল করা সম্ভবপর ছিল না। কয়েকটি রেইড, অ্যামবুশ অপারেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমব্যাট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পরই এদের প্রথাগত আক্রমণে নিয়োজিত করা উচিত ছিল। আমাদের দুটি কোম্পানি ব্রাভো ও ডেল্টা এসল্টে অংশগ্রহণ করে। চার্লি কোম্পানি কামালপুরের এক মাইল দক্ষিণে উঠানীপাড়ায় ব্লক পজিশন স্থাপন করে। কমান্ডিং অফিসার মেজর মইনের উচিত ছিল আক্রমণকারী দুটি কোম্পানির নেতৃত্ব দেওয়া কিন্তু তিনি ভারতীয় সীমান্তের ওপারে থেকে গেলেন। বেতারযন্ত্রও কাজ করেনি প্রয়োজনের মুহূর্তে। ফিল্ডগানের সহায়তা অত্যাবশ্যক ছিল আমাদের জন্য, যা আমরা পাইনি। সর্বোপরি রেকি করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও আমি ও সালাউদ্দিন পাইনি। হতাহত অর্ধেকের বেশি সৈনিককে আমি বেনাপোলের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে রিক্রুট করেছিলাম। এদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি এবং সহায়তা দেওয়া হয়নি ভেবে আজও বিষাদগ্রস্ত হই। আমরা কি Cannon Fodder ছিলাম একাত্তরে?

সালাউদ্দিন অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে শহীদ হলেন। তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ ও আমাকে বীর উত্তম খেতাবের জন্য সুপারিশ গেল। আমাদের সঠিক মূল্যায়ন হলো না। এই কামালপুর বিওপি দখল করতে ভারতীয় বাহিনী মিডিয়াম গোলন্দাজ ব্যাটারি, এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক এবং একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ব্যবহার করে। ৩১ বালুচের কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন আহসান মালিক ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছিলেন। তাদের খাদ্য ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক সৈনিকের মাত্র ৫ রাউন্ড গুলি অবশিষ্ট ছিল। মেজর জেনারেল গুরবক্স গিল এখানেই মাইন ব্লাস্টে আহত হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে ভারতীয় সেনাপ্রধান ক্যাপ্টেন আহসান মালিককে সর্বোচ্চ সাহসিকতা মেডেল প্রদানের জন্য পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে লিখিত অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন। আর আমরা এই বিওপি দখলের জন্য গোলন্দাজ সহায়তা ছাড়া মাত্র দুই কোম্পানি নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম!

১০ দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতা গেলাম বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। ১৩ আগস্ট প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর অফিসে গেলে তিনি সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে আমাকে নিয়ে বসলেন। ম্যাপ আনিয়ে কামালপুর আক্রমণের বিশদ বিবরণ শুনলেন। উষ্মা প্রকাশ করলেন মেজর জিয়া সম্পর্কে, তাকে কে বলেছে এ ধরনের রক্তক্ষয়ী আক্রমণের পরিকল্পনা করতে ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিশেষে বিদায় নেওয়ার সময় সস্নেহে কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'Thank God you are alive.' তাঁর কাছেই শুনলাম ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, মেজর মনজুর (সস্ত্রীক), মেজর আবু তাহের ও ক্যাপ্টেন বজলুল গনি পাটোয়ারী পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছেন কয়েক দিন আগে। ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিনকে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মেজর মইনের পরিবর্তে। জিয়াউদ্দিন ও পাটোয়ারীকে তেলঢালায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে।

২১ আগস্ট তেলঢালায় ফিরে এলাম। দেখা হলো পিএমএর প্রশিক্ষক ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীর সঙ্গে। জিয়াউদ্দিন ১ম ইস্ট বেঙ্গলের পুরোনো অফিসার, পাটোয়ারী বালুচ রেজিমেন্টের। জিয়াউদ্দিন '৬৫ সালের যুদ্ধে পল্টনের অ্যাডজুট্যান্টরূপে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাকে সিও হিসেবে পেয়ে সবাই খুশি হলো।

২১ সেপ্টেম্বর চার্লি কোম্পানি লে. কাইয়ুমের নেতৃত্বে রৌমারীর কোদালকাটি এলাকায় রক্ষণব্যূহ স্থাপন করে। ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী মর্টারের সাহায্য নিয়ে চার্লি কোম্পানির ওপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণ প্রতিহত করা হয়, ৪০ জন নিহত হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তারা পশ্চাদপসরণ করে। এ আক্রমণ প্রতিহত করতে পারায় আমাদের নবীন সৈনিকদের মনোবল বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুক্ত এলাকা রৌমারীতে লাল-সবুজের পতাকা সগর্বে উড্ডীন রইল।

৫ অক্টোবর প্রধান সেনাপতি ওসমানী আমাদের ব্যাটালিয়ন পরিদর্শনে এলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের জন্য তিনি আমাদের সৈনিকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর নিজ জেলা সিলেটে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কম থাকায় পাকিস্তানিরা সেখানে জেঁকে বসেছে। তিনি আমাদের ব্রিগেডকে বৃহত্তর সিলেট এলাকায় বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনার জন্য পাঠাবেন বলে জানালেন।

৯ অক্টোবর তিন মাসের আবাসস্থল তেলঢালা ছেড়ে সিলেট সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করে ১ম ইস্ট বেঙ্গল। বিরাট ট্রাক কনভয় নিয়ে তিন দিন ধরে পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করে জোয়াই, শিলং হয়ে সিলেট জেলার কমলগঞ্জের

উল্টো দিকে ভারতীয় সীমান্তের কয়েক মাইল অভ্যন্তরে ছোট শহর আমবাসার উপকণ্ঠে পৌঁছালাম। সীমান্তের কাছাকাছি পাহাড়ি জঙ্গলে স্থাপিত হলো আমাদের ক্যাম্প। আবারও জঙ্গল কেটে মানুষের বাসোপযোগী করা হলো। ভারতে কত জঙ্গল যে আমরা সাফ করেছি, ভাবতেই অবাক লাগে।

মুক্তিবাহিনীতে অফিসারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ফলে অপারেশন পরিচালনা আশানুরূপ হচ্ছিল না। শিক্ষিত ও সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণের পর কমিশন প্রদান করে এ ঘাটতি পূরণের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ সরকার। ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর ক্র্যাকডাউনের পর ছাত্র-যুবকদের কয়েকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেধাবী ছাত্ররাও ছিল। এরা অত্যন্ত সাহসী, দেশপ্রেমিক, পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরাই ছিল প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা, যাদের কাছে স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করা নিতান্তই সহজ-সরল একটা কর্তব্য। ছাত্র-যুবকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছিল, সে সময় এসব দামাল ছেলে পরিবার-পরিজনের আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চয়তার বিপৎসংকুল পথে স্বপ্রণোদিত হয়ে পাড়ি জমিয়েছে।

ভারতের উত্তরাঞ্চলে ভুটান সীমান্তের কাছাকাছি মূর্তিতে মুক্তিযোদ্ধা যুবকদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ভারতীয় সেনা অফিসাররা সেখানে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিন মাস প্রশিক্ষণের পর ৬৪ জন যুবককে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন দেওয়া হয়। পাসিং আউট প্যারেডে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সালাম গ্রহণ করেন। ক্যাডেট সাইদ আহমদ* সেরা ক্যাডেট বিবেচিত হয় এবং সি-ইন-সির কেইন অর্জন করে।

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত দুজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াকার এবং আনিস আমাদের পল্টনে যোগ দেয়। বৃহত্তর সিলেটে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা আশানুরূপ ছিল না। চা-বাগানসমূহ পূর্ণোদ্যমে উৎপাদন করছিল এবং পাকিস্তান সরকার চা রপ্তানি করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছিল, যা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

চা-বাগানসমূহ রেইড করে চা উৎপাদন বন্ধ করার পরিকল্পনা করা হলো।

---

* পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল।

এক সপ্তাহের মধ্যে রেইড করে আমরা চম্পারায়, খাজুরী ও পাত্রখোলা চা-বাগানের মেশিনপত্র এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে ধ্বংস করি। চা-বাগান এলাকা গেরিলা অপারেশনের জন্য সুবিধাজনক, কিন্তু সেখানে চলাফেরার জন্য গাইডের প্রয়োজন। চা-বাগানের লেখাপড়া না জানা শ্রমিকদের কয়েকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের রেইড পার্টির গাইডের দায়িত্ব পালন করে। তাদের মধ্যে গুতনাবের নামক এক শ্রমিক শত্রুর গুলিতে নিহত হয়। তারপরও তারা বিপৎসংকুল দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাদের দেশপ্রেম দেখে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে।

অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহের এক বিকেলে আমরা শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনে পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটির ওপর রেইড করার উদ্দেশ্যে রওনা হই। সঙ্গে একটি প্লাটুন এবং ডাক্তার মুজিব। গাইড পাত্রখোলা চা-বাগানের শ্রমিক হরি। শীর্ণদেহ, কোঁকড়া চুল, বোকাসোকা চেহারা। মুখে শিশুর মতো মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। সীমান্ত অতিক্রমের পূর্বমুহূর্তে খবর এল হরির আসন্ন প্রসবা স্ত্রী শরণার্থী ক্যাম্পে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হরিকে ডা. মুজিবসহ পাঠালাম ক্যাম্পে। ঘণ্টা দুয়েক পর মুজিব এসে জানাল, হরির স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করে মারা গেছে। শুনে দুঃখ পেলাম। অপারেশন সম্পন্ন করার জন্য উদ্বিগ্ন হলাম। হরিকে ছাড়া চা-বাগানের মধ্য দিয়ে শ্রীমঙ্গল যাওয়া সম্ভব হবে না, আবার শোকাভিভূত হরিকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য বলতেও পারছি না। কিছুক্ষণ পর কাঁদতে কাঁদতে হরি এসে উপস্থিত হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম শ্রীমঙ্গলে যাওয়ার জন্য অন্য কোনো গাইড পাওয়া যাবে কি না। চোখ মুছে হরির উত্তর, 'সাব, বউ মরছে তো কী হইছে? আমিই আপনাগো লইয়া যামু শ্রীমঙ্গল। কোনো চিন্তা করবেন না।' অবাক হয়ে গেলাম একজন সাধারণ শ্রমিকের দেশাত্মবোধের পরিচয় পেয়ে। সেই অন্ধকার রাতে চা-বাগানের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনে একটি সফল রেইড করে নির্বিঘ্নে ফিরে এলাম আমরা। বেস ক্যাম্পে ফিরে আসার পর তাকে অনুরোধ করলাম আমাদের সঙ্গে থেকে যেতে কিন্তু হরি রাজি হলো না। সে চলে গেল অজানার উদ্দেশে, আর তার কোনো পিছুটান নেই।

এ অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ধলই বিওপি। পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি সৈন্য কংক্রিট বাঙ্কারে রক্ষণব্যূহ গড়ে তুলেছে। কামালপুরের মতোই মাইন ফিল্ড ও কাঁটাতারের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেখানে। কোর কমান্ডার লে. জেনারেল সগত সিং 'সি' কোম্পানি নিয়ে বিওপি আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। ব্রাভো কোম্পানি নিয়ে ধলইয়ের দুই মাইল দক্ষিণে পাত্রখোলা চা-বাগান এলাকায় আমি এবং ডেল্টা কোম্পানি

নিয়ে ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী কমলগঞ্জ পাত্রখোলা সড়কের ওপর অবস্থান নেবে, যাতে শত্রুরা বিওপি এলাকায় রিইনফোর্সমেন্ট না পাঠাতে পারে।

২৮ অক্টোবর। প্ল্যান মোতাবেক ক্যাপ্টেন মাহবুবসহ সকালেই ব্রাভো কোম্পানি নিয়ে পাত্রখোলা চা-বাগান এলাকায় ডিফেন্স নিলাম। সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর মেজর চৌধুরী, বেতার সেট ও ১০ জন সৈনিকসহ। আধমাইল দূরে সড়কের ওপর ব্লক স্থাপন করে পাটোয়ারীর নেতৃত্বে ডেল্টা কোম্পানি। পূর্বনির্ধারিত সময়ে আমাদের চার্লি কোম্পানি লে. কাইয়ুমের নেতৃত্বে ধলই বিওপির একটি অংশে ফিল্ডগানের সাহায্য নিয়ে আক্রমণ চালায়। শত্রু দৃঢ়তার সঙ্গে সে আক্রমণ প্রতিহত করে। সংঘর্ষে আমাদের পক্ষে নায়েব সুবেদার ইব্রাহিম, ইউসুফ, হাবিলদার সোবাহানসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। একপর্যায়ে শত্রু পাল্টা আক্রমণ চালায় চার্লি কোম্পানির ওপর। সিপাহি হামিদুর রহমান মেশিনগান নিয়ে শত্রুর ওপর অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করে তাদের ঠেকিয়ে রাখে এবং আমাদের একটি প্লাটুনকে পিছিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়। বেশ কয়েকজন শত্রুসেনা তার গুলিতে নিহত হয়। কিন্তু অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে এই সাহসী তরুণ মৃত্যুবরণ করে। পরে তাকে সর্বোচ্চ সাহসিকতা পুরস্কার 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

আমরা পাত্রখোলা বাগানে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছি শত্রুসৈন্যদের দেখা পাওয়ার জন্য। কিন্তু তাদের সাড়াশব্দ নেই। আমরা দুই দিন চালানোর মতো শুকনা খাবার নিয়ে এসেছি। মেজর চৌধুরী গোলন্দাজ বাহিনীর ফরোয়ার্ড অবজারভেশন অফিসার, ম্যাপে শত্রুর আগমন-নির্গমনের পথ চিহ্নিত করে রেখেছেন। আমি নির্দেশ দিলে চৌধুরী ম্যাপের গ্রিড রেফারেন্স বেতারযোগে গান পজিশনে পাঠাবেন। মিডিয়াম কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হবে সঙ্গে সঙ্গেই। ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করার পর শত্রুর দেখা না পাওয়ায় মাহবুবকে এক সেকশনসহ (১০ জন) ধলইয়ের দিকে পাঠালাম। সে আধা মাইল উত্তরে একটি কালভার্টের আড়ালে অ্যামবুশ পাতে। কিছুক্ষণ পর গোলগুলির শব্দ পেলাম। কালো পোশাক পরা সাত-আটজন সৈনিক কাছাকাছি এলে মাহবুবের এলএমজি গর্জে ওঠে। তিনজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়, বাকিরা উল্টো দিকে পালিয়ে যায়। একজন আহত সুবেদার মাটিতে শুয়ে কাতরাতে থাকে। আমাদের সৈনিকেরা তাকে বহন করে পাত্রখোলায় আমাদের অবস্থানে নিয়ে আসে। আহত পাঠানের নাম গুল চমন (বাগানের ফুল), দেখতে রোগাপটকা। প্যারা মিলিটারি ফ্রন্টিয়ার কনস্টবুলারির জেসিও। কিছুদিন আগেই তাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে। তাদের সম্মুখযুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা আজই হয়েছে। মিডিয়াম

কামানের গোলা বিকট শব্দে ফাটতেই তারা ভয় পেয়ে ডিফেন্স ছেড়ে পালাতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে। সে প্রাণভয়ে বলছে, 'জয় বাংলা, বাংলাদেশ আজাদ হো জায়েগা', বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। ঘণ্টা দুয়েক পরই সে মৃত্যুবরণ করে।

বিকেলের দিকে এক কোম্পানি শত্রুসৈন্য সড়কের প্রতিবন্ধকতা সরানোর জন্য ডেল্টা কোম্পানির ওপর আক্রমণ চালায়। ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী বেতারযোগে মেজর চৌধুরীকে গোলা ফেলার অনুরোধ জানালে তিনি গান পজিশনে যোগাযোগ করে শত্রুর ওপর বেশ কয়েক রাউন্ড গোলা ফেলেন। ফলে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তাদের একজন ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ৪০ জন হতাহত হয়। রাতে পাকিস্তানি সেনারা বের হয় না, রাতটা নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল।

২৯ অক্টোবর, আমার জন্মদিন। ট্রেঞ্চে বসে মেজর চৌধুরীকে এ কথা জানাতেই আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন 'হ্যাপি বার্থডে'।

'ধন্যবাদ, দোয়া করবেন জন্মদিন যেন মৃত্যুদিনে পরিণত না হয়,' বলার পর উভয়ের সম্মিলিত হাসি। গুড়, চিড়া আর পাহাড়ি নালার পানি দিয়ে জন্মদিনের ব্রেকফাস্ট সারলাম।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর ২য় জাঠ ব্যাটালিয়নের দুটি কোম্পানি ধলই বিওপির ওপর মিডিয়াম কামানের সাহায্য নিয়ে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী মরিয়া হয়ে এ আক্রমণ প্রতিরোধ করে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ভারতীয় বাহিনীর একজন মেজর, দুজন লেফটেন্যান্ট এবং ৫০ জন নিহত হয়। ৬০ জন সৈনিক মারাত্মকভাবে আহত হয়। আমাদের কোম্পানিসমূহ এবং ভারতীয় বাহিনী বেতার সেটে একই ফ্রিকোয়েন্সিতে ছিল। আক্রমণ শুরু হতেই বেতারযন্ত্রের হ্যান্ডসেট কানে লাগিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কমান্ডারদের কথোপকথন মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। একপর্যায়ে ভারতীয় ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইয়াদব ২য় জাঠের সিও কর্নেল দালালকে রিজার্ভে রাখা দুই কোম্পানি নিয়ে আক্রমণ করতে আদেশ দেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁদের কথোপকথন :

'দালাল, দুই কোম্পানি নিয়ে এখনই আক্রমণ করো,' ইয়াদব বললেন।

'সরি, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার দুটি কোম্পানি ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়েছে। বাকি দুই কোম্পানি নিয়ে শত্রুর শক্ত ঘাঁটি দখল করা সম্ভব নয়।' দালাল বললেন।

'আমি তোমাকে মিলিটারি অর্ডার দিচ্ছি, আক্রমণ করো। অবাধ্য হলে তোমাকে কোর্ট মার্শাল করা হবে।' ইয়াদব বললেন।

'আমার পক্ষে প্রিয় সৈনিকদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত

হবে না। তাদের সাফল্যের ন্যূনতম সম্ভাবনাও নেই। আমি শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছি।' বললেন দালাল।

'তুমি ভয় পেয়েছ চিকেন। জাঠ ব্যাটালিয়নের ১০০ বছরের গৌরবময় ঐতিহ্য ধুলায় লুটিয়ে দিয়ো না। ফর গডস সেক, আক্রমণ করো।' ইয়াদব বললেন।

'আক্রমণ নিশ্চয়ই করব, তবে আজ নয়। আমাকে আরও সৈন্য দিতে হবে। আমি দুঃখিত।' দালাল অনড় রইলেন।

উভয়ের কথায় যুক্তি রয়েছে। একদিকে অলঙ্ঘনীয় সামরিক আদেশ, অপর দিকে শত শত সৈনিকের নিশ্চিত মৃত্যু। মনে দাগ কাটার মতো ব্যতিক্রমধর্মী কথোপকথন!

দুপুরের দিকে আমার পজিশনের সামনে কিছুটা দূরত্বে শত্রু বাহিনীর তৎপরতা দেখা গেল। আমার আন্ডার কমান্ড মেজর চৌধুরীকে গোলা ফেলার নির্দেশ দিলাম। প্রচণ্ড শব্দে কয়েকটি গোলা শত্রুর কাছাকাছি ফাটতেই তারা রণে ভঙ্গ দিল। শত্রুর ওপর কামানের গোলা ফেলে মরণ আঘাত হানা পদাতিক সৈনিকদের জন্য অত্যন্ত সুখকর অভিজ্ঞতা। সন্ধ্যার পর মেজর জিয়াউদ্দিন আমাদের বেস ক্যাম্পে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। আমি ও পাটোয়ারী নিজ সেনাদল নিয়ে গভীর রাতে ফিরে এলাম। আমার লিখিত সুপারিশে মেজর চৌধুরীকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ 'বীর চক্র' খেতাবে ভূষিত করে।

১ নভেম্বর। আমাদের ব্যাটালিয়ন মোহনপুর সীমান্তে রক্ষণব্যূহ গড়ে তোলে। ভোরের আলো ফুটতেই দুটি ভারতীয় ব্যাটালিয়ন ২য় জাঠ এবং রাজপুতানা রাইফেল আমাদের অবস্থানের ওপর দিয়ে ধলই বিওপির পাকিস্তানি ডিফেন্সের ওপর আক্রমণ চালায়। মিডিয়াম কামানের গোলা বৃষ্টির মতো নিক্ষিপ্ত হতে থাকে বিওপি এলাকায়। পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনীও প্রত্যুত্তর দেয়। পাকিস্তানিরা ১টি গোলা ফেললে ভারতীয়রা দশটি ফেলে। কারণ, পাকিস্তান বিদেশ থেকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে কামানের গোলা আমদানি করে। আর ভারতীয়রা নিজেরাই তাদের অর্ডনান্স ফ্যাক্টরিতে গোলা তৈরি করে। যুদ্ধজয়ের ব্যাপারে এটিও একটি বড় ফ্যাক্টর।

প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় বাহিনী শত্রুঘাঁটির কিছু অংশ দখল করে কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরই পিছিয়ে যাওয়া পাকিস্তানি বাহিনী কাউন্টার অ্যাটাক করে পূবর্তন অবস্থান দখল করে নেয়। কয়েক ঘণ্টা তুমুল সংঘর্ষের পর ভারী কামানের সংখ্যাধিক্যের জোরে ভারতীয় বাহিনী ধলই দখল করে এবং শত্রু নির্মূল হয়। এ অপারেশনে ভারতীয় বাহিনী প্রশংসনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করলেও তারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দুই দিন আগে ব্রিগেডিয়ার ইয়াদব বেতার সেটে কথোপকথনকালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল দালালকে জাঠ বাহিনীর

কলঙ্ক বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এতে কর্নেল দালালের আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছিল। যুদ্ধে দালাল সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং একপর্যায়ে আহত হন। ব্রিগেডিয়ার ইয়াদবও শেষ পর্যায়ে আহত হলে আমাদের একটি প্লাটুন তুমুল গোলাগুলি উপেক্ষা করে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল সগত সিংহ আমার পজিশনে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে আমাদের সৈনিকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দুই ব্যাটালিয়নের আক্রমণে কোর কমান্ডারের আগমনের প্রয়োজন পড়ে না। তবু সব পর্যায়ের কমান্ডাররা এ যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দেন। দুজন কোম্পানি কমান্ডার এবং একজন গোলন্দাজ মেজর ভয়াবহ এ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। সেনাবাহিনী ঐতিহ্যের ওপর ভর করে লড়াই করে, ধলইয়ের যুদ্ধে এর বাস্তবায়ন দেখতে পেলাম।

ধলইয়ের পতনের পর আমরা আমবাসায় ফিরে এলাম কিছুদিন বিশ্রামের জন্য। ৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমান এলেন পল্টনে। তাঁকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাছেই শুনলাম, কিছুদিন আগে ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানি ধামাই চা-বাগানে শত্রুঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়েছিল। সেখানে তরুণ ক্যাডেট এমদাদ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের আট মাইল অভ্যন্তরে নূরজাহান চা ফ্যাক্টরি। খবর পেলাম, পাকিস্তানি সেনারা মাঝেমধ্যে এলাকায় আসে। তাদের কনভয়কে অ্যামবুশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হলো। ১১ নভেম্বর রাতে সীমান্ত অতিক্রম করে সূর্যোদয়ের একটু আগে ফ্যাক্টরির প্রবেশপথে এক টিলার ওপর ফাঁদ পাতলাম। সঙ্গে ৩০ জনের এক প্লাটুন, লিয়াকত এবং ডা. মুজিব। ছয় ঘণ্টা রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পরও শত্রুর দেখা নেই। সম্ভবত তারা আমাদের অবস্থানের খবর পেয়ে গেছে। অবশেষে অ্যামবুশের প্ল্যান ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে আসি এবং এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ ঘটাই। চা-বাগানের ভেতর দিয়ে আট মাইল জঙ্গলাকীর্ণ পথ পেরিয়ে বেস ক্যাম্পে ফিরে এলাম। খবর পেলাম, আগামীকাল ঈদুল ফিতর।

ঈদের দিন সকালে সীমান্ত এলাকায় একটি টিলার ওপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ঈদের জামাতে শরিক হলাম। ঈদগাহ বলতে জঙ্গলবেষ্টিত অসমতল মাঠ, ঈদের পোশাক বলতে ময়লা-ঘামে ভেজা ইউনিফর্ম। পাশে শুইয়ে রাখা অস্ত্র এসএমজি, রাইফেল ইত্যাদি। নামাজরত অবস্থায় নীরবে অশ্রুবর্ষণ করছিল অনেকেই। মোনাজাতের পর কোলাকুলির সময় শুরু হলো সশব্দ ক্রন্দন। পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পরিবার-পরিজনের কথা মনে পড়ছে সবার। আমরা কোথায়, পরিবার কোথায়, কেউ জানে না। যুদ্ধক্ষেত্রে

মারণাস্ত্রের ছোবলের মুখে যারা নিঃশঙ্ক-নির্বিকার, সেই সাহসী যোদ্ধারা আজ শিশুর মতো কাঁদছে।

নভেম্বরের শেষ ভাগে ভারতীয় বাহিনী পূর্ণ শক্তি নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। পাকিস্তানি বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়ে সীমান্ত এলাকায় স্ট্রং পয়েন্ট গড়ে তোলে। ভারতীয়দের সীমান্তে আটকে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। ভারতীয় বাহিনীর মূল লক্ষ্য এসব স্ট্রং পয়েন্ট বাইপাস করে দ্রুত দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শহরগুলো দখল করা, যাতে পাকিস্তানি সেনারা পশ্চাদপসরণের সুযোগ না পায়। স্থানীয় বাঙালিদের সক্রিয় সহায়তা নিয়ে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী অপ্রচলিত কাঁচা পথ ধরে এবং হেলিকপ্টারের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত সাফল্য অর্জন করে। পাকিস্তানি বাহিনী এ সময় বাঙ্কারেই নিজেদের নিরাপদ ভাবে। বাইরে বেরোলেই জনতা তাদের তাড়া করে নিধন করবে। তাদের মনোবল ছিল তখন বুটের তলায়।

২১ নভেম্বর। প্রথমবারের মতো ৪/৫ গুর্খা ব্যাটালিয়ন এবং ১ম ইস্ট বেঙ্গল এক মাইল গ্যাপ দিয়ে সুরমা নদী অতিক্রম করে জকিগঞ্জ এলাকায় ঢোকে। আটগ্রামে পাকিস্তানিদের রক্ষণভাগে প্রচণ্ড আঘাত হানে গুর্খারা এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও পাকিস্তানিদের পরাভূত করে। আটগ্রামের মাইলখানেক পূর্ব দিকে সুরমা নদীর পাড়ে চারগ্রাম বাংলো এলাকায় শত্রুর প্লাটুন ঘাঁটি গেড়েছে। ৪/৫ জন গুর্খাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল চারগ্রাম দখলের। কিন্তু আটগ্রামে একজন মেজর এবং তিনজন লেফটেন্যান্ট নিহত হওয়ার কারণে তারা চারগ্রামে অভিযান চালাতে অক্ষমতা জানায়। ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ওয়াটকে জেড ফোর্স কমান্ডারকে অনুরোধ করেন চারগ্রাম আক্রমণ করার জন্য। জিয়াউর রহমান আমাকে হেডকোয়ার্টারে ডেকে নিয়ে চারগ্রাম আক্রমণের নির্দেশ দেন।

আমি বিকেল চারটার দিকে ব্রাভো কোম্পানি নিয়ে চারগ্রাম বাংলো এলাকায় আক্রমণ চালাই। পাকিস্তানি সেনারা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল এবং ফসলহীন মাঠে আক্রমণকারীদের জন্য কোনো আড়াল ছিল না। আমি শত্রু অবস্থানের ওপর এক ঘণ্টা ধরে থেমে থেমে কামানের গোলা বর্ষণ করি ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায়। কিন্তু দেখলাম পাকিস্তানি বাহিনীকে অবস্থান থেকে সরানো যাচ্ছে না। অবশেষে ভোররাতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বেতার সেট অফ করে দিলাম। নিকটবর্তী গ্রামে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর প্লাটুন কমান্ডারদের ব্রিফ করলাম। উপলব্ধি করলাম এ আক্রমণও কামালপুরের মতোই হবে, তবে আমাদের গোলন্দাজ সাপোর্ট রয়েছে এবং শত্রুর মনোবল ততটা চাঙা নয়। ভোরে আলো ফোটার আগেই

আমরা চারগ্রাম বাংলোর ৫০০ গজ দূরে এফইউপিতে পৌঁছাই এবং আল্লাহু আকবর ও জয় বাংলা বলে আক্রমণ চালাই। সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য কামানের গোলা ব্যবহার করিনি। সাইলেন্ট অ্যাটাক। টার্গেটের ৩০০ গজ কাছে যেতেই শত্রুর রাইফেল এবং মেশিনগান গর্জে ওঠে। কিন্তু আমরা ভ্রুক্ষেপ না করে দ্রুত এগিয়ে বাংলো এলাকা দখল করি। পাকিস্তানি সেনারা প্যারামিলিটারি থল স্কাউটের সদস্য। তারা পাঁচজন আহত সৈনিককে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। যাওয়ার আগে দুজন বাঙালি রাজাকারকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে যায়, সঙ্গে অবাক করা একটি চিরকুট 'They are traitors, sort them out.' পড়ে মজা পেলাম আমরা।

চারগ্রামে দখল করে বেতার সেট অন করলাম। জিয়াউর রহমানের কণ্ঠ ভেসে এল, 'গোলাগুলির শব্দ শুনছি। রিপোর্ট সিচুয়েশন।'

'আমি অবজেকটিভ (চারগ্রাম বাংলো) দখল করেছি,' বললাম। জিয়ার বোধ হয় বিশ্বাস হচ্ছিল না। কারণ, আমি কামান ব্যবহার করিনি। বললেন, 'রিপিট মেসেজ।'

'চারগ্রাম দখল করেছি এইমাত্র,' আমি বললাম।

'কনগ্রাচুলেশনস, আমি একটু পরই আসছি।' জিয়া বললেন।

যুদ্ধজয়ের আনন্দের সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। আমি বুট খুলে একটি টুলের ওপর পা তুলে এক মগ চা খাচ্ছি, এ সময় নদীর ওপারে তিনজন সঙ্গীসহ উপস্থিত হলেন জিয়াউর রহমান। একটি ডিঙিনৌকায় চড়ে তাঁরা এপারে এলেন। আমি নদীর পাড়ে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালাম। জিয়া নেমেই বলেন, 'I am proud of you.' আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। একজন ডিভিশন কমান্ডার মেজর জেনারেল গনজালভেস। শত্রু বাঙ্কারে স্তূপীকৃত গোলাবারুদের পরিমাণ দেখে তাঁরা অবাক হলেন। একটি বাঙ্কারে শাড়ি এবং ভাঙা চুড়ি পাওয়া গেল। জিয়া আনন্দিত হয়ে বললেন, পরদিন থেকে তিনিও আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

একই দিনে ভারতীয় বাহিনী উভচর ট্যাংক ব্যবহার করে জকিগঞ্জ সীমান্তঘাঁটি দখল করে নেয়। শত্রু সিলেট শহর রক্ষার জন্য দ্রুত পশ্চাদপসরণ শুরু করে। আমরাও সামরিক কায়দায় তাদের অনুসরণ করতে থাকি।

২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় আমরা ১ম ইস্ট বেঙ্গল জকিগঞ্জের গৌরীপুর গ্রামে ডিফেন্স নিই। সামনে চার্লি ও ডেল্টা কোম্পানি। পেছনে ব্রাভো ও আলফা। গভীর রাত, জনমানুষের কিংবা পশুপাখির কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেবল কোদাল দিয়ে সৈনিকদের ট্রেঞ্চ খোঁড়ার ছপছপ শব্দ। মাঝেমধ্যে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে কামানের গোলার ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। একসময় আমার সঙ্গে দেখা করতে এল ক্যাপ্টেন মাহবুব। খাকি শার্টের ওপর চেক বেডশিট

চাপিয়েছে। আমরা দুই বন্ধু ভেজা ঘাসের ওপর খড় বিছিয়ে ২০ মিনিট ধরে গল্প করলাম। উভয়ের অনুভূতি, চূড়ান্ত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি আমরা, পাকিস্তানি সেনারা পলায়নপর। বিদায় নেওয়ার সময় বললাম, 'টেক কেয়ার, সাবধানে থাকিস।' মাহবুব রসিকতার সুরে জানাল, 'এক গণক আমার হাত দেখে বলেছে ৪০ বছর পেরোনোর আগে আমার মৃত্যু নেই। ডোন্ট ওরি, সকালে দেখা হবে।'

পরদিন ২৮ নভেম্বর। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর ৩১ পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আমরা দৃঢ়ভাবে আক্রমণ প্রতিহত করি। পাকিস্তানি সেনাদের কমান্ডার মেজর সরওয়ারসহ ৫০ জন নিহত হয় এবং ২৫ জন জীবিত অবস্থায় আমাদের হাতে বন্দী হয়।

শত্রু আক্রমণের অপেক্ষায় রুদ্ধশ্বাসে পরিখায় বসে আছি। কানে বেতারযন্ত্রের হ্যান্ডসেট। আমাদের বিভিন্ন কোম্পানি এবং মিত্রবাহিনীর গোলন্দাজ ব্যাটারি কমান্ডার একই ফ্রিকোয়েন্সিতে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে বেতার সেটে কথোপকথন শুনছি। মাহবুবের আলফা কোম্পানির ওপর শত্রু আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, এ সময় মাহবুব ব্যাটারি কমান্ডারের কাছে ম্যাপের গ্রিড রেফারেন্স পাঠিয়ে শত্রুর ওপর গোলা বর্ষণ করার অনুরোধ পাঠাল, 'ওয়ান রাউন্ড গান ফায়ার।'

মিত্রবাহিনীর ছটা গোলা নিক্ষিপ্ত হলো পাকিস্তানি সেনাদের ওপর।

মাহবুব উল্লসিত স্বরে জানাল, 'অন টার্গেট, ওয়েল ডান। রিপিট। (শত্রু ঘায়েল হয়েছে। আবার এক রাউন্ড করে গোলা বর্ষণ করো)।'

এমন সময় পাকিস্তানিদের কামানের একটিমাত্র গোলার শব্দ পাওয়া গেল। মাহবুবের সাড়াশব্দ নেই। ব্যাটারি কমান্ডারের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'হ্যালো, ওয়ান (মাহবুবের কল সাইন) রিপোর্ট, রিপোর্ট।'

কিন্তু মাহবুবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল না।

কিছুক্ষণ পর গোলাগুলির শব্দ থেমে গেল। আমি পূর্ব দিকে মাহবুবের কোম্পানির দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনে একটি কাঁচা সড়ক উত্তরে-দক্ষিণে বিস্তৃত। দেখলাম কয়েকজন বন্দী পাঞ্জাবি সৈনিককে চোখ বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আলফা কোম্পানির কয়েকজন জওয়ান। একটু পরই এল একটি মৃতদেহ, চারজন বহন করে নিয়ে আসছে। আমাকে দেখেই সুবেদার মেজর মজিদ এবং সুবেদার চাঁদ বখশ হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। চেক বেডশিট জড়ানো মৃতদেহ দেখে আমার মেরুদণ্ডে হিম স্রোত বয়ে গেল। সেই হাসিমুখ, নিমীলিত চোখ। মনে হলো আমাকে বলছে, 'সকালে দেখা হবে, ডোন্ট ওরি।'

তাকে গৌরীপুর মসজিদের পাশে সমাহিত করা হলো। শোকবিহ্বল

গ্রামবাসী গৌরীপুরের নামকরণ করে মাহবুবনগর। যুদ্ধ চলাকালে মাহবুবের শূন্যস্থানে কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকতকে। একপর্যায়ে সে-ও শত্রুর গুলিতে আহত হলে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ডেল্টা কোম্পানির প্লাটুন কমান্ডার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াকার পাকিস্তানি বাহিনীর একটি অংশের ওপর কাউন্টার অ্যাটাক করে শত্রুর প্রচুর ক্ষতিসাধন করে।

৩ ডিসেম্বর। পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান ভারতের কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে একযোগে বোমাবর্ষণ করে। প্রত্যুত্তরে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমরা সবাই উল্লসিত, উপলব্ধি করলাম, যুদ্ধ শেষ হতে বেশি সময় লাগবে না। পাকিস্তানের পরাজয় অবধারিত। স্থানীয় জনগণের সমর্থন হারিয়ে এবং ঘৃণার শিকার হয়ে কোনো সেনাবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়।

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বিভিন্ন রণাঙ্গনে পর্যুদস্ত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনী পিছিয়ে এসে শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলেছে দরবশত ও খাদিমনগর এলাকায়। সিলেট শহর দখলের পরিকল্পনা করা হলো। স্থির হলো ৫/৫ গুর্খা ব্যাটালিয়নকে হেলিকপ্টারে ড্রপ করা হবে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে এবং ১ম ইস্ট বেঙ্গল স্ট্রং পয়েন্ট এড়িয়ে তাদের সঙ্গে লিঙ্ক আপ করবে। সিদ্ধান্ত হলো, আমরা কানাইঘাট-চুরখাই হয়ে হাওরের ভেতর দিয়ে সিলেট দরবশত সড়কে উঠে পরিস্থিতি দেখে পরবর্তী রুট নির্ধারণ করব।

পুরো ব্যাটালিয়ন সিলেট দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। যেহেতু হাওরের মধ্য দিয়ে এগোতে হবে, আমাদের কয়েক দিন যুদ্ধ চালানোর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। চিড়া-গুড় আর অ্যামুনিশন বিগ প্যাকে বহন করে পথচলা শুরু হলো। কমান্ডার জিয়াউর রহমানও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। কানাইঘাট ইতিমধ্যেই শত্রুমুক্ত হয়েছে। এখান থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল সেকেন্ড লে. জহিরের নেতৃত্বে একটি এমএফ কোম্পানি এবং ক্যাডেট মুদাসসরের অধীন ৮ম বেঙ্গলের ইকো কোম্পানি। ১১০০ সৈনিকের বিরাট বাহিনী নিয়ে সিলেট দখলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছি আমরা। মনোবল তুঙ্গে, বিজয় সন্নিকটে। মিত্রবাহিনীর ব্যাটারি কমান্ডার মেজর রাও আমাদের সঙ্গে চলেছেন। মিত্রবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করছি আমরা।

আমরা পিঠে বোঝা বহন করে সারা রাত হাঁটি, দিনে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকি। পাকিস্তানি বিমান আক্রমণ করবে, এমন আশঙ্কাও ছিল, কিন্তু তাদের দেখা নেই। ভারতীয় বিমানবাহিনী আকাশে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছে। শেষ রাতের দিকে বিশ্রাম নিই। কমান্ডার জিয়ার

একটি বিশাল ম্যাপ কেস রয়েছে ৮ ফুট বাই ৮ ফুট। রাতে সেটি বিছিয়ে জিয়া, ক্যাপ্টেন অলি ও আমি শুয়ে থাকি।

১০ ডিসেম্বর। গভীর রাতে সিলেট দরবশত সড়কের পাশে এক গ্রামে অবস্থান নিলাম। জনশূন্য এলাকা। পাঁচজনের রেকি প্যাট্রল নিয়ে সড়কের কাছাকাছি পৌঁছালাম। ধীরগতিতে শত্রুর দুটি সামরিক যান সিলেটের দিকে বাতি নিবিয়ে চলে গেল। অন্ধকারে আরোহীদের সংখ্যা নিরূপণ করা গেল না। একটি ক্রসিং পয়েন্ট চিহ্নিত করে ফিরে এলাম। সড়কের ওপাশেই চা-বাগান।

জিয়াউর রহমান, আমি ও জিয়াউদ্দিন ম্যাপে সিলেট পৌঁছানোর জন্য একটি রুট চিহ্নিত করলাম। পাকা সড়ক বাঁয়ে রেখে চা-বাগানের ভেতর দিয়ে এগোলেই দ্রুত সিলেটের উপকণ্ঠে পৌঁছাব। সিলেট দখলের কৃতিত্ব অর্জন করতে চাই আমরা। চিহ্নিত ক্রসিং পয়েন্ট দিয়ে আমরা চা-বাগানে প্রবেশ করলাম। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে চা-বাগানগুলো ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। জঙ্গলে ম্যাপরিডিং করে চলা দুষ্কর। কিছুক্ষণ চলার পর মেজর রাও জানালেন, তিনি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে বেতার সেটে যোগাযোগ করতে পারছেন না। আমরা এগিয়ে চলেছি জঙ্গল কেটে পথ পরিষ্কার করে। তৃতীয় দিনেই আমাদের শুকনা খাবার ফুরিয়ে গেল, তবু পথচলার বিরাম নেই।

১৪ ডিসেম্বর। ভোররাতে সিলেট শহরের এমসি কলেজের কাছাকাছি ক্যাটল ফার্ম এলাকায় পৌঁছলাম। ভোরের আলো ফুটতেই সামনে টিলার ওপর ২০০ গজ দূরে এমসি কলেজের প্রিন্সিপালের বাসা দৃষ্টিগোচর হলো। সেদিকে মুখ করে ব্রাভো কোম্পানিকে দ্রুত রক্ষণব্যূহ গড়তে নির্দেশ দিলাম। শুরু হলো পরিখা খনন। আমার ডানে ডেল্টা কোম্পানি, পেছনে চার্লি ও আলফা কোম্পানি। এদের সঙ্গেই ব্যাটালিয়ন ও ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার। সামনের টিলায় রোদ পোহানোর জন্য সৈনিকেরা বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে এসেছে। চেহারা-সুরত, গড়ন দেখে বোঝাই যাচ্ছে এরা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্য। আমাদের পরনে তাদের মতোই খাকি পোশাক, হাতে একই ধরনের চায়নিজ অস্ত্র। এ মুহূর্তে যুদ্ধ চলছে খাদিমনগর এলাকায়। মুক্তিবাহিনী যে সিলেট শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, এটা তারা ধারণা করেনি।

তারা উর্দু-পাঞ্জাবি ভাষায় চিৎকার করে আমাদের পরিচয় জানতে চায়। আমরা উত্তর না দিয়ে দ্রুত ট্রেঞ্চ খুঁড়ে চলেছি ডিফেন্স নেওয়ার জন্য। আমাদের নীরবতা এবং তাদের দিকে মেশিনগান তাক করে পজিশন নেওয়ার কারণে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে গেল আমরা কারা। আধা ঘণ্টার মধ্যেই সংগঠিত হয়ে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। টিলার ওপরে থাকায় আমরা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থান থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করি। তাদের জনা চল্লিশেক নিহত হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। আমাদের

ট্রেঞ্চ অসম্পূর্ণ; হাঁটু পর্যন্তও খোঁড়া হয়নি, ফলে আমাদেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হলো। ব্রাভো কোম্পানির ৭ জন শহীদ এবং ১৪ জন মারাত্মকভাবে আহত হলো। আমার যোগ্যতম প্লাটুন কমান্ডার সুবেদার ফয়েজ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। মেশিনগান ডিটাচমেন্টের দুজন কমান্ডার বাচ্চু মিয়া ও নুরুন্নবীও সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শহীদ হলেন। নায়েব সুবেদার হোসেন আলী অসম্পূর্ণ ট্রেঞ্চ থেকে মেশিনগান চালিয়ে শত্রুর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন। আহতদের পেছনে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলাম। ডা. মুজিব ফকির তাঁদের জীবন রক্ষাকারী ইনজেকশন দিয়ে কোনোক্রমে বাঁচিয়ে রাখেন।

দুপুরের দিকে হঠাৎ মেজর রাওয়ের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর বেতার যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কামানের সাহায্য লাগবে কি না। যেহেতু শত্রু বাহিনীর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব খুবই কম, কামানের গোলার শিকার আমরাও হতে পারি। রাওকে বিমান হামলার জন্য অনুরোধ পাঠাতে বলি। আধঘণ্টার মধ্যে দুটি ভারতীয় জেট বিমান অধ্যক্ষের বাসা ও বাঙ্কারের ওপর ১০ মিনিট ধরে রকেট নিক্ষেপ করে। আমাদের সৈনিকেরা উল্লসিত হয়ে চিৎকার করে ওঠে, পাকিস্তানি সেনারা নীরবে পরাজয় মেনে নেয়। রকেট হামলার পর তাদের কোনো তৎপরতা দেখা গেল না।

এল বহু প্রতীক্ষিত বিজয়

১৫ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে ক্যাপ্টেন অলির কাছে খবর পেলাম, পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে পরদিন আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। আনন্দে আত্মহারা হলাম। বহু প্রতীক্ষিত বিজয় অবশেষে হাতের মুঠোয় এল। সৈনিকদের জানাতেই তাদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হলো। নির্ধারিত সময়ে পুরো কোম্পানি শূন্যে ফায়ার করে বিজয় উদ্‌যাপন করলাম। গুলির শব্দ শুনে জিয়াউর রহমান বেতার সেটে কল দিয়ে বললেন, 'গুলির শব্দ শুনছি, সিচুয়েশন কী?'

'বিজয় সেলিব্রেট করছি,' আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

১৬ ডিসেম্বর। টিলা থেকে নেমে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম এমসি কলেজের অধ্যক্ষের বাড়ির পার্শ্ববর্তী রাস্তায়। প্রায় ১ হাজার ১০০ সৈনিক মার্চ করে যাচ্ছে সিলেট রেলস্টেশনের দিকে। রাস্তার দুই পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিলেট শহরবাসী। তাদের হয়তো বিশ্বাস হচ্ছে না বাঙালিদের নিজস্ব বাহিনী মুক্তিবাহিনী বীরদর্পে তাদের চোখের সামনে দিয়ে

মার্চ করে যাচ্ছে। এই দৃশ্য গতকালও ছিল অকল্পনীয়। সেনাদলের অগ্রভাগে হেঁটে চলেছি। মানসপটে ভেসে আসছে যশোরের বিদ্রোহ, বেনাপোল, কামালপুর, গৌরীপুরের যুদ্ধ। ৬০০ যুবককে ভর্তি করেছিলাম আমার পল্টনে, এদের ১০০ জনই চিরতরে হারিয়ে গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে। বিদায় নিয়েছে বন্ধুরা—আনোয়ার, সালাহউদ্দিন, মাহবুব। কামান, মেশিনগানের মরণছোবল উপেক্ষা করে বেঁচে আছি। স্বপ্ন দেখছি না তো! স্বদেশের মাটিতে সেনাদলসহ স্বাধীনতার মিষ্টি রোদে অবগাহন করে আপনজনের মধ্যে ফিরে এসেছি। নিজেকে রুপালি পর্দার নায়কের মতো মনে হচ্ছিল। স্বাধীনতা যে এত আনন্দের উৎস, আগে কখনো অনুভব করিনি!

দুপুরে সার্কিট হাউসে যাত্রাবিরতি হলো। দুই দিন আগে পাকিস্তানি সেনারা এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে ঐতিহাসিক কিন ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছে। ফেরির সাহায্যে যানবাহন পারাপার হচ্ছে। সার্কিট হাউসের গদি আঁটা সোফায় বসে দীর্ঘদিন পর পরিষ্কার কাপে চা খাচ্ছি। বিকেলের দিকে কর্নেল ওসমানী এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ পাকিস্তানি বাহিনী সারেন্ডার করবে, আপনি এখানে কেন?'

'এখানে আসতে পেরেছি, এটাই সৌভাগ্য। কিছুক্ষণ আগেই আমার হেলিকপ্টারে পাকিস্তানি সেনারা গুলি ছুড়েছে, সঙ্গী কর্নেল রব আহত হয়েছেন,' জানালেন ওসমানী। কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে গল্প করে তাঁর বাড়ির উদ্দেশে চলে গেলেন প্রধান সেনাপতি।

বিকেল সাড়ে চারটায় ঢাকার রেসকোর্সে পাকিস্তানি কমান্ডার লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দলিলে স্বাক্ষর করে আত্মসমর্পণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশ কোটি জনতার আনন্দ-উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

১৭ ডিসেম্বর সিলেট শহর থেকে আমাদের পল্টন ট্রেনযোগে শায়েস্তাগঞ্জ পৌঁছায়। স্থানীয় খেলার মাঠে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করে সৈনিকেরা। আমরা কয়েকজন পিডিবি রেস্টহাউসে আনন্দমুখর সময় কাটাই। '৭২-এর ৫ জানুয়ারি সেনা সদর থেকে ১ম ইস্ট বেঙ্গলে মেসেজ আসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থায়ী আবাসে অবস্থান গ্রহণের জন্য। সিও আমাকে একটি প্লাটুন সঙ্গে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে অ্যাডভান্স পার্টি হিসেবে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। একটি জিপ ও তিন টন ক্যাপাসিটির গাড়ি নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করলাম। সেনাদলের সঙ্গে রয়েছে ফ্লাইট লে. লিয়াকত ও সুবেদার মেজর আবদুল মজিদ। শায়েস্তাগঞ্জ থেকে ঢাকা পর্যন্ত সড়কপথে যাত্রা খুবই সমস্যাসংকুল

ছিল। ব্রিজ-কালভার্ট ইত্যাদি অধিকাংশই ভাঙা, পথজুড়ে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর বহু যানবাহন বিভিন্ন ফেরিতে অপেক্ষমাণ। মিত্রবাহিনী ফেরি ও সড়ক পারাপার নিয়ন্ত্রণ করছে। সেনা সদরের চিঠি দেখিয়ে আমরা পারাপারে অগ্রাধিকার পাচ্ছি কিন্তু সড়কের ভগ্নদশার কারণে ডেমরা পৌঁছাতেই দুই দিন লেগে গেল। ডেমরার একটি পরিত্যক্ত জুট মিলে রাত কাটালাম।

৮ জানুয়ারি। সকাল ১০টায় আমরা ঢাকা শহরে ঢুকে স্টেডিয়াম হয়ে রেসকোর্সের উদ্দেশে অগ্রসর হলাম। সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হলো। নিত্যদিনের কর্মচাঞ্চল্য দেখে মনে হচ্ছে না যে তিন সপ্তাহ আগেও সাধারণ মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। একপর্যায়ে সুবেদার মেজর মজিদ আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'স্যার, রাজধানীতে এলাম। আমাদের কেউ খায়ের মকদম জানাবে না?'

দীর্ঘদিন পাকিস্তানি বাহিনীতে কাটিয়ে অনেক উর্দু শব্দ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তার ভোকাবুলারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। 'খায়ের মকদম' মানে স্বাগত জানানো। নয় মাস বনে-জঙ্গলে আমাদের সঙ্গেই কাটিয়েছে মজিদ। আমরাই ধারণা দিয়েছি মুক্তিবাহিনী বিজয়ী হলে দেশবাসী আমাদের মাথায় করে রাখবে। লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে মুক্তিসেনাদের বুকে জড়িয়ে ধরবে। অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু মাত্র তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে না হতেই জনগণের উচ্ছ্বাস-আবেগ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ১৬ ডিসেম্বরও সিলেট শহরে জনগণের মধ্যে মুক্তির আনন্দ পরিলক্ষিত হয়নি। তারা ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়! মিত্রবাহিনীর অধিনায়করূপে সেনাদল নিয়ে প্রথম ঢাকায় প্রবেশ করেন মেজর জেনারেল গন্ধর্ব নাগরা। টেলিভিশনে দেখলাম ঢাকার নাগরিকেরা ফুলের মালা দিয়ে ভারতীয় সেনাদের বরণ করে নিচ্ছে। জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। মজিদেরও ধারণা ছিল, ঢাকার নাগরিকেরা আমাদের দেখলেই দৌড়ে এসে খায়ের মকদম করবে। বললাম, 'মজিদ সাহেব, তিন সপ্তাহ পার হয়েছে। বাঙালির আবেগ সেভেন আপের বোতল খোলার পর "ফস" শব্দের মতোই ক্ষণস্থায়ী, বুদ্‌বুদ যেভাবে নিজের হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, বাঙালিরও আবেগ-অনুভূতিও সে রকম।' কিছুটা ক্ষুব্ধ, বিমর্ষ হলেন মজিদ। ওল্ড সোলজার।

রেসকোর্সে ডেরা ফেলেছে ২য় ইস্ট বেঙ্গল। দেখা হলো সিও মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী এবং অ্যাডজুট্যান্ট সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সায়ীদের সঙ্গে। সুদর্শন সায়ীদের কাছে কিছুক্ষণ পরপরই তরুণীদের ফোন আসছিল, সে-ও কাউকে নিরাশ করছে না। আমাদের দুজনের সামনে সে মোটেও বিব্রত হয়নি। লিয়াকত বলে, 'চালিয়ে যাও, ভায়া।' মইনের সঙ্গে চা খেয়ে কিছুক্ষণ

গল্প করে সেনা সদরের ঠিকানা নিয়ে বের হলাম রাস্তায়। আমাদের প্লাটুনের জন্যও তাঁবুর ব্যবস্থা করা হলো রেসকোর্সে।

প্রধান সেনাপতির দপ্তর স্থাপিত হয়েছে বেইলি রোডে (বর্তমানে ডিএমপি কমিশনারের অফিস) লাল রঙের পুরোনো বিল্ডিংয়ে। চিফের দুজন স্টাফ অফিসারের সঙ্গে দেখা হলো, মুক্তিযোদ্ধা মেজর বাহার (সিগন্যাল কোর) এবং অমুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল ফিরোজ সালাহউদ্দিন। সালাহউদ্দিন ওসমানীর স্নেহভাজন, ১ম ইস্ট বেঙ্গলে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে তাঁর অধীনে লেফটেন্যান্ট হিসেবে চাকরিরত ছিলেন। পাকিস্তানি আর্মিতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে চাকরি করেছেন। আবার এক সপ্তাহের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতেও পুনর্বাসিত হলেন। একেই বলে ভাগ্য। প্রথম দেখায় আমার টার্ন আউটের খুঁতও খুঁজে পেলেন। আমার কাঁধে ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কের পিপগুলো পাকিস্তানি আর্মির, যশোর থেকেই ইউনিফর্মের শোল্ডারে লাগানো ছিল। ৯ মাসে ৯ দিনও পরা হয়নি। র‍্যাঙ্ক পরে অপারেশনে যাইনি কখনো। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীতে প্রথমবার এলাম, তাই ইউনিফর্ম পরেছি। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, 'ইয়ং ম্যান, তুমি পাকিস্তানের চাঁদ-তারাখচিত র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরে আছ। তাড়াতাড়ি এগুলো খুলে ফেলো।' আমোদিত হলাম। এত অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানের প্রতি বিরাগ এবং বাংলাদেশের প্রতি অনুরাগ জন্মেছে তাঁর। দুই দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন! দিন দুয়েক পর তৃতীয় বেঙ্গলের সিও মেজর শাফায়ত জামিল সেনা সদরে গেলে সালাউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়। শাফায়াত তাঁকে দেখেই বিরক্ত হলেন, স্যালুটও করেননি। কর্নেল সাহেব প্রধান সেনাপতির কাছে এ নিয়ে নালিশ করলেন এবং চিফ ওসমানী শাফায়াতের কৈফিয়ত তলব করেন। শাফায়াত তেজস্বী, দৃঢ়চেতা অফিসার। জানিয়ে দিলেন, চাকরি চলে গেলেও তিনি কোনো রাজাকার প্রধানকে স্যালুট করবেন না। বিষয়টি অবশ্য সেখানেই শেষ হলো।

৮ জানুয়ারি রাতেই খবর এল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডনে পৌঁছেছেন। সারা দেশে জনমনে আনন্দের বান ডাকে। দেশবাসী আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে।

১০ জানুয়ারি দুপুরের কিছু আগে ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর একটি জেট বিমান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করে। হাজার হাজার হর্ষোৎফুল্ল জনতা তাঁকে আবেগঘন স্বাগত জানায়। তাদের অনেকের চোখেই ছিল আনন্দের অশ্রু। বিমানের রানওয়ে পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল। বিমান অতি কষ্টে অবতরণ করতে সক্ষম হয়। মেজর মইনের নেতৃত্বে

সামরিক বাহিনীর একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত দু-আড়াই মাইল রাস্তার দুই পাশে দণ্ডায়মান ছিল হাজার হাজার উৎফুল্ল জনতা। এ পথটুকু অতিক্রম করতে তাঁকে বহনকারী ট্রাকটির প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। দুই পাশের বাড়িঘরের ছাদেও ভিড় করেছে অসংখ্য মানুষ তাঁকে একনজর দেখার জন্য। আমার ধারণা, এটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দমুখর, গৌরবদীপ্ত মুহূর্ত। একজন রাজনৈতিক নেতার পরম আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার জনগণের নিখাদ ভালোবাসা, যা তিনি সেদিন পেয়েছিলেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা যেন পূর্ণতা পেল। রেসকোর্স ময়দানে তিনি একটি আবেগঘন ভাষণ দিলেন।

জনযুদ্ধে বিজয়ের পর

১২ জানুয়ারি ১ম ইস্ট বেঙ্গল শায়েস্তাগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছাল। তারা সেনানিবাসে বনানী চেকপোস্টের পশ্চিমে খেলার মাঠের দক্ষিণ পাশের ব্যারাক ও অফিসে অবস্থান নেয়। ঢাকায় আসতে পেরে সবাই আনন্দিত। ঢাকা সেনানিবাসে কর্নেল সফিউল্লাহর অধিনায়কত্বে ৪৬তম ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয়। এ ব্রিগেডের ইউনিটসমূহ ১ম ইস্ট বেঙ্গল, ২য় ইস্ট বেঙ্গল, ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, ১৬ ইস্ট বেঙ্গল এবং ২য় ফিল্ড আর্টিলারি। প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীকে চার তারকা জেনারেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং ঢাকা সেনানিবাসের পূর্বতন ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে তিনি সেনা সদর দপ্তর স্থাপন করেন।

আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি বাহিনীর ৯০ হাজার সৈনিক ও অফিসারকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার পর ঢাকা সেনানিবাস বিরানভূমিতে পরিণত হয়। ব্যারাকসমূহ খালি, অফিসারদের বাসস্থানে সুনসান নীরবতা। বিগত ৯ মাস ধরে যারা আসুরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাঙালি জাতিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্মূল করার জন্য ঘৃণ্য তৎপরতা চালিয়েছে, আজ পর্যুদস্ত হয়ে অবনত মস্তকে বাঙালিদের ঘৃণার শিকার হয়ে তারা দেশত্যাগ করছে। ক্যান্টনমেন্টের খালি বাসায় আমাদের মতো ব্যাচেলর অফিসারদের থাকতে হচ্ছে, যাতে আসবাব চুরি না হয়। পাকিস্তানি অফিসারদের তাদের সোফা সেট, টেলিভিশন, ফ্রিজ ইত্যাদি রেখেই ভারতের বন্দিশালায় যেতে হয়েছে।

রোববার সাপ্তাহিক ছুটি। ঢাকা শহরের হাল-হকিকত দেখতে বের হই। যেদিকে তাকাই, জলপাই রঙের ইউনিফর্ম পরা ভারতীয় সৈনিক ও অফিসার

ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ঢাকা ক্লাবে এক সন্ধ্যায় আমি ও মেজর জিয়াউদ্দিন ঢুঁ মারতে গেলাম। উর্দি পরা ভারতীয় অফিসাররা আসর গুলজার করে রেখেছেন। ক্লাবের সদস্যরা ভারতীয়দের খুবই খাতির-যত্ন করে হুইস্কি, বিয়ার খাওয়াচ্ছে। আমাদের খোঁজখবর নেওয়ার ফুরসত কারও নেই। জিয়াউদ্দিন বললেন, 'এই হলো বাঙালিদের চিরাচরিত মানসিকতা। এরা যুগ যুগ ধরে এভাবেই বিজয়ী বিদেশি শক্তিকে আপ্যায়ন করেছে। আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুদের বাসায় গেলে গৃহকর্তা গল্প করেন, 'গতকাল কর্নেল মিত্র কিংবা মেজর বাজওয়া এসেছিলেন আমাদের বাসায় ডিনার করতে।' বোঝা গেল, এটাও নগরবাসীর জন্য একধরনের প্রেস্টিজ সিম্বল।

পাকিস্তানি বাহিনীর ফেলে যাওয়া অনেক অস্ত্রসম্ভার ভারতীয়রা নিজ দেশে নিয়ে গেল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খবর আসতে লাগল যে ভারতীয় বাহিনী মূল্যবান সামগ্রী সরিয়ে ফেলছে। খুলনা অঞ্চলে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল ভারতীয়দের এহেন তৎপরতার প্রতিবাদ জানান। তাঁকে গ্রেপ্তার করে সেনা হেফাজতে বন্দী করা হলো। সেনা কর্তৃপক্ষ আমাকেই দায়িত্ব দিল তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য। আমি একদিন সকালে হেলিকপ্টার নিয়ে যশোর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের সামনে হেলিপ্যাডে অবতরণ করি। ব্রিগেড কমান্ডার লে. কর্নেল আবুল মনজুর মেজর জলিলকে আমার কাছে হস্তান্তর করেন। আমি তাঁকে ঢাকায় নিয়ে এসে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার মেসের একটি কক্ষে এসকর্টসহ রাখি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে একজন সেক্টর কমান্ডারকে বন্দী হতে হলো। বিষয়টি অবাক করে সবাইকে। জলিলের কোর্ট মার্শালের প্রেসিডেন্ট আরেকজন সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল আবু তাহের। বিচারে তাঁকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। মেজর জলিল স্বেচ্ছায় সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নেন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। কিছু সময়ের ব্যবধানে তিনি তৎকালীন জনপ্রিয় দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি পদে অভিষিক্ত হন।

ঢাকা শহরে দেখা দেয় আরেক আপদ। শহরের অলিগলি, বড় রাস্তায় হুড খোলা জিপে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল শহুরে যুবক। তাদের পরনে প্যান্ট, পায়ে কেডস, হাতে স্টেন কিংবা রাইফেল। লম্বা চুল ও গোঁফ, সানগ্লাস চোখে দিব্যি মুক্তিযোদ্ধা সেজে ফুর্তি করছে। ঢাকাবাসী এদের নামকরণ করে 'সিক্সটিনথ ডিভিশন', অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের জন্ম নেওয়া মুক্তিবাহিনী। নামটি সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন বিকেলে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে রাস্তায় দেখলাম জিপ আরোহী চার-পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে অস্ত্র হাতে সামনের সিটে বসে আছে সান্টু। সে পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলের গোলরক্ষক,

জনপ্রিয় তারকা খেলোয়াড়। আমি জিপ থামিয়ে সান্টুকে পরিহাস ছলে জিজ্ঞেসা করলাম, 'তুমি কোন সেক্টরে ছিলে?' সে কিছুটা লজ্জিত হয়ে জানাল, 'ভাই, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বের হয়েছি।' জিপটি দ্রুত চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই জনযুদ্ধ, মুক্তিবাহিনী জনগণের মধ্য থেকে উঠে আসা গণবাহিনী। শতকরা ৯০ জনই ছিল সহজ-সরল স্বল্প শিক্ষিত গ্রামীণ যুবক। এদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। বিজয়লাভের কিছুদিনের মধ্যেই 'হাইজ্যাক' হয়ে গেল তাদের গৌরবগাথা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী অনেক রাজনীতিক যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব দাবি করেন। শহরাঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো যাঁরা চালু রেখেছিলেন, সেসব বুদ্ধিজীবীর অনেকে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের অংশীদার হলেন।

প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই অস্ত্র জমা দিয়ে পূর্বতন পেশায় ফিরে যান। ছাত্ররা স্কুল-কলেজে তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করার উদ্যোগ নেয়। অস্ত্র জমা নেওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। অসংখ্য ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার দাপটে তারা ক্রমেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধে অবশ্যই দেশের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন ছিল, সে কারণেই স্বাধীনতাসংগ্রাম সফল হয়েছে। তবে সশস্ত্র সংগ্রামে যাঁরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে কারও তুলনা হতে পারে না। তাঁরাই জাতির সূর্যসন্তান। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে অস্ত্রধারী যোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার, '৭২-এর মার্চ-এপ্রিলে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজারে। আজ অবধি এ সংখ্যাবৃদ্ধি কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা ৯০ জনই ছিল দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উদ্ভূত। গুলশান-বনানীর বাসিন্দারা নিজেদের সযত্নে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এঁরা কেউ কেউ পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন যুদ্ধজয়ের পরবর্তী সময়ে।

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের অধিকাংশই সামরিক বাহিনীর কিংবা দু-এক মাসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিফৌজের সদস্য। এরা প্রায় সবাই দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা এবং এরাই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ। এঁদের মৃত্যুতে পরিবার সীমাহীন দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত হয় এবং দীর্ঘদিন অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটায়। তাদের দুর্দশার অবসান ঘটানোর জন্য তেমন কোনো জাতীয় প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়নি বহু বছর ধরে।

আপনজনকে চিরতরে হারানোর বেদনা অবর্ণনীয়। ১ম ইস্ট বেঙ্গল মুক্তিযুদ্ধে ১০০ সৈনিক এবং ৩ জন অফিসারকে হারিয়েছে। সৈনিকেরা

অতিসাধারণ পরিবারের সদস্য। এসব অনেক পরিবারের পক্ষে শহীদের খোঁজখবর পাওয়াও কষ্টসাধ্য ছিল। '৭২-এর গোড়ার দিকে আমরাই পরিবারকে চিঠি দিয়ে তাঁদের মৃত্যুর খবর জানাই। তাঁদের দরিদ্র পিতামাতা ঢাকা সেনানিবাসে এসে উপস্থিত হলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। এদের সান্ত্বনা জানানোর ভাষা আমাদের জানা ছিল না, ছিল না তাদের হাতে তুলে দেওয়ার মতো সম্পদ কিংবা সাহায্য। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এরা সরকার থেকে পেনশন পেত মাত্র ১০০ থেকে ২০০ টাকা। অথচ এদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত রাষ্ট্রের বহু ভাগ্যবান নাগরিক মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার জমা করতে পেরেছেন বিদেশি ব্যাংকে।

জানুয়ারি মাসে ১ম বেঙ্গলের তিনজন অফিসারের স্বজনদের মৃত্যুসংবাদ আমাকেই জানাতে হয়। ক্যান্টনমেন্টের স্থায়ী আবাসে থিতু হওয়ার আগে সাত-আট দিন আমাদের আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে থাকতে হয়েছিল। সেখানেই একদিন দুপুরে এসে হাজির হলেন সেকেন্ড লে. আনোয়ারের বোন ও খালা। তাঁদের মনে ক্ষীণ আসা ছিল স্কুলের মাঠে খাটানো সারি সারি তাঁবুর মধ্য থেকে বেরিয়ে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ আনোয়ার দৌড়ে এসে তাঁদের জড়িয়ে ধরে বলবে, 'খালা, এই তো আমি তোমাদের বেলাল (ডাকনাম)।' গেটে ডিউটিরত সৈনিকদের কাছে তাঁরা ক্যাপ্টেন হাফিজের নাম বলায় তারা আমার কাছেই নিয়ে এসেছে। আমি তাঁদের চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। আমার ভাবভঙ্গিমাতেই তাঁরা বুঝে গেছেন আনোয়ারের পরিণতি। আমার কোমরে ছিল আনোয়ারের রক্তমাখা বেল্ট। এটি তাঁদের হাতে তুলে দিতেই তাঁদের চোখে অঝোর ধারায় অশ্রু নেমে এল। যশোরের হয়রতপুর এলাকায় কবি নজরুল কলেজের সামনে তাঁদের বুকের ধন চিরনিদ্রায় শায়িত, এ তথ্য জানার পর তাঁরা কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলেন।

'৭২-এর মার্চের এক সকালে আমার অফিসের টেলিফোন বেজে ওঠে। অপর প্রান্তে এক ব্যক্তি জানালেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ্ হলের এক কামরায় শহীদ ক্যাপ্টেন মাহবুবের বয়োবৃদ্ধ পিতা অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর পুত্রের খোঁজে ঢাকায় এসেছেন। ক্যান্টনমেন্টে তাঁর পরিচিত কেউ নেই। আমি তৎক্ষণাৎ একটি জিপ নিয়ে শহীদুল্লাহ্ হলের নির্ধারিত কক্ষে গেলাম। মাহবুবের পিতা একজন আইনজীবী এবং দিনাজপুর ল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কিছুটা অসুস্থ এবং ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে জাগিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি দুর্বল কণ্ঠে তাঁর পুত্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইতিপূর্বেই ভাসা-ভাসা খবর পেয়েছিলেন। আমাকে দুঃসংবাদটি নিশ্চিত করতে হলো। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁকে সেনানিবাসে ১ম ইস্ট বেঙ্গলে নিয়ে এলাম। সেখানে তিনি কমান্ডিং অফিসার এবং যুদ্ধকালীন

সৈনিকদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। মাহবুবের ব্যবহৃত কিছু কাপড়চোপড় এবং ব্যক্তিগত সামগ্রী তাঁর কাছে হস্তান্তর করলাম আমরা। এই বয়োবৃদ্ধ মানুষটিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমরাই অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লাম।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে একদিন শহীদ ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের মা আমার বাসায় এলেন। সঙ্গে মেয়ে ও ছোট ছেলে। মেয়েটি এক থানায় সহকারী শিক্ষা অফিসার পদে কর্মরত, ছেলে সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ কলেজছাত্র। ছেলেটি দেখতে অনেকটাই সালাউদ্দিনের ডুপ্লিকেট কপি। ওকে দেখেই মনটা হু-হু করে কেঁদে ওঠে, বাইরে কিছুই প্রকাশ করিনি। ভদ্রমহিলা সহজ-সরল কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আমি সালাউদ্দিনের পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কথা এবং তেলঢালায় কাটানো দিনগুলোর বর্ণনা করলাম। পরিশেষে কামালপুর যুদ্ধে তার বীরত্বগাথা তুলে ধরে বললাম সারা জাতি তাকে নিয়ে গর্ব করে। শত্রু বাঙ্কারের সীমান্ত থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করতে গিয়ে দুজন সৈনিক হায়াত আলী এবং কাদের স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন দিয়েছে। শহীদমাতা মোটেই ভেঙে পড়েননি। নিজেকে অতি কষ্টে সামলে নিয়ে বললেন, 'আমাকে তার সহযোদ্ধা সৈনিকদের কাছে নিয়ে চলুন। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখতে চাই যে আমার ছেলেকে স্পর্শ করেছে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে।' আমি তাঁকে নিয়ে সৈনিকদের ব্যারাকে গেলাম। সালাউদ্দিনের মা এসেছেন শুনে সব পদবির সৈনিক, অফিসার, জেসিওরা তাঁকে দেখার জন্য ছুটে এল।

ডেল্টা কোম্পানির এক তরুণ সৈনিক জানাল, একটি বাঙ্কারের সামনে আহত সালাউদ্দিনের মাথাটি কোলে নিয়ে সে ওয়াটার বটল থেকে একটু পানি তার মুখে ঢেলে দিয়েছিল। এ কথা শুনেই শহীদমাতা তার হাতটি কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেতে লাগলেন। তাঁর দুই চোখে নেমে এল বন্যা। সৈনিকের হাতটি দুহাতে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর মৃত পুত্রকেই স্পর্শ করছেন। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি।

'৭২-এর মার্চের মাঝামাঝি ভারতীয় সামরিক বাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে ফিরে যায়। ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকায় বিহারি জনগোষ্ঠী অনেক বছর আগে থেকেই সংঘবদ্ধভাবে অবস্থান করছিল। সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবাঙালিরা এই দুটি এলাকায় স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পর আশ্রয় নেয়। একাত্তরে যুদ্ধ চলাকালে বিহারিরা পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীরূপে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়, স্বাভাবিকভাবেই বাঙালিরাও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ছিল। ১৬ ডিসেম্বর '৭১ থেকেই ভারতীয় বাহিনী মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকায় কড়া পাহারা বসায়, যাতে বিহারিদের

জানমাল রক্ষা পায়। ভারতীয় বাহিনীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বিহারিদের পাহারা দিয়ে রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর বর্তায়।

৩০ জানুয়ারি '৭২ দুপুরে ১ম ইস্ট বেঙ্গল মোহাম্মদপুর এবং ২য় ইস্ট বেঙ্গলকে মিরপুরে বিহারি-অধ্যুষিত এলাকায় মোতায়েন করা হলো। আমরা দুটি কোম্পানি নিয়ে মোহাম্মদপুরে সামরিক কায়দায় অবস্থান গ্রহণ করি। মোহাম্মদপুর থানার পাশে একটি পরিত্যক্ত ভবনে আমরা হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি। পুরো আবাসিক এলাকাটি আমার কোম্পানির সৈনিকেরা ঘিরে রাখে। ২৪ ঘণ্টার কারফিউ জারির ঘোষণা মাইকযোগে বাসিন্দাদের জানিয়ে দেওয়া হলো। এলাকার প্রবেশমুখে প্রতিটি রাস্তায় চেকপোস্ট বসানো হলো। যেকোনো ধরনের অনুপ্রবেশ রুখে দেওয়ার জন্য সৈনিকদের কড়া নির্দেশ দিলাম। বিহারিদের জানমাল রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর, এ ব্যাপারে কোনো শৈথিল্য সহ্য করা হবে না বলে জানিয়ে দিলাম।

বেলা দুইটার সময় স্থানীয় বিহারিদের একটি প্রতিনিধিদল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাদের চোখেমুখে আতঙ্ক। ভারতীয় বাহিনী এত দিন তাদের পাহারা দিয়ে রেখেছে। এদের অবর্তমানে মুক্তিবাহিনী তাদের নিরাপত্তা বিধান করবে কি না, এ নিয়ে তারা শঙ্কিত। তাদের জীবন ও নারীদের ইজ্জত রক্ষার জন্য আমার কাছে আকুল আবেদন জানায়। আমি তাদের বুঝিয়ে বলি যে আমরাও ভারতীয় বাহিনীর মতোই নিয়মিত সেনাবাহিনী। আমাদের সেনাপ্রধান দায়িত্ব দিয়েছেন অবাঙালিদের রক্ষা করার জন্য। জীবনের বিনিময়ে হলেও আমরা এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব। বিহারিরা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের ধারণা, আজ রাতই তাদের জীবনের শেষ রাত। একটু পরই উচ্ছৃঙ্খল বাঙালিরা প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে তাদের হত্যা করবে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সংখ্যায় ১০, অধিকাংশই ষাটোর্ধ্ব, শরিফ কিসিমের মানুষ। অনন্যোপায় হয়ে তারা আমাকে প্রস্তাব দিল, আমি যদি তাদের জীবন ও সম্মান রক্ষা করি, তারা মোহাম্মদপুর এলাকার ১০০টি বাড়ি কোর্টে গিয়ে আমার নামে দলিল করে দেবে। তাদের হাতে তেমন অর্থকড়ি নেই। পরিবারের অলংকার পুরোটাই আমাকে দান করবে। অধীর হয়ে তারা আমার পা জড়িয়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চায়। আমি অবশেষে তাদের রূঢ়ভাবে ধমক দিয়ে বিদায় করি। তারা কাঁদতে কাঁদতে নিজ বাড়িতে ফিরে যায়।

বেলা সাড়ে তিনটা থেকেই অসংখ্য বাঙালি দুর্বৃত্ত বিহারিদের সম্পদ লুট করার জন্য চারদিকে সমবেত হতে থাকে। বিভিন্ন চেকপোস্ট থেকে ফিল্ড টেলিফোনে এনসিও এবং জেসিওরা আমাকে জানায় যে বাঙালি জনতা তাদের নিষেধাজ্ঞার প্রতি কর্ণপাত না করে আবাসিক এলাকায় ঢোকার জন্য

সংঘবদ্ধ চেষ্টা চালাচ্ছে। দুর্বৃত্তরা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করামাত্রই গুলি চালানোর জন্য আমি সৈনিকদের নির্দেশ দিলাম। সৈনিকেরা সামরিক কায়দায় ১০০ গজ দূরত্বে সাদা ফিতা বিছিয়ে দিয়ে সমবেত দুর্বৃত্ত দলকে হ্যান্ডমাইকে সতর্কবাণী জানায় ফিতা অতিক্রম না করার জন্য। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের ধারণা, বাঙালি সৈনিকেরা বাঙালিদের ওপর কখনো গুলি চালাবে না। তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

বিকেল পাঁচটার দিকে দুটি চেকপয়েন্টের সামনের রাস্তার উচ্ছৃঙ্খল জনতা সাদা ফিতা অতিক্রম করে আবাসিক এলাকায় প্রবেশের উদ্যোগ নিতেই আমাদের সৈনিকেরা কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। এতে সাত-আটজন আহত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। গুলির শব্দে মোহাম্মদপুর এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং নারী-পুরুষের আর্তনাদে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। রাতটি নিরুপদ্রবে কেটে গেল। আর কোনো হামলা হয়নি।

সকাল হতেই ছুটে এল গতকালের বিহারি ডেলিগেশন। তাদের চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। তারা আবার আমার পা জড়িয়ে ধরে বলে, 'বিশ্বাস করতে পারিনি আমাদের রক্ষা করার জন্য আপনারা স্বজাতির ওপর গুলি চালাবেন।' সেই বয়োবৃদ্ধ মানুষগুলো সারা রাত আতঙ্কে ঘুমাতে পারেনি, পরিবার-পরিজন নিয়ে আকুল হয়ে সৃষ্টিকর্তাকে ডেকেছে। এরা আমার ফুটবলার পরিচিতি জেনে সঙ্গে নিয়ে এসেছে একজন সাবেক খেলোয়াড় রশিদ চুন্নাকে। তিনি এককালে কলকাতার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে এবং পাকিস্তান জাতীয় দলেও খেলেছেন। ইদানীং বিজি প্রেস দলের প্রশিক্ষক ছিলেন। রশিদ ভাই আমার পূর্বপরিচিত, অমায়িক সজ্জন। আমাকে দেখে তিনি সজল চোখে জড়িয়ে ধরলেন। আশ্বস্ত করার জন্য আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়িতে গেলাম। তিনি জানালেন যে বিত্তশালী অবাঙালিরা সবাই স্বাধীনতালাভের আগেই পাকিস্তানে চলে গেছে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অভাগারাই বাংলাদেশে রয়ে গেছে। তিনি আরও জানালেন, ঘরের সাধারণ আসবাব বিক্রি করেই তিনি কষ্টেসৃষ্টে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করছেন। কতিপয় দুষ্কৃতকারীর কৃতকর্মের জন্যই বৃহৎ অবাঙালি জনগোষ্ঠী আজ বাঙালিদের রুদ্ররোষের শিকার হয়েছে। আমি রশিদ ভাইকে আশ্বস্ত করলাম, যেকোনো বিপদে আমি তাঁদের রক্ষার জন্য এগিয়ে আসব।

একই দিন দুপুরে মিরপুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ২য় ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকেরা অপ্রত্যাশিতভাবে মহাদুর্ভোগে নিপতিত হয়। সারা বাংলাদেশে যেসব বিহারি দুর্বৃত্ত বাঙালি নিধনে অংশ নিয়েছিল, তাদের বৃহৎ অংশ স্বাধীনতালাভের পর মিরপুর এলাকায় আত্মগোপন করে। এদের অবস্থান সম্পর্কে ২য় ইস্ট বেঙ্গলের

সৈনিকেরা কোনো ধারণাই পায়নি। তারা যে মুহূর্তে মিরপুরের একটি রাস্তায় তল্লাশি অভিযান চালাতে যায়, সশস্ত্র বিহারিরা অতর্কিত তাদের ওপর হামলা করে। হঠাৎ আক্রমণে বাঙালি সৈনিকদের ৩৯ জন নিহত হয় এবং ৫০ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সেলিম শহীদ হয় এবং লেফটেন্যান্ট হেলাল মোর্শেদ গুরুতর আহত হয়।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বিহারিরা এভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর চড়াও হবে, এটি কেউ ভাবতেও পারেনি। পরবর্তীকালে এ জন্য তাদের চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। খ্যাতনামা লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারকে মিরপুরে খুঁজতে গিয়ে তাঁর ভাই চিত্রপরিচালক জহির রায়হানও বিহারিদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। মিরপুরের তুলনায় মোহাম্মদপুরের অবাঙালিরা শান্তশিষ্ট, সজ্জন ব্যক্তি ছিল বলে আমরা কোনো বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি।

২৬ মার্চ ১৯৭২। প্রথমবারের মতো আনন্দঘন পরিবেশে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে দেশবাসী। রেসকোর্স মাঠে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ। প্যারেডে সালাম গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্যান্ডেলে বসে প্যারেড উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা। প্যারেড কমান্ডার ছিলেন ৪৬তম ব্রিগেডের অধিনায়ক কর্নেল সফিউল্লাহ। ট্র্যাডিশন অনুযায়ী প্যারেডের সম্মুখভাগে ছিল সাঁজোয়া কোরের ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার ক্যাপ্টেন ফারুকের নেতৃত্বে। এরপর পদাতিক বাহিনীর ১ম ইস্ট বেঙ্গল মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে। মার্চপাস্টের একপর্যায়ে আমরা যখন ডান দিকে তাকিয়ে স্যালুট করে মঞ্চ অতিক্রম করছিলাম, তখন চোখে পড়ে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আমাদের কুচকাওয়াজ দেখে দণ্ডায়মান সাধারণ দর্শকদের কারও কারও নেমে আসে আনন্দের অশ্রু। সদ্য স্বাধীন দেশে বাঙালিদের নিজস্ব বাহিনী তাদের চোখের সামনে বীরদর্পে কুচকাওয়াজ করে চলেছে, দুই দিন আগেও এ দৃশ্য তাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। মুক্তিবাহিনী জনগণের কত প্রিয়, সেদিন আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।

১৯৭২-এর মাঝামাঝি, অর্থাৎ মে-জুন মাসের মধ্যেই জনমনে স্বাধীনতালাভের আনন্দ ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে, কালোবাজারি ও মুনাফাখোরির কারণে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সদ্য গঠিত মন্ত্রিসভা বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেতে থাকে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে বামপন্থী দল সর্বহারা পার্টি আওয়ামী লীগ

সরকারের পতন ঘটানোর জন্য দেশব্যাপী সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে একটি নতুন বাহিনী সৃষ্টি করে, যার নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী লীগের সমর্থক যুবকেরা। এদের অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক, প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সরঞ্জাম ভারতীয় সেনাবাহিনী সরবরাহ করে। জনমনে ক্রমশ নানা কারণে ভারতবিরোধী মনোভাব চাঙা হয়ে ওঠে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুরূপ অলিভ গ্রিন ইউনিফর্মে সজ্জিত রক্ষীবাহিনীর প্রতি দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন কারণে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। এ বাহিনীকে থানা পর্যায়ে মোতায়েন করা হয়। স্থানীয় সংসদ সদস্যের নিয়ন্ত্রিত এ বাহিনী বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে ব্যবহার করার কারণে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

যুদ্ধোত্তর দেশে সেনাবাহিনীর সার্বিক অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। সৈনিকদের পোশাক, বুট, কম্বল ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জামের অভাব প্রকট ছিল। অন্যদিকে সমান্তরাল সংস্থা রক্ষীবাহিনীর সাজসরঞ্জাম, পোশাক, যানবাহন ছিল আধুনিক ও ঝকমকে। ফলে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মনে ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে সরকার সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে জাতীয় রক্ষীবাহিনীকেই সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা দেবে অদূর ভবিষ্যতে।

দেশের কলকারখানা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় স্বল্পসংখ্যক, কিন্তু এর মালিকানা ছিল অবাঙালিদের হাতে। তারা স্বাধীনতালাভের আগেই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ার ফলে সরকারকে বাধ্য হয়েই শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয়করণ করতে হয়। প্রতিটি শিল্পকারখানায় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়, যার সিংহ ভাগ ছিলেন ক্ষমতাসীন দলের সদস্য। শিল্প পরিচালনায় দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। শিগগিরই এগুলো লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তার বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং মুক্তিবাহিনীর সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে মানসিক দূরত্বের সৃষ্টি হয়। সেনা অফিসাররা জীবন বিপন্ন করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। অপর দিকে রাজনৈতিক নেতারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে নিরাপদ অবস্থানে থেকে নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করছেন, এমন ধারণা থেকেই কিছুটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং সেনাপ্রধান আতাউল গনি ওসমানীর অজান্তে ভারত সরকার মুজিব বাহিনী নামে একটি সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলে, যা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। জেনারেল উবানের নেতৃত্বে এ বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম পরিচালনায় গোপনীয়তা মুক্তিবাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরই ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন নেতা, বিশেষ

করে 'চার খলিফা' নামে পরিচিত ছাত্রনেতাদের একজন প্রকাশ্যে বলে বসলেন, সেনাবাহিনী প্রতিপালনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। পাকিস্তানি আমলে সামরিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার কারণে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সামরিক বাহিনীকেও অপ্রয়োজনীয় ভাবতে শুরু করেন।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের দেশপ্রেম, শৌর্যবীর্য সম্পর্কেও তাঁকে সঠিকভাবে অবহিত করা হয়নি বলে ধারণা করা হয়। বিশেষ করে মার্চের শেষ ভাগে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর বাহিনীর বিদ্রোহ এবং মুক্তিবাহিনী গঠনে তারা যে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে, সে সম্পর্কেও তাঁকে অন্ধকারে রাখা হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা সাধারণভাবে নিজেদের কৃতিত্বকেই বড় করে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁদের মধ্যে অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় করার প্রবণতা প্রায়শ দৃশ্যমান।

সশস্ত্র সংগ্রামকালীন তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু মুজিব ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা। সর্বশ্রেণির মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অতুলনীয়। মুক্তিযোদ্ধারা আশা করেছিলেন যে দেশে ফেরার পর প্রথম সুযোগেই তিনি সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করবেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র পর্ব সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে সরাসরি অবহিত হবেন। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক, তাঁর দেশে ফেরার পর কয়েক মাস কেটে গেল কিন্তু কোনো সামরিক স্থাপনায় তাঁর পদার্পণ ঘটেনি। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত মুজিবনগরেও তিনি যাননি। বছরের মাঝামাঝি, অর্থাৎ মে কিংবা জুন মাসে বঙ্গবন্ধু প্রথমবারের মতো ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যান। তিনি ১ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন পরিদর্শন করেন এবং সৈনিকদের ট্রেনিং সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। কোয়ার্টার গার্ডের সামনে আমরা সিনিয়র টাইগার অফিসাররা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। ১ম ইস্ট বেঙ্গলের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে অফিসারদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ছবি তোলার পর তিনি সেনা সদর দপ্তর ভিজিটে যান। সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ, উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং সেনা সদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসাররা তাঁকে স্বাগত জানান। সেনাবাহিনীর ভিত্তি পাঁচটি ব্রিগেডের কমান্ডাররাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য সেনা কর্তৃপক্ষ যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে প্রশংসনীয় দক্ষতা, শৌর্যবীর্য প্রদর্শনকারী সেনাবাহিনী লোকবল ও সাজসরঞ্জামের দিক থেকে তখন দুর্বল অবস্থানে ছিল। সেনাবাহিনীর বিদ্যমান পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে ব্রিফ করার

দায়িত্ব দেওয়া হয় কৃতী অফিসার লে. কর্নেল মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বীর উত্তমকে। সেনাপ্রধানের অনুরোধে গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে প্রধানমন্ত্রী কোনো সহায়তাকারী ব্যতিরেকে একাই কনফারেন্স রুমে সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হন। পরবর্তী ঘটনাক্রম জিয়াউদ্দিন এভাবেই বর্ণনা করেন আমার কাছে: 'আমি দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের সেনাবাহিনী প্রয়োজন, সে বিষয়ে আলোকপাত করি। প্রতিবেশী দেশসমূহের জনসংখ্যা ও সেনাবাহিনীর আনুপাতিক সংখ্যা, লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বক্তব্য রাখি। প্রধানমন্ত্রী একটি সাদা কাগজে পেনসিল দিয়ে নোট নিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। আমি ব্রিগেড কনসেপ্ট থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে ডিভিশন কনসেপ্টে যাওয়া অত্যাবশ্যক বলে মত প্রকাশ করি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখেই আমি এক্সপ্যানশনের প্রস্তাব রাখি। একপর্যায়ে চিফ অব লজিস্টিকস ব্রিগেডিয়ার সি আর দত্ত আচমকা বলে বসলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এক্সপ্যানশনের ধারণা সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে। এ ধরনের পরিবৃদ্ধি হলে দেশে সামরিক শাসন জারির সম্ভাবনা দেখা দেবে।" কক্ষে পিনপতন নীরবতা নেমে এল। প্রধানমন্ত্রী নোট নেওয়া বন্ধ করলেন। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অস্বস্তিকর পরিবেশে সভা শেষ হলো। ঢাকা সেনানিবাসে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সভা আর অনুষ্ঠিত হয়নি।'

স্বাধীনতালাভ অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত, নিপীড়িত বাঙালিদের জন্য চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ উল্লসিত, উজ্জীবিত হয়। দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাদের দেশাত্মবোধকে জাতীয়ভাবে কাজে লাগানো বিভিন্ন কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শাসক দল আওয়ামী লীগেও আদর্শগত বিভেদ দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ দলীয় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে তোলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। অতি অল্প সময়ে এ দল ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে শ্রেণিশত্রু খতম অভিযান শুরু করে। তারা থানা লুট করে অস্ত্র সংগ্রহ শুরু করে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

সদ্য স্বাধীন দেশে নানা ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার হিমশিম খেতে লাগল। '৭২ সালের এপ্রিল মাসে পিলখানায় বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনীর সৈনিক এবং জুনিয়র কমিশন্ড অফিসাররা (জেসিও) সরকারের কাছে দাবি জানাল তারা সেনাবাহিনী থেকে

আসা অফিসারদের গ্রহণ করবে না। বিডিআরে কর্মরত সৈনিকদের মধ্য থেকেই অফিসার নিয়োগ দিতে হবে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করে অতি কষ্টে এ বিদ্রোহ সামাল দিতে হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এ রকম দাবিকে কেন্দ্র করেই ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পিলখানায় বিডিআর সৈনিকেরা বিদ্রোহ করে এবং ৫৭ জন কৃতী সেনা অফিসারকে হত্যা করে।

১৯৭২-এর মে মাসে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে সাধারণ সৈনিকেরা বিদ্রোহ করে বসেন। তাঁরা অফিসারদের কমান্ড মানতে অস্বীকৃতি জানান। বিমানসেনাদের শতকরা ৯০ জনই মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। মাত্র গুটিকয় অফিসার (পাইলট) এয়ারবেস থেকে পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন এবং প্রশংসনীয় বীরত্বের পরিচয় দেন। বিমানবাহিনীতে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে যুদ্ধবিমানের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ফলে সৈনিকেরা অধিকাংশই অলসভাবে সময় পার করছিলেন। এঁদের অনেকেই অবসর সময়ে ইন্টারমিডিয়েট, গ্র্যাজুয়েশন এবং মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ডিগ্রি অর্জন করেন এবং নিজেদের অফিসারদের চেয়ে যোগ্যতর ভাবতে শুরু করেন। পৃথিবীর সব সামরিক বাহিনীতে অফিসার শ্রেণির সুযোগ-সুবিধা সাধারণ সৈনিকদের তুলনায় বেশি। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সাধারণ সৈনিকেরা অফিসারদের সমান কিংবা কাছাকাছি সুযোগ-সুবিধা (বেতন, ভাতা ইত্যাদি) দাবি করেন, যা সরকারের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। বিমানবাহিনীপ্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার বীর উত্তম অনন্যোপায় হয়ে বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকারের শরণাপন্ন হন।

সরকার সেনাবাহিনীকে বিমানসেনাদের বিদ্রোহ দমন করার নির্দেশ দেয়। সেনাবাহিনী প্রধান এ বিদ্রোহ দমনের জন্য ১ম ইস্ট বেঙ্গলকে দায়িত্ব দেন। আমি দুটি কোম্পানি নিয়ে ঢাকা এয়ারবেসে প্রবেশ করে বিদ্রোহী বিমানসেনাদের নিরস্ত্র করি। এয়ার চিফ খন্দকার অত্যন্ত মৃদুভাষী, অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁকে অফিসে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করলে তিনি বারবার আমাকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, আমি যেন বিমানসেনাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করি। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম যে আমরা কঠোর হব না। কয়েক শ বিদ্রোহী বিমানসেনাকে গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্টে একটি সুরক্ষিত বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীকালে সরকার বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এবং অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই চাকরি ফিরে পায়। কিন্তু চাপা ক্ষোভ থেকেই যায় এবং পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে বেশ কয়েকজন অফিসার বিমানসেনাদের সশস্ত্র বিদ্রোহে নিহত হন।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির গৌরবময় অর্জন। এতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মনমানসিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক

সমস্যাবলি-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে জনযুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে। সামরিক অফিসারদের জীবনযাত্রায় রাজনীতির কোনো সম্পৃক্ততা থাকে না, পেশাগত দায়িত্ব পালন করাই তাঁদের ধ্যানজ্ঞান। মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলত পূর্ব বাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম। জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জনযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে প্রত্যেক সৈনিকের মনে অবচেতনভাবে রাজনীতি তথা নাগরিকের কল্যাণসম্পর্কিত ধ্যানধারণা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান আর্মিতে আমরা ছিলাম পেশাদার সৈনিক। পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে জনতার কাতারে এসে রূপান্তরিত হলাম গণবাহিনীর সদস্যে। স্বাধীনতা অর্জনের পর আবার ফিরে গেলাম জনবিচ্ছিন্ন সেনানিবাসে পেশাদার সৈনিকের রুটিন জীবনধারায়। টুথপেস্টের টিউব থেকে পেস্ট বেরিয়ে গেলে যেমন ভেতরে ঢোকানো যায় না, একইভাবে গণযোদ্ধা থেকে গতানুগতিক পশ্চিমা ধারার পেশাদার সৈনিকে রূপান্তরিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ১৯৭৩-৭৪-এ তখন বাংলাদেশ অযুত সমস্যায় হিমশিম খাচ্ছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে জনসাধারণের জীবনে অভাব-অনটন, খাদ্যাভাব, নিত্যনৈমিত্তিক বিড়ম্বনায় পরিণত হলো। প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কিংবা বেসামরিক সবার মনেই একটি প্রশ্নের উদ্রেক হলো : আমরা কি এমন বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্যই জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলাম? পেশাদার সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের চিন্তা-চেতনায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণভাবনা, মুক্তিযুদ্ধ এমনই এক অভিজ্ঞতা।

হাঁটি হাঁটি পা পা— স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী

নানা সীমাবদ্ধতা নিয়েই হাঁটি হাঁটি পা পা করে সংগঠিত হচ্ছে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী। সেনাবাহিনী আকারে ক্ষুদ্র, মাত্র পাঁচটি অসম্পূর্ণ পদাতিক ব্রিগেড নিয়ে গঠিত। তা সত্ত্বেও বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সেনাবাহিনীকে নানা ধরনের কাজে ব্যবহার করেছে সরকার। যেমন শহরাঞ্চলে ভুয়া রেশনকার্ড উদ্ধার, বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম ইত্যাদি। সেনাসদস্যরা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে দেশ গঠনের কাজে শামিল হয়েছে।

সে সময় সামরিক বাহিনীতে অফিসারের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল। নৌবাহিনীতে একজন অফিসারও কর্মরত ছিলেন না। একজন জেসিও ছিলেন

জ্যেষ্ঠতম সদস্য। বিমানবাহিনীতে মাত্র জনা বিশেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারসহ হাজারখানেক এয়ারম্যান কর্মরত ছিলেন। অফিসার-স্বল্পতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই অফিসার ক্যাডেটদের দুটি ব্যাচ নির্বাচন করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে। তিন মাস প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর প্রথম ব্যাচের ৬৪ জনকে অক্টোবর মাসে কমিশন প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় ব্যাচের ট্রেনিং শেষ হওয়ার আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এ ব্যাচের ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ শেষ করে কমিশন প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় গঠিত হয় অস্থায়ী মিলিটারি একাডেমি, যার নামকরণ করা হয় 'ব্যাটল স্কুল'। এর কমান্ড্যান্ট নিযুক্ত হন পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির কৃতী প্রশিক্ষক লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন বীর উত্তম। চারজন প্লাটুন কমান্ডাররূপে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পান—মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন ফারুক রহমান, ক্যাপ্টেন নজরুল হক ও আমি। অ্যাডজুট্যান্টের দায়িত্ব পালন করেন ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী।

সেনাবাহিনীর সেরা অফিসারদের সাধারণত মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা মেধাবী তরুণদের দক্ষ অফিসাররূপে গড়ে তুলতে পারেন। আমাদের চার প্লাটুন কমান্ডারের কারোরই একাডেমিতে চাকরি করার অভিজ্ঞতা ছিল না। মেজর জিয়াউদ্দিন পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং ক্যাডেটদের ইভালুয়েশন পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ব্রিফ করেন। ব্যাটল স্কুলে মাস দুয়েক প্রশিক্ষণের পর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাডেটদের ২য় ব্যাচের ৬০ জন ক্যাডেটকে কমিশন প্রদান করা হয় আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে। সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ ২য় ওয়ারকোর্সের ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ সালাম গ্রহণ করেন। ৫ আগস্ট বিকেলে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কমিশনপ্রাপ্ত ক্যাডেট ও প্রশিক্ষকদের বঙ্গভবনে চা-চক্রে আপ্যায়ন করেন।

'৭২-এর মাঝামাঝি খবর চাউর হলো, পাকিস্তানে আটকে পড়া শ পাঁচেক অফিসার এবং ২০ হাজার সৈনিক শিগগিরই রি-প্যাট্রিয়ট হয়ে দেশে ফিরে আসবেন। ঢাকাসহ বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে ফ্যামিলি কোয়ার্টারসমূহ খালি পড়ে আছে। ঢাকায় ব্যাচেলর অফিসাররা বলাবলি শুরু করেন, 'পাকিস্তান থেকে সিনিয়র অফিসাররা এলে বাসা বরাদ্দ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং বিয়ে-শাদি করার জন্য এখনই মোক্ষম সময়।' যেই কথা সেই কাজ। তরুণ অফিসাররা বাসা বরাদ্দ পাওয়ার জন্য বিয়ের পিঁড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিয়ের আগে ভালোবাসার কথা সবাই জানে, কিন্তু ভালো বাসার জন্য বিয়ে! হিড়িক পড়ে গেল। প্রতি সপ্তাহেই দু-তিনটি বিয়ের দাওয়াত পেতে লাগলাম। যাঁদের সঙ্গে আমার ওঠবস, যেমন ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী বীর প্রতীক, ক্যাপ্টেন আজিজ বীর উত্তম, ক্যাপ্টেন হারুন বীর উত্তম, ক্যাপ্টেন রশিদ (২য় ফিল্ড), ক্যাপ্টেন

ফারুক (১ম বেঙ্গল ল্যান্সার), ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী বীর বিক্রম—সবাই ফটাফট বিয়ে করে ফেলেন। সিনিয়র অফিসারদের জন্য নির্ধারিত শহীদ আজিজ পল্লির বৃহদায়তন তিন বেডরুমের বাসাগুলো এঁরাই বরাদ্দ পেলেন এবং মহা উৎসাহে বিবাহিত জীবনের সূত্রপাত ঘটালেন। আমি এ সময় ১ম ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়করূপে কর্মরত ছিলাম; পল্টনের ব্যাচেলর অফিসারকুল আমার কুমারজীবনের অবসান ঘটানোর জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন ইকবাল চৌধুরীর বাড়ি সুনামগঞ্জে, তাঁর বোন দিলারা ইডেন গার্লস কলেজে ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক। ইকবালের কোর্সমেট ক্যাপ্টেন নূর প্রধান ঘটকরূপে ঘটনা ঘটানোর জন্য তৎপরতা শুরু করলেন। বরিশালে বসবাসকারী আমার পরিবার বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল। অবশেষে বিয়ের ফুল ফুটল এবং প্রথম দেখা পাত্রী দিলারাকেই বিয়ে করতে সম্মত হলাম। লাড্ডু দিল্লির হোক কিংবা সুনামগঞ্জের, খেলেও পস্তাতে হবে, না খেলেও। সুতরাং খেয়ে পস্তানোই ভালো। সেকালে বিয়ের কার্ডসহ দরখাস্ত করলেই সেনা সদর বাসা বরাদ্দ করত এবং আমিও বিয়ের সপ্তাহখানেক আগেই শহীদ আজিজ পল্লিতে বন্ধুদের প্রতিবেশী হলাম।

১৭ আগস্ট ১৯৭২ হোটেল পূর্বাণীতে বিয়ের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো। বিয়ের বরযাত্রীরা অনেকেই ছিলেন খ্যাতিমান মানুষ, যেমন জেনারেল ওসমানী, জেনারেল জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ, মীর শওকত, আবুল মঞ্জুর, জিয়াউদ্দিন প্রমুখ। চিরকুমার জেনারেল ওসমানী আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁকে কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ জানাতে গেলে তিনি হেসে বললেন, 'মাই বয়, তুমিও আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ।' বিয়ের রাতেই তিনি আমাকে একটি সুন্দর টাই উপহার দিয়েছিলেন। ৪৬তম ব্রিগেডের সব অফিসারের উপস্থিতিতে আনন্দঘন পরিবেশে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। কন্যাপক্ষের জন্য একটি কারণে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আমি ঢাকার জনপ্রিয় দল মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে ঢাকা ফুটবল লিগে খেলছি সে বছর। বিয়ের তিন দিন আগে এক ম্যাচে হ্যাটট্রিক করি। আমার সহপাঠী বন্ধু কামরুজ্জামান *দৈনিক বাংলা* পত্রিকার স্পোর্টস রিপোর্টার। তিনি খেলা প্রসঙ্গে পত্রিকায় লিখলেন, আগামী বৃহস্পতিবার ক্যাপ্টেন হাফিজের বিয়ে, সেলিব্রেট করার জন্যই তিনি এ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন। পত্রিকার খবর পড়ে মোহামেডানের শতাধিক সমর্থক পূর্বাণী হোটেলে বিয়ের প্রীতিভোজে বিনা দাওয়াতেই অংশগ্রহণ করে। ক্যাপ্টেন ইকবাল ও কন্যাপক্ষ এতজন অপরিচিত-অনিমন্ত্রিত অতিথিকে খাবার সরবরাহ করতে গিয়ে হিমশিম খান। গভীর রাতে নিমন্ত্রিত সিনিয়র অফিসারদের খাবার টেবিলে কিছু আইটেম কম পড়ে

যায়। বিয়ের সময় পকেটে যৎসামান্য অর্থকড়ি ছিল, আসবাবও তেমন ছিল না। কিন্তু পরিবেশই এমন ছিল যে কোনো কিছুরই অভাব বোধ করিনি। বিবাহ-উত্তর বউভাত অনুষ্ঠান আব্বার তত্ত্বাবধানে বরিশালে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমাকে তেমন বড় খরচের সম্মুখীন হতে হয়নি। বর-কনে উভয় পক্ষেরই কোনো দাবিদাওয়া ছিল না। যার যার সাধ্যমতো ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছিল। তখন সোনার ভরি ছিল ৩৩৭ টাকা। ছোট সেনাবাহিনীতে সব পদবির অফিসারদের মধ্যে এমন সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা ছিল, যা পরবর্তীকালে দেখা যায়নি। একজন ক্যাপ্টেনের বিয়েতে সেনাপ্রধান ও সিনিয়র অফিসারদের অংশগ্রহণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিয়ের পর আমাদের মতো সদ্য বিবাহিত কয়েকজন ক্যাপ্টেনকে সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ সেনাভবনে সস্ত্রীক আমন্ত্রণ জানিয়ে নৈশভোজে আপ্যায়ন করেছিলেন।

বিয়ের কিছুদিন পর সরকারি খরচে হানিমুনও সেরে ফেললাম। ভারতীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ দিল্লিতে ডুরান্ড কাপে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে আমন্ত্রণ জানায়। বাংলাদেশ সরকার আমাকে এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নুরুন্নবীকে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করে এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য। মোহামেডান ক্লাব আমার এবং নববধূর বিমানভাড়া বহন করে। প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়ার পর টিম দেশে ফিরে আসে। আমি ও দিলারা দিল্লি, আগ্রায় হানিমুন উদ্‌যাপন করে কয়েক দিন পর ঢাকায় ফিরে আসি।

'৭২-এর মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় ৪৬তম ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন সেনাবাহিনীর কৃতী অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বীর উত্তম। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে তিনি ১ম ইস্ট বেঙ্গলের অ্যাডজুট্যান্ট এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। একই পল্টনে চাকরি করার সুবাদে আমি তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলাম। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পর দু-চারজন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার বিহারিদের বাড়ি ও গাড়ি অবৈধভাবে দখল করেন। জিয়াউদ্দিন এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং প্রতি সপ্তাহে ব্রিগেড স্টাডি পিরিয়ডে সব অফিসারকে দুর্নীতিমুক্ত থাকার জন্য জোরালো বক্তব্য দিতেন। পেশাগত দক্ষতা এবং চারিত্রিক গুণাবলির জন্য তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সব অফিসারের কাছে রোল মডেলে পরিণত হন। মুক্তিযুদ্ধের গণসম্পৃক্ততা থেকে তাঁর মনে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা দৃঢ় ভিত্তি গেড়ে বসে। তিনি একসময় উপলব্ধি করেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভবপর নয়। মুক্তিযুদ্ধে ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহেরও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে দীক্ষা লাভ করেন। তাঁরা সেনা সদরে উচ্চপর্যায়ের সভায় মত প্রকাশ করেন যে পশ্চিমা ধাঁচের ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের

জন্য বোঝাস্বরূপ। তাঁরা মার্ক্সিস্ট ধারায় 'কৃষক আর্মির' মডেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে রূপান্তর করার প্রস্তাব দেন।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তি সই করেছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর জাসদ ও বামপন্থী দলসমূহ এ কথিত চুক্তিকে গোলামি চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং এটি বাতিল করার দাবি জানায়।

জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও আমরা কখনো রাজনীতি নিয়ে আলাপ করিনি। তিনি সুদর্শন ও অবিবাহিত ছিলেন। নারীরা সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। একজন সুন্দরী নারী তাঁকে ইংরেজিতে চমৎকার পত্র লিখতেন, সেগুলো জিয়াউদ্দিন আমাকে পড়তে দিতেন। তাঁর সিভিল টেলিফোন থেকে আমি আমার হবু স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতাম তাঁর উপস্থিতিতেই। এত অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও জিয়াউদ্দিন একটি কাজ অতি গোপনে করে ফেলেন, আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানালেন না। আগস্ট মাসের শেষ দিকে সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় 'Hidden Prize' নামে একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন সেনা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই। এ নিবন্ধে তিনি আওয়ামী লীগ সরকার এবং বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন এবং ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি বাতিল করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সময় বিদেশে ছিলেন। দেশে ফিরেই তিনি জিয়াউদ্দিনকে তাঁর সামনে হাজির করার জন্য সেনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ এবং উপপ্রধান জিয়াউর রহমান জিয়াউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যাওয়ার পথে গাড়িতে বসে তাঁরা জিয়াউদ্দিনকে নিবন্ধ প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। 'আমরা তোমার মতো কৃতী অফিসারকে হারাতে চাই না। প্লিজ, সে সরি,' তাঁরা বললেন। প্রধানমন্ত্রী জিয়াউদ্দিনকে নরমে-গরমে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জিয়া ক্ষমা প্রার্থনা দূরে থাক, তিনি আবারও প্রধানমন্ত্রীকে মৈত্রী চুক্তি বাতিল করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। পরদিন দুপুরে জিয়াউদ্দিন আমার কাছে লিফট চান। আমি আমার পুরোনো ইসুজু গাড়িতে করে তাঁকে কমলাপুর রেলস্টেশনে নামিয়ে দিলাম। তাঁর কোনো সম্পদ ছিল না। একটি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে তিনি অপেক্ষমাণ ট্রেনে চড়ে বসলেন। গন্তব্যে পৌঁছে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টিতে সামরিক কমান্ডাররূপে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডাররা কয়েকটি থানা আক্রমণ করে অস্ত্র সংগ্রহ করে।

জিয়াউদ্দিনের বরখাস্ত হওয়ার পর লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহেরও সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। তিনি পরবর্তীকালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে যোগ দেন। তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত বলব। সর্বহারা পার্টির কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনে অনভ্যস্ত জিয়াউদ্দিন অসুস্থ এবং কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। '৬৫ সালের যুদ্ধকালীন ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সহযোদ্ধা কোম্পানি কমান্ডার জিয়াউর রহমান যখন রাষ্ট্রপতি, কোয়ার্টার মাস্টার সাদিকুর রহমান চৌধুরী তাঁর সামরিক সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। জিয়াউদ্দিন একদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেজর জেনারেল সাদিকুর রহমান চৌধুরীকে টেলিফোন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। সাদিক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে জিয়াউদ্দিনকে গ্রিন সিগন্যাল দেন। জিয়াউদ্দিন জনসমক্ষে প্রকাশ্য হন। বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তাঁকে চট্টগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (সিডিএ) চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রামে একটি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং রাজনীতির সঙ্গে কোনোরূপ সম্পৃক্ততা নেই। এভাবেই আমার দেখা সেরা অফিসারের পেশাগত ক্যারিয়ারের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটে।

বামপন্থী ধারার বিপরীত চিত্রও দেখতে পেলাম '৭৩-এর মাঝামাঝি। আমি সেনা সদরে উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের একান্ত সচিবরূপে (পিএস) কর্মরত। দুই কামরা পরই অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ব্রাঞ্চে বসেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কর্মরত অবস্থায় 'পলাশ হাউজিং সোসাইটি' নামে একটি আবাসন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেন। প্লটের মূল্য সাশ্রয়ী, সেনা সদরে কর্মরত অফিসারদের মধ্যে এ প্রকল্পে জমি কেনার হিড়িক পড়ে গেল। এমনকি জিয়াউর রহমানও বেগম জিয়ার নামে পাঁচ কাঠার একটি প্লট কিনে ফেলেন! কেনার পরদিন সকালে আমাকে বললেন, 'ক্যাপ্টেন মতিউরকে ডাকো। আমি জমি নেব না, টাকা ফেরত চাই।' আমি মতিউরকে ডেকে টাকা ফেরত দিতে বললাম। এভাবেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কথাবার্তায় পরিবর্তন লক্ষ করলাম। তিনি আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে অফিসারদের মোটিভেট করা শুরু করলেন এবং তাঁর বেশ কয়েকজন ভক্তও জুটে গেল। একসময় তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ময়মনসিংহের এক গ্রামে আস্তানা গাড়েন। আধ্যাত্মিক জগতের 'পীর' মতিউর রহমানের নাম গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর মুরিদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। একসময় তিনি মুরিদদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেন এবং জিহাদের লক্ষ্যে সংগঠিত করেন। অচিরেই পুলিশ তাঁর রক্ষণব্যূহে হানা দিয়ে গুলি বিনিময়ের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জোব্বা, পাগড়ি

পরিহিত মতিউরকে কিছুদিন জেলও খাটতে হয়।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যুদ্ধ শেষে কেউ বামপন্থী, কেউ ডানপন্থী ধারায় সম্পৃক্ত হন। কেউবা জাগতিক মোক্ষ লাভের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে ধনকুবের বনে যান। একেই বোধ হয় বলে একই যাত্রায় পৃথক ফল!

১৯৭৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় ১ম ইস্ট বেঙ্গল তথা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান। ঢাকা সেনানিবাসে সিলভার জুবিলি কুচকাওয়াজে আমি প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করি। সালাম গ্রহণ করেন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ বীর উত্তম। এ প্যারেড কমান্ড করা আমার জন্য এক বিরাট সম্মান ও গৌরবের বিষয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বাঙালি ক্যাপ্টেন আবদুল গণি এই রেজিমেন্ট গঠন করেন। ২৩ বছর পর মহান মুক্তিযুদ্ধে আরেকজন ক্যাপ্টেন, অর্থাৎ আমি এই বিখ্যাত ব্যাটালিয়নকে পুনর্গঠন করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি।

'৭৩-এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ সাহসিকতা পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। বেশ কিছু অযোগ্য, বিতর্কিত, কাপুরুষ ব্যক্তি তদবিরের মাধ্যমে এ খেতাব লাভ করায় সামরিক বাহিনীতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তিন বাহিনীর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত খেতাব বাছাই কমিটির প্রধান বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার আর সেনাবাহিনীর বাছাই কমিটির প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তড়িঘড়ি করে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। একজনকে বীরশ্রেষ্ঠ, তিনজনকে বীর উত্তম, চৌদ্দজনকে বীর বিক্রম এবং পঁচিশজনকে বীর প্রতীক খেতাব দেওয়া হয়। ১ম ইস্ট বেঙ্গলের মাত্র উনিশজনকে খেতাব দেওয়া হয়। সিপাহি হামিদুর রহমানকে বীরশ্রেষ্ঠ, শহীদ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মোমতাজকে বীর উত্তম এবং আমাকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করা হয়। এঁদের যুদ্ধ চলাকালেই বাছাই করা হয়। যেহেতু সে সময় অল্প কয়েকজনকে দেওয়া হয়েছে, এটি নিয়ে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে খেতাব বণ্টনের তালিকা করা হয়, যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলো। পুরস্কার প্রদান কমিটির সদস্যরা সুযোগ পেয়ে নিজেরাই নিজেদের বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করেন, অথচ তাঁরা কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। সেক্টর কমান্ডাররা (জিয়া ও খালেদ মোশাররফ ছাড়া) ৯ মাস ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থান করেছিলেন অথচ তাঁরা বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হলেন। মাত্র দুজন সেক্টর কমান্ডার

মেজর ওসমান ও মেজর জলিলকে রাজনৈতিক কারণে খেতাব দেওয়া হলো না। তাঁর পরিবর্তে সাব-সেক্টর কমান্ডার শাহজাহান উমরকে বীর উত্তম খেতাব দেওয়া হলো। কমিটির প্রধান এ কে খন্দকার বিমানবাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে কোনো অপারেশনে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও খেতাব দিলেন। পৃথিবীর কোনো সেনাবাহিনীতে যুদ্ধ না করেও সাহসিকতা পুরস্কার বাগিয়ে নেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। এতে সাধারণ সৈনিক, যাঁরা সামনাসামনি যুদ্ধে অংশ নেয় তাঁদের বঞ্চিত করা হয়। আমি বীর বিক্রম খেতাব পেয়ে নিজেকে অবমূল্যায়িত মনে করি এবং সারা জীবন গ্লানিতে ভুগি।

প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাজ্যে

১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্য সরকার রয়্যাল আর্মি স্টাফ কলেজে প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি স্কলারশিপ দেয়। সেনা সদরে বেশ কয়েকজন অফিসারকে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করায় আমাকে জুনিয়র কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ ফোর্সের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সেনা সদর পরবর্তী সময়ে আরও একটি স্লট দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে ব্রিটিশ সরকার সম্মত হয় এবং সেনাপ্রধানের এডিসি ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদ খানও এই কোর্সে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। রয়্যাল আর্মি স্টাফ কলেজের পরিচালনায় দুই মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কোর্স ওয়ার মিনিস্টার ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। এই কোর্সটিতে ব্রিটিশ সেনা অফিসারদের (মেডিকেল কোর ছাড়া) অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে আমি ও হেলাল মোর্শেদ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানে চড়ে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। ছবির মতো সাজানোগোছানো ওয়ারমিনস্টারকে প্রথম দর্শনেই ভালো লাগল। চারদিকে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা বৃহৎ উপত্যকায় জুনিয়র ডিভিশন স্টাফ কলেজ। অনেকটা কাকুল মিলিটারি একাডেমির মতো। স্টুডেন্ট অফিসার মেসের পাশেই ব্যারাকে আমাকে একটি সুসজ্জিত কক্ষ বরাদ্দ করা হলো। পাকিস্তান ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর রীতিনীতি, ট্র্যাডিশন ইত্যাদি ব্রিটিশ আর্মি থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। আমি সহজেই মেস লাইফে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হলাম। মেসে ও ব্যারাকে ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে গল্পসল্প করে সব জড়তা কেটে গেল। ব্রিটিশরা প্রথম আলাপে কিছুটা ফরমাল বলে মনে হলেও কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল শিক্ষার্থী অফিসারদের সঙ্গে। ছাত্ররা সবাই ব্রিটিশ আর্মির ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কের অফিসার, মাত্র চারজন বিদেশি অফিসার এই

কোর্সে অংশগ্রহণ করছে। বাংলাদেশের দুজন এবং সিয়েরা লিওনের দুজন। কোর্সে পড়াশোনার বেশ চাপ এবং সবাইকে সিরিয়াস প্রফেশনাল বলেই মনে হলো। শিক্ষার্থীদের ছয়টি সিন্ডিকেটে ভাগ করে দেওয়া হলো। ডাইরেকটিং স্টাফরা (ডিএস) মেজর র‍্যাঙ্কের তুখোড় অফিসার। এদের পেশাগত জ্ঞান ও প্রশিক্ষকরূপে দক্ষতা অতি উচ্চমানের, সহজেই সমীহ আদায় করে নেয়।

কোর্স শুরুর আগে নিজের সামর্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ছিলাম। ব্রিটিশ আর্মির রণকৌশল, অস্ত্র, সরঞ্জাম ইত্যাদির সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না আমাদের। যেসব ট্রেনিং ম্যানুয়েল, বইপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে, অনেকটাই প্রাথমিকভাবে কঠিন বলে মনে হতো। কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক যাওয়ার পরই আমরা প্রশিক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। একদিন আমার ডিএস সাঁজোয়া বাহিনীর চৌকস মেজর রিচার্ড ওয়েবস্টার ক্লাস চলাকালেই বললেন, 'হাফিজ, আমার পূর্বধারণার চেয়ে তোমাকে অন্য রকম বলে মনে হচ্ছে। আমি ব্রিটিশ অফিসারদের যে মানদণ্ডে মূল্যায়ন করব, তোমার ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য হবে। তোমার ইংরেজি ভাষাজ্ঞান আমাদের অনেকের চেয়ে ভালো।' জবাবে বললাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'ডোন্ট কল মি স্যার, কল মি ডিক,' ওয়েবস্টার বললেন।

'রাইট স্যার,' অভ্যাসবশত মুখ থেকে বেরিয়ে এল। ক্লাসের সবাই হেসে উঠল। ব্রিটিশ আর্মিতে অফিসাররা একে অন্যকে কথায় কথায় আমাদের মতো 'স্যার স্যার' করেন না। সেকেন্ড লেফটেন্যান্টও মেজর পদবির অফিসারকে নাম ধরে ডাকেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও উপরস্থ র‍্যাঙ্কধারীদের সাধারণত র‍্যাঙ্ক অনুসারে সম্বোধন করা হয়, যেমন ইয়েস কর্নেল কিংবা ওকে জেনারেল। তবে সাধারণত সৈনিকেরা, যাঁদের 'আদার র‍্যাঙ্ক' বলা হয়, তাঁরা অফিসারদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করেন।

আমাদের পদাতিক বাহিনীর রণকৌশলও কিছুটা পুরোনো হয়ে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে ট্যাংক বাহিনীর কোনোরূপ দেখাসাক্ষাৎ, বোঝাপড়া নেই। আমাদের দেড় হাজার আর্মাড কোর সৈনিকের জন্য রয়েছে মাত্র তিনটি ট্যাংক। ব্রিটিশ আর্মি 'ব্যাটল গ্রুপ' কনসেপ্টে অভ্যস্ত। তাদের পদাতিক বাহিনী এবং ট্যাংক স্কোয়াড্রন একসঙ্গেই অবস্থান করে, প্রশিক্ষণ নেয় এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করে। উন্নত দেশের পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে আমাদের মূলত পার্থক্য এখানেই। এ ছাড়া ব্রিটিশ বাহিনী পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত, যা আমাদের কল্পনারও বাইরে। পারমাণবিক অস্ত্রের সীমিত ব্যবহার তাদের রণকৌশলেরই অংশ। '৭৩-এর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বাহিনী ন্যাটো বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, কোড ওয়ারের রেশ তখনো ভালোভাবেই বিদ্যমান। আমি যখন বললাম আমাদের সেনাবাহিনীকে অস্ত্র

সরবরাহ করে চীন, বিমানবাহিনীকে যুদ্ধবিমান দেয় রাশিয়া এবং নৌবাহিনীর রণতরি সরবরাহকারী ব্রিটিশ সরকার, তারা বিস্ময় প্রকাশ করত!

একটি বিষয়ে আমি সতীর্থদের চেয়ে ভাগ্যবান ও আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। একমাত্র আমারই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে শত্রু সেনাদল কেমন আচরণ করবে, সেটি ডিএস ও সতীর্থরা আমার কাছ থেকে জানতে চাইতেন। লক্ষ করেছি, আমার বক্তব্য তাঁরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন এবং তাঁদের চেহারায় সমীহ ফুটে উঠছে।

একটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। একদিন আমাদের কোর্সকে টিইডব্লিউটি (ট্যাকটিক্যাল এক্সারাইজ উইদাউট ট্রুপস), অর্থাৎ সৈনিক ছাড়া যুদ্ধমহড়া প্রশিক্ষণের জন্য ক্যান্টনমেন্টের বাইরে পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হলো। ডিএস আমাদের জানালেন, ৬০০ গজ দূরেই আমাদের মুখোমুখি শত্রু শক্ত রক্ষণব্যূহ গড়ে তুলেছে। এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে আমাদের শত্রুঘাঁটি দখল করতে হবে। কোন দিক থেকে আক্রমণ করলে আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি, ডান দিক থেকে নাকি বাঁ দিক থেকে? আমাদের সিন্ডিকেট ১৬ জন অফিসার নিয়ে গঠিত। ১৫ জনই বললেন, তাঁরা ডান দিক থেকে শত্রু অবস্থানে আক্রমণ করতে চান। আমি ডিএসকে জানালাম যে আমি বাঁ দিক থেকে আক্রমণ করতে চাই। আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে মূলত তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করলাম এবং বললাম, আমার যুদ্ধ অভিজ্ঞতা আমাকে বাঁ প্রান্ত থেকে আক্রমণ করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে। ডিএস বললেন, 'তুমি একমাত্র ব্যক্তি, যে লেফট অ্যাটাক বেছে নিয়েছ। স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলে প্রদত্ত সমাধান রাইট অ্যাটাক। কিন্তু আমি তোমার যুক্তিসমূহকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি এবং ব্যক্তিগতভাবে আমিও মনে করি লেফট অ্যাটাকে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। আমি তোমার অ্যানালাইসিস ও সিদ্ধান্ত স্টাফ কলেজের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে পাঠাব।'

আমাদের কোর্স শেষ হওয়ার আগের দিন রাতে অফিসার মেসে সমাপনী ডিনারে যোগ দিলেন স্টাফ কলেজ ক্যামবারলির কমান্ড্যান্ট। তিনি আমার ডিএসকে নিয়ে আমার টেবিলের পাশে এসে একটি সুসংবাদ দিলেন। তাঁর বক্তব্য এ রকম :

'ইয়ং ম্যান, আমি একজন জেনারেল। কিন্তু কোনো যুদ্ধ অভিজ্ঞতা নেই আমার। তুমি ভাগ্যবান, তাই অল্প বয়সেই যুদ্ধ করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছ। যুদ্ধ অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই। আমরা কিছুদিন আগে টিইডব্লিউটিতে তোমার লেফট অ্যাটাক-সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। আমরা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছি, তোমার বাঁ দিক থেকে আক্রমণের সিদ্ধান্তই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। আমরা এ-সংক্রান্ত ডিএস সলিউশন পরিবর্তন

করে লেফট অ্যাটাক বেছে নিয়েছি। কনগ্র্যাচুলেশনস।' আমি অভিভূত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানালাম। অনুন্নত, সদ্য স্বাধীন এবং মান্ধাতার আমলের অস্ত্র ও সরঞ্জাম ব্যবহারকারী একটি দেশের একজন জুনিয়র অফিসার আমি। আমার মতো সামান্য একজন ক্যাপ্টেনের পরামর্শ গ্রহণ করেছে রয়্যাল আর্মি স্টাফ কলেজ! অকল্পনীয়! স্কটিশ ব্যান্ডের বিউগলের শব্দ ছাপিয়ে ব্রিটিশ জেনারেলের সে অভিনন্দনবার্তা হৃদয়ে গেঁথে আছে আজও। যেন গতকালের ঘটনা!

কোর্স সমাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অফিসার সম্পর্কে জুনিয়র ডিভিশন স্টাফ কলেজ একটি রিপোর্ট পাঠায়। আমার সম্পর্কে পাঠানো রিপোর্টে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আমার ভূয়সী প্রসংশা করে। সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ কোর্সে ভালো ফল অর্জনের জন্য আমাকে লিখিত কমেন্ডেশন পাঠান।

জুনিয়র কমান্ড ও স্টাফ কোর্স সমাপ্ত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন মোর্শেদ ও আমাকে দুই সপ্তাহের অ্যাটাচমেন্টে পাঠানো হলো ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একটি অতি প্রাচীন পদাতিক ব্যাটালিয়ন ফার্স্ট কুইনসে। ব্রিটিশ পদাতিক ইউনিটের দৈনন্দিন কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতালাভের জন্যই আমাদের সেখানে সংযুক্ত করা হলো। ফার্স্ট কুইনস বুলফোর্ড ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছিল। এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুন্দর সকালে আমরা এই ঐতিহ্যবাহী ইউনিটে পদার্পণ করি। ব্রিটিশ অফিসাররা আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের বুলফোর্ডে স্বাগত জানালেন।

একদিন বুলফোর্ডের এক বিপণিবিতানে যাওয়ার পথে লক্ষ করলাম, শহরের রাস্তার দুই পাশে হাজার হাজার নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে কারও জন্য অপেক্ষা করছে। একটু পরই দেখলাম গুর্খা ব্যাটালিয়নের সৈনিকেরা ব্যান্ড বাদকদের সামনে রেখে মার্চ করে চলেছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে। এরা সেই বিখ্যাত ব্যাটালিয়ন, ফকল্যান্ড যুদ্ধে ব্রিটিশদের হয়ে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ শেষে তারা নিজ স্থায়ী নিবাস বুলফোর্ডে ফিরে আসছে। কৃতজ্ঞ ব্রিটিশ নাগরিকেরা রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে এই বীর সেনানীদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। গুর্খা সৈনিকদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য, শত বছর ধরে তারা ব্রিটিশ ও অন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে পেশাদার সৈনিকরূপে দায়িত্ব পালন করছে। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় বাহিনীর ৪/৫ গুর্খা ব্যাটালিয়নের সঙ্গে আমরা সিনিয়র টাইগার্স সিলেট অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম। তাদের শৌর্যবীর্য দেখে অভিভূত হয়েছি। গভীর রাতে তাদের ওয়ার ক্রাই 'আয়ো গুর্খালি' (গুর্খারা এসে গেছে) শত্রুর হৃৎপিণ্ডে কম্পন ধরিয়ে দেয়।

বুলফোর্ডে অবস্থানের শেষ পর্যায়ে আমাদের ফেয়ারওয়েল ডিনার নাইট উদ্‌যাপিত হলো। ১ম কুইনসের সিও আমাদের প্রশংসা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেন। মেসের লম্বা ডাইনিং টেবিলের দুই পাশে বর্ণাঢ্য পোশাক ব্লু প্যাটরল পরে অফিসাররা সারিবদ্ধভাবে বসা। সিলভার কাঁটাচামচ ব্যবহার করে নীরবে সুস্বাদু খাবার খাচ্ছেন। ঐতিহ্য অনুযায়ী টেবিলের এক প্রান্তে সিনিয়র মোস্ট, অর্থাৎ কমান্ডিং অফিসার বসেন। অপর প্রান্তে তাঁর উল্টো দিকে বসে জুনিয়র মোস্ট লেফটেন্যান্ট, যাঁকে বলা হয় মিস্টার ভাইস।

আমি লক্ষ করলাম, আগের দুটি ডিনার নাইটের মতো আজও টেবিলের এক প্রান্তে মিস্টার ভাইসের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটি খালি। আমি কৌতূহলবশত সিওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কর্নেল, মিস্টার ভাইসকে দেখছি না কেন?'

উত্তরে তিনি একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করলেন।

'আজ থেকে ১৫০ বছর আগে ১ম কুইনস একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধের একপর্যায়ে একজন সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জনসন এই পল্টনে যোগ দেন। যোগদানের কয়েক ঘণ্টা পরই তাঁকে ছয়জন সৈনিকসহ রেকি প্যাট্রলে পাঠানো হয় শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য। কিছুদূর যাওয়ার পর জনসন শত্রুর একটি বৃহৎ সেনাদলের কাছাকাছি পৌঁছে যান। জনসনের দায়িত্ব ছিল শত্রুর অবস্থান জানা, তাকে আক্রমণ করা নয়। কিন্তু দুঃসাহসী তরুণ জনসন একটি সুবিধামতো স্থানে শত্রু বাহিনীকে অ্যামবুশ করার সিদ্ধান্ত নেন। একটি গিরিখাদে তিনি শত্রু বাহিনীকে অতর্কিত অ্যামবুশ করে প্রায় ৫০ জনকে হত্যা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুসেনারাও সংগঠিত হয়ে জনসনের অ্যামবুশ পার্টিকে ঘেরাও করে ফেলে এবং পাল্টা আক্রমণ করে। এই অসম যুদ্ধে অতুলনীয় শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেন জনসন এবং তাঁর সঙ্গীরা নিহত হন। সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত সেকেন্ড লে. জনসনের বীরত্বগাথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ১ম কুইনস ব্যাটালিয়ন ডাইনিংরুমে তাঁর জন্য নির্ধারিত মিস্টার ভাইসের চেয়ারটি ১৫০ বছর ধরে অব্যবহৃত রেখে আসছে।'

মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এরই নাম সামরিক ঐতিহ্য। Row courage is the name of the game. কত বিচিত্র, গৌরবময় সৈনিক জীবন। কতই না মূল্যবান রেজিমেন্টের পতাকা! উপলব্ধি করলাম, ইংল্যান্ড বিশ্বমানচিত্রে একটি অনতিবৃহৎ দ্বীপমাত্র, অথচ তার অধিকৃত সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না!

দেখতে দেখতে আমাদের অ্যাটাচমেন্টের সময় শেষ হয়ে এল। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া ভাতা এবং সিলেটি আত্মীয়দের কাছ থেকে পাওয়া উপহার মিলিয়ে পকেটে বেশ কিছু পাউন্ড

জমেছে। এর সদ্ব্যবহার করার জন্য স্ত্রী দিলারাকে ইংল্যান্ডে আসার জন্য এত্তেলা দিলাম, সে-ও একপায়ে খাড়া। ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা বিমানভাড়া তখন সাকল্যে পাঁচ হাজার টাকা।

আমার বুলফোর্ডের সংযুক্তি সমাপ্ত হওয়ার পরদিন দিলারা লন্ডনে এসে পৌঁছাল। আমি হিথরো এয়ারপোর্টে তাকে স্বাগত জানালাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন ছাত্রনেতা, পরবর্তীকালে ঢাকার মেয়র ও মন্ত্রী ব্যারিস্টার হাসনাত এবং সতীর্থ চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট মাহমুদ হাসান (মনু) আমাদের লন্ডনের দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরিয়ে দেখাল। চমৎকার সময় কাটিয়েছি আমরা সেই প্রথম লন্ডন ভ্রমণে। পরবর্তী গন্তব্য ম্যানচেস্টার। চাচাতো ভাই গোলাম মোস্তফা পেশায় অ্যাকাউনট্যান্ট, ব্রিটিশ নাগরিক। এক সপ্তাহ তাদের উষ্ণ আতিথেয়তা উপভোগ করে দেশে ফিরে এলাম।

চক্রান্ত আর বিভেদ-বিভ্রান্তির কালো সময়

ম্যানচেস্টারে থাকাকালে জানতে পারলাম, দেশে প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তানি আমলে আমার পিতা ভোলা-৩ আসন থেকে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বিরোধীদলীয় উপনেতার দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি সদ্য গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থীরূপে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য ভোলা শহরে গেলে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা তাঁকে বাসা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ কারণে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। এভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ আসনে নির্বাচিত হলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ঢাকায় চারটি এবং ভোলার একটি আসন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এহেন কারচুপি এবং সন্ত্রাস জাতির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে কালিমা লেপন করে। আমার ছোট ভাই নুরউদ্দিনকেও রক্ষীবাহিনী লালমোহনে গ্রেপ্তার করে। এসব ঘটনায় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কিত হলাম।

দেশে ফিরে মাসখানেক ১ম ইস্ট বেঙ্গলে উপ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালনের পর সেনা সদর দপ্তরে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের একান্ত সচিবরূপে (পিএস) আমার পোস্টিং হলো। কমিশন পাওয়ার পর একনাগাড়ে পাঁচ বছর ১ম ইস্ট বেঙ্গলে কর্মরত ছিলাম। এখানে কাটিয়েছি জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। যশোর ক্যান্টনমেন্ট বিদ্রোহের পর

একমাত্র অফিসার হিসেবে আমিই এই পল্টনকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছি ৬০০ ছাত্র-যুবক রিক্রুট করার মাধ্যমে। এই পল্টনের বাইরে চাকরি করার সময় কখনো মনে হয়নি আমি এদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই সেতুবন্ধ জন্মজন্মান্তরের, যার প্রমাণ সৈনিকেরা পরবর্তীকালে দিয়েছে।

'৭৩-এর জুলাইয়ে সেনা সদরে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিলাম। পুরো সেনাবাহিনীতে মাত্র দুজন মেজর জেনারেল, চিফ সফিউল্লাহ এবং ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমান। এঁরা দুজন একই কোর্স ১২তম পিএমএ লং কোর্সে কমিশনপ্রাপ্ত, কিন্তু পাসিং আউট মেধাতালিকায় ওপরে অবস্থান করায় জিয়াই চাকরিতে সিনিয়র। পেশাগত দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা বিবেচনায় জিয়াকেই সেনাপ্রধানরূপে নিয়োগ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান নিয়োগ দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যে বিভেদের বীজ রোপণ করে, তার ফল ভালো হয়নি। সফিউল্লাহ মৃদুভাষী, সহজ-সরল মানুষ, কোনো প্যাঁচগোজের ধার ধারেন না। জেনারেল ওসমানী জিয়াউর রহমানকে বিভিন্ন কারণে তেমন একটা পছন্দ করতেন না। প্রধানত তাঁর সুপারিশেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ দেন। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণাকালে জিয়া নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে ঘোষণা দেওয়ার কারণে তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের চোখে বিতর্কিত ও উচ্চাভিলাষী একজন সেনা কর্মকর্তারূপে প্রতিভাত হন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি আমলে সেনাশাসকদের হাতে বারবার নিগৃহীত হওয়ার কারণে বাঙালি সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। সহজ-সরল সফিউল্লাহকেই আওয়ামী লীগ নেতারা অধিকতর নিরাপদ ভেবেছিলেন। তবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থানকারী বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনী কিংবা কোনো সেনা কর্মকর্তাকে প্রতিপক্ষ বলে ভাবেননি।

সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান নিয়োগ দেওয়ার কারণে জিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হন কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি আওয়ামী সরকার কিংবা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কোনোরূপ বিরূপ মন্তব্য করেননি। প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী মন্ত্রীদের কাছে নিজেকে পরবর্তী সেনাপ্রধানরূপে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে যান। তিনি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত এক প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলে অভিহিত করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু শেষ বিচারে তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হননি।

পরবর্তী সেনাপ্রধান হওয়ার জন্য জিয়াউর রহমানের সমান্তরালে গোপনে লবিং শুরু করেন চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। যশোরের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী খালেদের

কোর্সমেট কিন্তু মেধাতালিকায় উচ্চতর অবস্থানের কারণে খালেদের সিনিয়র ছিলেন। তিনি আউট অব টার্ন চিফ হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হননি কিন্তু সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ গ্রুপিংয়ে জিয়াকেই সমর্থন করতেন। জিয়া ও মীর শওকত খালেদকে মোটেই পছন্দ করতেন না। এ ধরনের গ্রুপিং সেনাবাহিনীর ঐক্যে ফাটল ধরায়, যদিও জুনিয়র অফিসাররা এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু সদ্য স্বাধীন দেশে অফিসারদের গ্রুপিং ও অপ্রয়োজনীয় লবিং সেনাবাহিনীর পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

জিয়াউর রহমানের একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল, তিনি কলকাতা ও করাচিতে বেড়ে উঠেছেন। করাচির একটি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পরই তিনি কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে ক্যাডেটরূপে যোগ দেন। বাংলা লিখতে-পড়তে তাঁর অসুবিধা হতো। ঢাকায় তাঁর বন্ধুবান্ধব কিংবা সহপাঠী কেউ ছিল না। অপর দিকে খালেদ মোশাররফ ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বেড়ে উঠেছেন, বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছেন। এখানকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বহু সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব রয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে তিনি সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ।

খালেদের আপন ছোট ভাই রাশেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য থাকায় সেনাপ্রধান হওয়ার রেসে তিনি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। খালেদ ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডাররূপে ঢাকা শহরের মুক্তিযোদ্ধা তরুণ ও ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। স্বাধীনতালাভের পর এসব তরুণ খালেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং খালেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। পক্ষান্তরে জিয়া কিছুটা রাশভারী প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, জুনিয়র অফিসার ও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতেন। করাচি ও কলকাতায় বেড়ে ওঠার কারণে ঢাকায় তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনের সংখ্যা কম ছিল। আওয়ামী লীগ নেতা, জাতীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রী—এঁদের সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচয় কিংবা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে তিনি আওয়ামী নেতাদের গুড হিউমারে রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। কারণ, তাঁরা আগাগোড়াই তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন।

চিফ সফিউল্লাহ ও ডেপুটি চিফ জিয়ার মধ্যে মানসিক দূরত্ব ক্রমবর্ধমান ছিল। ডেপুটি চিফ অব স্টাফ পদটি এ সময় আলংকারিক রূপ পরিগ্রহ করে। সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফাইল জিয়ার কাছে আসত না। চিফ তাঁকে বাইপাস করে সিজিএস এবং দুজন পিএসও (প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার) এজি, সিওএলের মাধ্যমে যাবতীয় কাজ পরিচালনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে কর্মহীন জিয়ার একমাত্র দায়িত্ব ছিল চারটি ক্যাডেট কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করা। এ দায়িত্বকে জিয়া সিরিয়াসলি

নিয়েছিলেন। প্রতি মাসেই তিনি একটি ক্যাডেট কলেজ ভিজিট করতেন এবং কলেজের দৈনন্দিন কার্যক্রম, পাঠক্রম, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খতিয়ে দেখতেন। ক্যাডেট কলেজ গভর্নিং বডির সেক্রেটারিরূপে আমিই মিটিং ডাকতাম।

সেনাবাহিনীতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে না পারার কারণে, বিশেষ করে জুনিয়রের অধীনে চাকরিরত থাকার কারণে তিনি বিষণ্ন থাকতেন। তেমন কোনো ফাইল না আসার কারণে তাঁর তখন অখণ্ড অবসর, অফিসে এসেই তিনি একটা বই নিয়ে বসতেন। *টাইম, নিউজউইক* এবং আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকাগুলো পড়ে সময় কাটাতেন। দুইটা বাজলেই ইন্টাররুমে তাঁর ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে আসত, 'Let us call it a day.' অফিস থেকে বেরিয়ে কালো মার্সিডিজ স্টাফ কারে এডিসি ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে পাশে নিয়ে শহীদ মইনুল রোডের বাসায় যেতেন। এই ছিল তাঁর প্রতিদিনের রুটিন, তিন বছর ডিসিএএস থাকাকালে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, যা পরবর্তীকালে তাঁকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেছে।

মির্জাপুর, রাজশাহী, ঝিনাইদহ ও ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজসমূহে আমরা সামরিক জিপে চড়ে যেতাম এবং আমিই ড্রাইভ করতাম। জিয়া অল্প কথার মানুষ। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় সাধারণত তিনি চুপচাপ থাকতেন। টুকটাক আলাপচারিতায় আমিই কথা বলতাম। তিনি ধৈর্যশীল শ্রোতা। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করতাম আমরা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেক কঠিন সময় পার করেছি আমরা।

সকালে তাঁর অফিসে প্রথম প্রবেশের সময় সচরাচর জিজ্ঞাসা করতেন, 'Any News, what is happening?' আমি আমার জানামতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁকে ব্রিফ করতাম। যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে থাকার কারণে তিনি আমাকে স্নেহ করতেন এবং মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও জানতে চাইতেন। একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, বলো তো সরকার কি আমাকে কখনো সেনাপ্রধান বানাবে?' আমার ত্বরিত জবাব, 'কখনো না।' তিনি একটু হতাশ হলেন।

'একজন আমাকে বলেছেন আমি চিফ হবই,' তিনি দৃঢ়ভাবে জানালেন।

'কে বলেছে, স্যার?' আমার জিজ্ঞাসা।

'একজন পামিস্ট (হস্তরেখাবিদ) বলেছেন, খুবই নামকরা ব্যক্তি,' জিয়া বললেন।

'স্যার, কিছু মনে করবেন না, আমি পামিস্ট্রিতে বিশ্বাস করি না। তবে শুনতে পাচ্ছি আপনাকে শিগগিরই রাষ্ট্রদূত করে বিদেশে পাঠানো হবে।' আমি সরাসরি জানালাম।

জিয়া বিচলিত হলেন। 'খুরশীদকে ডাকো,' আমাকে নির্দেশ দিলেন। ব্রিগেডিয়ার খুরশীদ মেডিকেল কোরের সিনিয়র অফিসার। জিয়ার একান্ত সুহৃদ ও ভক্ত। ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বরখাস্ত হয়েছিলেন এবং এই মামলার সুবাদে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার খুরশীদকে ফোন করে জেনারেল জিয়ার মেসেজ দিলাম। ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে খুরশীদ এলেন। জিয়ার রুমে ১০ মিনিট সময় কাটিয়ে সোজা ৩২ নম্বর রোডে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেলেন। সে বাড়ির শয়নকক্ষেও তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল। পরের দিন তিনি আমাকে পুরো ঘটনা বললেন। তাঁর জবানিতে শুনুন :

আমি বেডরুমে ঢুকে বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'স্যার, আমার একটা কথা রাখতেই হবে।'

'আগে বল, কী কথা?' বঙ্গবন্ধু।

'আগে বলেন আমার কথা রাখবেন কি না?' আমি আরও শক্তভাবে তাঁকে জড়িয়ে ধরি।

'আরে পাগলা, ছাড় ছাড়। আচ্ছা, ঠিক আছে, রাখব তোর কথা।' বঙ্গবন্ধু।

'স্যার, জিয়াকে বাইরে পাঠাবেন না; সেনাবাহিনীতে তার মতো সৎ ও দক্ষ অফিসার এ মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন।'

প্রধানমন্ত্রী গম্ভীর হয়ে গেলেন। এক মিনিট চিন্তা করে খুরশীদকে বললেন, 'তোকে নিয়ে আর পারলাম না। এসব তদবির আর করবি না। শেষবারের মতো তোর কথা রাখলাম।' জিয়ার বিদেশে পোস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত ক্যানসেল হলো। জিয়া অবশ্যই ভাগ্যের বরপুত্র।

জিয়াউর রহমান সম্পর্কে তৎকালে ও পরবর্তীকালে হরেক রকমের কথা শোনা যায়। কারও কারও মতে, তিনি উচ্চাভিলাষী, ষড়যন্ত্রকারী, কূটচাল দিতে পারদর্শী। দুই বছর তাঁর একান্ত সচিবরূপে কর্মরত থাকায় তাঁকে কাছে থেকে দেখেছি। আমার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের (যেমন কর্নেল শাফায়াত জামিল, ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক, ব্রিগেডিয়ার খুরশীদ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর শওকত আলী, কর্নেল অলি প্রমুখ) মতে, জিয়া ছিলেন যেকোনো পরিস্থিতিতে স্থিতাবস্থার পক্ষে। অর্থাৎ সংকটকালে চুপচাপ বসে থেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন, হুটহাট করে কোনো অ্যাকশনে যাবেন না। পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণেই সংকট কেটে যাবে এবং শেষমেশ তিনি পুরস্কৃত হবেন। এঁরা বলাবলি করেন, একাত্তরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাঁচটি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন—যশোর, জয়দেবপুর, সৈয়দপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রামে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

করে। চট্টগ্রাম ছাড়া আর কোথাও রেডিও স্টেশন ছিল না। রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধে জিয়া চট্টগ্রামে রেডিও স্টেশনে যান এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ কাজটি করার কথা ছিল চট্টগ্রামের সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদারের, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে হেলিকপ্টারযোগে হঠাৎ ঢাকায় তলব করায় সব প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও তিনি এ সুযোগ পাননি। পরবর্তী জ্যেষ্ঠ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নিহত হলেন। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন মজুমদার ও চৌধুরী, পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হলেন মেজর জিয়াউর রহমান। মেজর সফিউল্লাহ, (২য় ইবি) মেজর খালেদ মোশাররফ, (৪র্থ ইবি) ক্যাপ্টেন আনোয়ার, (৩য় ইবি) ক্যাপ্টেন হাফিজ (১ম ইবি), এঁদের কারও কাছে রেডিও স্টেশন ছিল না একাত্তরে, ছিল একমাত্র জিয়ার নাগালে। ভাগ্যই বটে। আওয়ামী লীগ সরকার দুবার জিয়াকে অবসর দিয়ে বিদেশে রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ দিয়েছে, কিন্তু সেটি কার্যকর হয়নি যেকোনো কারণে।

১৯৭৩-এর শেষ ভাগে সেনানিবাসের দৃশ্যপটে বেশ কিছু নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গেল। পাকিস্তানে আটকে পড়া প্রায় ২০ হাজার বাঙালি সৈনিক এবং ৫০০ অফিসারের রিপ্যাট্রিয়েট হয়ে বাংলাদেশে আসা শুরু হলো। পাকিস্তান-প্রত্যাগত সিনিয়র অফিসাররা মুক্তিযোদ্ধা সফিউল্লাহ, জিয়া, খালেদ, মীর শওকতের তুলনায় অনেক সিনিয়র। Repatriation প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদসমূহে কাদের বসানো হবে, এ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হলো। পাকিস্তান-প্রত্যাগতদের মধ্যে রয়েছেন সর্বজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন। তিনি ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য। পেশাগতভাবে ততটা দক্ষ না হলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার আমলে প্রমোশন পেয়ে উচ্চপদে আসীন হন। তিনি নিজেকে প্রকাশ্যে বাঙালি দাবি করলেও তাঁর পুত্র শফি ওয়াসিউদ্দিন ও অন্যরা নিজেদের কাশ্মীরি বলে পরিচয় দিতেন। ওয়াসিউদ্দিন প্রত্যাগত হয়ে ঢাকায় এলেও আমার কোম্পানি অফিসার শফি পাকিস্তানেই থেকে যায়, পিতার সঙ্গে আসেনি। ৩০ মার্চে যশোরে আমাদের বিদ্রোহকালে সে বিদ্রোহে যোগ দেয়নি, পাকিস্তানি অফিসারদের সঙ্গে বসে থাকে।

১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন ঢাকা এয়ারপোর্টে অবতরণ করলে জাহাজ চলাচল ও বেসামরিক পরিবহনমন্ত্রী সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল ওসমানী তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগতম জানান এবং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নিয়ে যান। তিনি ওয়াসিউদ্দিনকে

সেনাপ্রধানরূপে নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে জানান।

সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ ওয়াসিউদ্দিনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁকে ও তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে (পাঠান) সেনা সদরের উল্টো দিকে অবস্থিত ভিআইপি মেসে থাকতে দেন। রাতে তাঁর সম্মানে এএইচকিউ মেসে পার্টির আয়োজন করা হয়। সেখানে আমি তাঁকে বোকার মতো এক প্রশ্ন করে বসি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, আপনি তো এলেন, আপনার পুত্র শফি যশোরে আমার কোম্পানি অফিসার ছিল। সে কি এসেছে?' ওয়াসিউদ্দিন একটু বিব্রত হলেন। কোনো উত্তর দিলেন না। অন্যদের কাছে জানলাম, শফি ঢাকায় আসেনি, সে পাকিস্তানে থাকার অপশন দিয়েছে।

পরদিন সফিউল্লাহ, জিয়া ও অন্য মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সরকার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে সেনা চাকরি থেকে অবসর দিয়ে জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ দিয়েছে। প্রত্যাগমন শুরু হওয়ার আগেই সব মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ দুই বছরের অ্যান্টি ডেট সিনিয়রিটি প্রদান করা হয়। পাকিস্তান-প্রত্যাগত অফিসাররা এতে ক্ষুব্ধ হলেও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা মেনে নিতে বাধ্য হন। সেনাবাহিনীতে ভারসাম্য আনার লক্ষ্যে পাকিস্তান-প্রত্যাগত চারজন জ্যেষ্ঠ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল এরশাদ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল দস্তগীর, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুর রউফ ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাশাহুরুল হককে চাকরিতে যোগদানের আগেই ফুল কর্নেল র‍্যাঙ্কে পদোন্নতি দেওয়া হয়। প্রত্যাগত অফিসারদের অনেকের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার অভিযোগও ছিল। স্বাধীন দেশে চাকরি করার সুযোগ পেয়ে তাঁরাও নিশ্চিন্ত হলেন। সেনা সদরের শীর্ষ পর্যায়ের দু-তিনটি পদ ছাড়া অন্যান্য পদে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রত্যাগত অফিসারদের পদায়ন করা হলে তাঁদের মধ্যেও স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু বাহিনীর অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা দুটি স্রোতোধারার সৃষ্টি-হয়। তবে সংগত কারণেই বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাধান্য থেকেই যায় পরবর্তী কয়েক বছর।

১৯৭২ সালে ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা ঢাকা ১ম বিভাগ ফুটবল লিগ শুরু হয়। আমি সেনা সদর থেকে অনুমতি নিয়ে আমার পুরোনো দল ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করি। কিন্তু সদ্য স্বাধীন দেশের ক্রীড়াঙ্গনে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজনৈতিক দলের চেলাচামুণ্ডারা বিভিন্ন ফেডারেশনে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পান, যাঁদের খেলাধুলা পরিচালনায় কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের

সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফাকে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ দেয় ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত এ ব্যক্তিরা ক্রীড়া পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। স্বাধীনতালাভের পর প্রথম বছরেই ঢাকা ফুটবল হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে।

১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডে কোর্স সমাপ্ত হওয়ার পর দেশে ফিরে আসি। ঢাকা ১ম বিভাগ ফুটবল লিগ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আমি আগেরবারের মতো ঢাকা মোহামেডানের হয়ে লিগে অংশগ্রহণ করি এবং প্রথম দুটি ম্যাচে মোট সাতটি গোল করি। দ্বিতীয় খেলায় ফায়ার সার্ভিস টিমের বিরুদ্ধে ছয়টি গোল করে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ডাবল হ্যাটট্রিক করার গৌরব অর্জন করি। এর পরপরই মালয়েশিয়ায় মারদেকা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় দল নির্বাচন করা হয়। ক্রীড়ামোদী জনগণ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে যে ডাবল হ্যাটট্রিক করার পরও আমাকে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। দুই বছর আগে ১৯৭০ সালে অবিভক্ত পাকিস্তান দল ইরানের মাঠে সর্বশেষ খেলায় অংশগ্রহণ করে। আমি সে দলের অধিনায়ক ছিলাম এবং দলে মাত্র তিনজন বাঙালি খেলোয়াড় ছিলেন—পিন্টু, নুরুন্নবী ও আমি। একটি শীর্ষ ক্লাবের কর্মকর্তা ও ছাত্রলীগ নেতা ১৯৭৩ জাতীয় ফুটবল দল গঠন করেন। আমাকে বাদ দেওয়ার প্রকৃত কারণ আমাকে জানানো হয়নি। এরপরও পাঁচ বছর ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত মোহামেডান দলের হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। দুবার দলকে লিগ শিরোপা এনে দিই এবং ১৯৭৬ সালে দলের অধিনায়ক ছিলাম। এ দেশের পতাকা আমার মতো বহু মুক্তিযোদ্ধার রক্তে রঞ্জিত। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে দেশটি সৃষ্টি করেছি, সে দেশের জাতীয় দলের জার্সি পরার সুযোগ থেকে আমাকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হলো। এ দুঃখ আমাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অধিকাংশ নাগরিকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয় এবং অগণিত দরিদ্র মানুষ খাদ্যের অভাবে মৃত্যুবরণ করে। সরকার ও বিত্তবান ব্যক্তিরা দেশের বিভিন্ন স্থানে লঙ্গরখানা খুলে সহায়-সম্বলহীন হতদরিদ্র মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট ছিল না। খোদ রাজধানী শহরের বিভিন্ন সড়কের পাশে বহু হতভাগ্য মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পত্রিকায়ও এসব কঙ্কালসার মৃতদেহের ছবি প্রকাশিত হতে থাকে। এহেন জাতীয় দুর্যোগকালেও কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তি কালোবাজারি, মুনাফাখুরির মাধ্যমে অর্থবিত্তে ফুলেফেঁপে ওঠে। দুর্ভিক্ষকবলিত উত্তরবঙ্গের এক জেলায়

বাসন্তী নামক এক দরিদ্র নারীর মাছ ধরার জাল পরে লজ্জা নিবারণের ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা দেশব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করে।

সরকার চোরাচালান বন্ধ এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করে। কিছুদিনের মধ্যেই সেনা তৎপরতার ফলে চোরাচালান বহুলাংশে হ্রাস পায়। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রমে সেনাসদস্যরা আওয়ামী লীগের জেলা পর্যায়ের কয়েকজন নেতার বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার করে। কুমিল্লার সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের বাড়ি থেকে মেজর শরিফুল হক ডালিমের বেশ কিছু অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করার ঘটনায় শাসক দলের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের একপর্যায়ে সেনা হেফাজতে কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে মেজর সাদুল্লাহ, ক্যাপ্টেন লতিফসহ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। টঙ্গী শিল্পাঞ্চল, ফরিদপুর, বাগেরহাটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনা কর্মকর্তারা শাসক দলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলে শাসক দলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের হস্তক্ষেপে সরকার গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের দ্রুত মুক্তি দেয়। ফলে সেনাসদস্যদের মনে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বাগেরহাট এলাকার অধীন এক অফিসারকে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের হয়রানিমূলক কার্যক্রম থেকে রক্ষা করতে গিয়ে যশোরের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আবুল মনজুর বীর উত্তম সরকারের রোষানলে পড়েন। তাঁকে দিল্লিতে কূটনৈতিক পদে দায়িত্ব দিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আমার বিয়ের এক বছর পর স্ত্রী দিলারা সন্তানসম্ভবা হলো। অধীর আগ্রহে আমরা নবজাতকের আগমনের জন্য অপেক্ষা করে চলেছি। '৭৪ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে দিলারাকে সিএমএইচের অফিসার ওয়ার্ডে ভর্তি করা হলো। সেকালে অফিসার ফ্যামিলি ওয়ার্ডে মাত্র দুটি ঘর ছিল—ইটের দেয়াল, ওপরে টিনের চাল। ২৪ এপ্রিল গভীর রাতে আমি নিদ্রামগ্ন, এমন সময় বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। অপর প্রান্তে গাইনি বিশেষজ্ঞ মেজর রোকাইয়া আনিসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'Congratulations, Major Hafiz, You have been blessed with a baby boy, weight 9 pounds, mother and son doing fine. Would you like to come over?' আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি গভীর রাতে গাড়ি চালিয়ে সিএমএইচে পৌঁছে নবজাতকের দেখা পেলাম। সে এক বিচিত্র অনুভূতি!

নবজাতকের নাম রাখা হলো শাহরুখ হাফিজ। দিলারা তখন ইডেন গার্লস কলেজের লেকচারার। কিছুদিন পরই বাচ্চাকে বোতলে গুঁড়া দুধ খাওয়ানো শুরু হলো, কিন্তু খোলাবাজার থেকে গুঁড়া দুধ এবং শিশুখাদ্য উধাও

হয়ে গিয়েছিল। সে সময় বাচ্চার দুধ সংগ্রহ করা আমার মতো বাবাদের জন্য প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সকালে অফিসে গিয়েই বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে বন্ধুদের ফোন করে ডানো, ফ্রিজিয়ানা এবং হরেক রকমের গুঁড়া দুধ সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করতাম। তারাও ওসব সংগ্রহ করে ঢাকায় আমার কাছে পাঠিয়ে দিত। বাঙালিরা আটার রুটি খেতে অভ্যস্ত ছিল না। রুটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হেলাফেলার খাবার বলে পরিচিত ছিল। ১৯৭৪ সালে চালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমরা জাতিগতভাবেই রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

'৭৩-এর মে মাসে আমি মেজর পদে পদোন্নতি পেলাম। কিন্তু আমার ও স্ত্রীর মিলিত উপার্জনেও সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হতো। বিনোদন বলতে গ্যারিসন সিনেমা হলে সপ্তাহে দুই দিন সিনেমা দেখা। টেলিভিশন আজকের মতো সহজলভ্য ছিল না। টেলিভিশনের উৎপাদন সীমিত বিধায় সেটি কিনতে হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পারমিট সংগ্রহ করতে হতো। ডিমান্ড বেশি, সাপ্লাই কম, সুতরাং পারমিট পাওয়াও সহজ ছিল না। ঢাকা স্টেডিয়ামের দু-চারটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা টেলিভিশনে দেখানো হতো মাঝেমধ্যে। আমার স্ত্রী প্রতিবেশী কর্নেল মালেকের* বাসায় যেত টিভিতে আমার খেলা দেখতে। পঁচাত্তরের গোড়ার দিকে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের একাত্তর সালের বকেয়া ৯ মাসের বেতন একসঙ্গে দেওয়া হলো। এ অর্থপ্রাপ্তিতে তখন আমার নিজেকে রকফেলার বলে মনে হলো। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের একান্ত সচিব ডেপুটি সেক্রেটারি ওয়ালিউর রহমান একজন মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রজীবনে ফজলুল হক হলে আমরা পাশাপাশি কক্ষে বসবাস করেছি কিছুদিন। তাঁকে টেলিভিশনের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে আউট অব টার্ন একটি সাদাকালো টেলিভিশনের পারমিট ইস্যু করে দেন। স্টেডিয়ামের একটি দোকান থেকে টেলিভিশন কিনে বাসায় ফিরে মনে হলো হাতে স্বর্গ পেয়েছি। কত অল্পেই না সন্তুষ্ট ছিলাম আমরা তখন। কোনো কিছুর অভাব বোধ করিনি, কতই না আনন্দমুখর ছিল জীবনটা।

রাজনীতির জটিল আবর্তে

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় থেকেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রধান বিরোধী দল জাসদ সরকারের বিরোধিতা করে দেশব্যাপী সভা-

---

* পরবর্তীকালে ঢাকার মেয়র ও মন্ত্রী।

সমিতি করার পাশাপাশি সশস্ত্র সংগ্রামের লক্ষ্যে গণবাহিনী গড়ে তোলে। কর্নেল (অব.) তাহেরের নেতৃত্বে ঢাকা সেনানিবাসে গড়ে তোলা হয় গোপন সৈনিক সংস্থা। সিগন্যাল ও সাপ্লাই কোরের অল্প কয়েকজন সৈনিক এ সংস্থার সদস্য হয়, তাদের লক্ষ্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা।

দেশের উত্তরাঞ্চলে মতিন-আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি বামপন্থী দল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। শ্রেণিসংগ্রামের নামে তারা জোতদার খতম অভিযান শুরু করে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বাধ্য হয়ে উত্তরাঞ্চলে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে। রাজশাহী জেলায় ৭২তম পদাতিক ব্রিগেডের সৈনিকদের সঙ্গে বামপন্থী সশস্ত্র যুবকদের কয়েকটি সংঘর্ষ হয় এবং উভয় পক্ষেই বেশ কিছু হতাহত হয়। চুয়াত্তর সালের শেষ দিকে একদিন জেনারেল জিয়া বললেন, 'চলো উত্তরবঙ্গে যাই, ওখানে কী ঘটছে, দেখে আসি।'

পরদিন বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারযোগে জিয়া ও আমি সৈয়দপুর বিমানবন্দরে অবতরণ করি। ৭২তম ব্রিগেড কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম এবং ব্রিগেড মেজর আশরাফ জিয়াকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। জিপে চড়ে জিয়া রাজশাহী জেলার কয়েকটি থানায় মোতায়েন সেনা ইউনিটগুলো পরিদর্শন করেন। শাফায়াত সেনা অভিযান সম্পর্কে জিয়াকে বিস্তারিতভাবে ধারণা দিলেন। বামপন্থী সশস্ত্র যুবকদের অধিকাংশই ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধা। তারা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন জোতদারকে হত্যা করেছে এবং তাদের মালিকানাধীন জমি দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। উত্তরাঞ্চলের আতঙ্কিত সংসদ সদস্যরা এলাকা ছেড়ে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছেন। সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে বেশ কিছু বামপন্থী নিহত ও বন্দী হয়েছে। অস্ত্রধারী বামপন্থী বাহিনীর নেতা ওয়াহিদুর রহমান এবং পলিটিক্যাল কমিশার আলমগীর কবির। ওয়াহিদুরের স্ত্রী লতাও একটি গেরিলা গ্রুপের কমান্ডার, প্রতি রাতে সাত-আট মাইল পায়ে হেঁটে অবস্থান পরিবর্তন করেন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেনাসদস্যরা তাঁকে এবং আলমগীর কবিরকে গ্রেপ্তার করে।

আমরা রাত কাটানোর জন্য আশ্রয় নিলাম তানোর থানার ডাকবাংলোয়। এক বিশাল বিলের মধ্যে বটগাছের নিচে এই ডাকবাংলো, অতি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় ইমারত। জনবিরল এলাকা, গভীর রাতে কেবল শিয়াল আর ঝিঁঝি পোকার ডাক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। নিজ কামরায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম, এমন সময় জিয়া তাঁর কামরায় ডেকে পাঠালেন। এলাকায় বিদ্যুৎ আসেনি। কামরায় হারিকেন জ্বালিয়ে বসে আছেন জিয়া, শাফায়াত ও আশরাফ। তাঁদের সামনে টেবিলের ওপর একগাদা কাগজ স্তূপীকৃত। এসব চিঠিপত্র বন্দী ও মৃতদের কাছ

থেকে পাওয়া গেছে। জিয়া বাংলা পড়তে ও লিখতে পারতেন না। আমাকে বললেন কয়েকটি চিঠি পড়ে শোনাতে। আমি পড়তে লাগলাম। একটি-দুটি করে চিঠিগুলো পড়তে পড়তে আমার সামনে এক অচেনা, নতুন জগতের দ্বার উন্মোচিত হলো। অদ্ভুত সব চিঠি। যেমন সেগুলোর ভাষার মাধুর্য, তেমনি সমাজব্যবস্থার ক্ষুরধার বিশ্লেষণ। বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে একদল যুবক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, সে জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার পণ করে তারা বিপৎসংকুল পথে প বাড়িয়েছে। সুললিত, আলংকারিক ভাষায় তারা বন্ধুদের আহ্বান জানাচ্ছে সে কঠিন সংগ্রামের পথে সঙ্গী হওয়ার জন্য। দু-একটি প্রেমপত্রও পড়লাম। প্রেমিক মৃত্যুর পূর্বক্ষণে প্রেমিকাকে চিঠি লিখে জানাচ্ছে, এ নির্মম পৃথিবীতে তাদের মিলন সম্ভব হবে না। কারণ, তারা তাদের নশ্বর জীবন উৎসর্গ করেছে বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য। তাদের আশা পরপারে তাদের মিলন হবে।

চিঠিগুলো পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। এরা কারা? বাংলাদেশে এমন সব তরুণ-যুবক কোথা থেকে এল, যারা মূল্যবান জীবন হেলায় উৎসর্গ করেছে দরিদ্র ভাগ্যহীন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য! চিঠি পড়তে পড়তে সকাল হয়ে এল। রুমে ফিরে কিছুক্ষণ ঘুমানোর বৃথা চেষ্টা করলাম। কেবল মনে পড়ছে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, সমাজসচেতন, রোমান্টিক সেই যুবক-যুবতীদের কথা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে কতভাবেই না অনুপ্রাণিত করেছে।

সকাল আটটায় ডাকবাংলোর সামনে একচিলতে মাঠে কাঠের টেবিল-চেয়ার পেতে প্রাতরাশের আয়োজন করা হয়েছে। জিয়া, শাফায়াত ও আমি পাশাপাশি বসে সৈনিকদের চিরাচরিত নাশতা চা ও পুরি খেতে খেতে টুকটাক আলাপ করছি। হঠাৎ জিয়া বললেন, 'শাফায়াত, আমি বন্দীদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। ওদের একজনকে নিয়ে আসো।'

'রাইট স্যার,' শাফায়াতের জবাব।

প্রায় ১০০ গজ দূরে একটি বৃহৎ বাঙ্কারে বেশ কয়েকজন বন্দী যুবককে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। সঙ্গীদের অবস্থান জানার জন্য তাদের মারধরও করা হয়েছে। এদের একজনকে আমাদের টেবিলের সামনে নিয়ে আসা হলো। শাফায়াত জানালেন, যুবকটি মেধাবী ছাত্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় বর্ষ অনার্স ক্লাসে পড়ছে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বোর্ডে ২য় স্থান অধিকার করেছিল। ছেলেটির হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। চেহারায় কোনো উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই, যেন কিছুই হয়নি।

'আপনি কী করেন?' জিয়ার প্রশ্ন।

'পার্টি করি।' যুবক বলল।

'আচ্ছা, আপনারা এসব কেন করছেন, কী চান আপনারা?' জিয়া বললেন।

উত্তরে যুবকটি তিন মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেয়, যার মূল কথা কেন তারা সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে চায় এবং কীভাবে সেটি সম্ভব। তার বক্তব্য শুনে আমরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছিলাম। এত অল্প বয়সী এক যুবক এত চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় এমন মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিয়েছে দেখে আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হলাম। তার ব্যক্তিত্ব এতই আকর্ষণীয় যে জিয়া বলে ফেললেন, 'Shafaat, would, you mind if I ask him to sit down?'

'Sure, Sir' শাফায়াতের উত্তর।

একটি চেয়ার এনে যুবকটিকে বসতে দেওয়া হলো।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। আমরা কেউই স্বস্তিবোধ করছি না তার সামনে।

'আপনি এক কাপ চা খাবেন?' জিয়া অফার করেন।

'না, আপনারাই খান।' যুবক সটান দাঁড়িয়ে ঘৃণামিশ্রিত স্বরে জানাল।

তাকে আবার বাঙ্কারে ফিরিয়ে নেওয়া হলো।

'নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে, Feeling very small.' জিয়া স্বগতোক্তি করলেন আমাদের দিকে তাকিয়ে। শাফায়াতকে বললেন, 'এর সঙ্গে সাধারণ সৈনিকেরা যেন কথাবার্তা না বলে। সে যে কাউকে মোটিভেট করে ফেলবে।'

সকাল ১০টায় ঢাকায় ফিরে আসার জন্য আমরা হেলিকপ্টারে উঠলাম। পথিমধ্যে রাজশাহীতে যাত্রাবিরতি হলো মন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে তুলে নেওয়ার জন্য। জিয়া, শাফায়াত ও আমি সার্কিট হাউসে গেলাম কামারুজ্জামান সাহেবকে নিয়ে আসার জন্য। প্রথমবারের মতো তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। অত্যন্ত হাসিখুশি, প্রাণবন্ত মানুষ। ভুলু নামক একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বগলদাবা করে তিনি সার্কিট হাউসের করিডর দিয়ে আসছিলেন। তাঁর প্রবল আসক্তি পান খাওয়ার প্রতি, একজন পিয়ন পানের পিক ফেলার পাত্র হাতে নিয়ে তাঁর পেছন পেছন হাঁটছিল। আমাদের সামনে এসে তিনি বগলদাবা ভুলুর সঙ্গে জিয়াকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'জেনারেল সাহেব, এই ভুলু একজন দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা। একে সেনাবাহিনীর কমিশন্ড র‍্যাঙ্কে ভর্তি করে নেন।'

'রাইট স্যার।' জিয়া সম্মতি জানালেন।

পাশে দণ্ডায়মান কর্নেল শায়ায়াত বলে বসলেন, 'স্যার, বললেই কি কাউকে আর্মিতে নেওয়া যায় নাকি? তাকে তো আইএসএসবিতে কোয়ালিফাই করতে হবে।' মন্ত্রী মহোদয় এবং জিয়া দুজনেই একটু বিব্রত হলেন।

জিয়া পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বললেন, 'আমরা ব্যাপারটি দেখব, স্যার, সামথিং ক্যান বি ডান।' কামারুজ্জামান একটু হেসে শাফায়াতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়েস, সামথিং ক্যান বি ডান।'

হেলিপ্যাডের উদ্দেশ্যে গাড়িতে যাওয়ার সময় জিয়া বললেন, 'শাফায়াত, তুমি মন্ত্রীর সামনে আইএসএসবির কথা বলতে গেলে কেন? উনি কি সত্যি সত্যি ভুলুকে আর্মিতে নেওয়ার কথা বলেছেন নাকি। এটা তো ওকে খুশি করার জন্য বলা। পলিটিশিয়ানরা এ রকম বলেই থাকেন।'

শাফায়াত স্পষ্টবাদী টাইপের মানুষ। তা ছাড়া উত্তরবঙ্গে নকশাল দমন করে আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁকে খুবই পছন্দ করেন। তিনি বললেন, 'স্যার, পলিটিশিয়ানদের বেশি পাত্তা দিলে এরা মাথায় উঠবে।' জিয়া আর কথা বাড়ালেন না।

চপার উড়ে চলেছে ঢাকার উদ্দেশে। কেবলই মনে পড়ছে তানোরে দেখা গেরিলাবাহিনীর সদস্যদের কথা। এত সাহসী, তেজস্বী যুবকের দল কীভাবে সৃষ্টি হলো বাংলাদেশে। মুক্তিযুদ্ধই দেশের যুবসমাজের মন-মানসিকতায় এ ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের এক অংশের জনসম্পৃক্ততাই তাদের সমাজ পরিবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। সদ্য স্বাধীন দেশে তাদের কর্মপন্থা হয়তো অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়; কিন্তু বঞ্চিত, হতদরিদ্র মানুষের প্রতি তাদের দরদ অনস্বীকার্য। মোটকথা বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা হলো এদের সংস্পর্শে এসে।

এক সন্ধ্যায় মেজর ডালিমের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীতে তোলপাড় সৃষ্টি হলো। ইস্কাটন লেডিস ক্লাবে ডালিমের এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। তাঁর বিদেশ-প্রত্যাগত লম্বা চুলধারী শ্যালক অনুষ্ঠান উপভোগ করছিল। ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফার পুত্র ডালিমের শ্যালকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে ডালিম শ্যালকের পক্ষ নিয়ে গাজীপুত্রকে চড় মারেন। পুত্রের নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে গাজী সাহেব একটি মাইক্রোবাসে দলবল নিয়ে এসে ডালিমকে চুল ধরে মাইক্রোবাসে তুলে নেন। ডালিমের স্ত্রী নিম্মি স্বামীকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলে তাঁকেও জোর করে গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়। ডালিমের শাশুড়ি বঙ্গবন্ধু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এ সুবাদে ডালিমেরও ৩২ নম্বরে যাতায়াত ছিল। গাজী একপর্যায়ে বিষয়টি মীমাংসার জন্য সস্ত্রীক ডালিমকে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যান। ইতিমধ্যে ডালিমকে অপহরণ করা হয়েছে মর্মে খবর পেয়ে সেনানিবাসে মিলিটারি পুলিশের অফিসার কমান্ডিং মেজর আমিনুল ইসলাম গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়িতে নিয়ে ডালিমকে উদ্ধারের জন্য তল্লাশি চালান।

৩২ নম্বরে গিয়ে ক্রন্দনরত ডালিমের স্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে গাজীর বিরুদ্ধে নালিশ জানান। প্রধানমন্ত্রী উভয়কে সান্ত্বনা দেন এবং বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

পরদিন সকালে ডালিম সেনা হেডকোয়ার্টারে এসে অফিসারদের কাছে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর প্রতি আগের রাতের দুর্ব্যবহারের বর্ণনা দিলে সব অফিসার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা এর প্রতিকারের জন্য দলবদ্ধভাবে সিনিয়র অফিসারদের কাছে ধরনা দেন। ডালিম জনা দশেক মেজর পদবির অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল কর্নেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ঘরে ঢুকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দুর্বৃত্তদের দুর্ব্যবহারের ঘটনা বর্ণনা করেন। এরশাদ উত্তেজিত স্বরে বলেন, 'This is too much. আমি চিফকে বলেছি আপনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে শক্ত প্রতিবাদ জানান। আমরা এনশিওর করব যে আপনাকে (চিফকে) সরিয়ে দিলে কোনো সেকেন্ড লেফটেন্যান্টও চিফের চেয়ারে বসবে না। ক্ষুব্ধ অফিসাররা এরশাদকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তাঁদের ডিসিএএস এবং সিএএসের অফিসরুমে নিয়ে যান।

এরশাদ ক্ষুব্ধ অফিসারদের নিয়ে ডিসিএএস জিয়ার রুমে প্রবেশ করেন। আমিও পেছন পেছন গেলাম। ডালিম গত রাতের ঘটনা জিয়ার কাছে বর্ণনা করেন। জিয়া খুবই বিরক্ত, তাঁর সামনে উপবিষ্ট ব্রিগেডিয়ার এরশাদকে বললেন, 'এতে হইচই করার কী আছে। আপনি নিজে শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজি, অথচ আপনিই তো শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন। Go back to your place of work.'

এরশাদ ও অফিসাররা হতোদ্যম হয়ে যাঁর যাঁর অফিসে ফিরে গেলেন। বিমর্ষ ডালিমও সেনা সদর ত্যাগ করেন। ঘটনাটি সব সেনানিবাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং অফিসারদের মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ ডালিমের পক্ষ অবলম্বন করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিকার দাবি করেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কয়েক দিন পর মেজর ডালিম.ও তাঁর বন্ধু মেজর নূর চৌধুরীকে সামরিক বাহিনী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। দেশের প্রধান বিরোধী দলসমূহ সরকারের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন ও দুর্নীতির অভিযোগ তোলে এবং জনগণের এক বিরাট অংশকে প্রভাবিত করে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে ২০ হাজার প্রতিবাদী রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যার অভিযোগ ওঠে। টিসিবি ভারত থেকে নিম্নমানের কাপড় এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করে। ধীরে ধীরে জনমনে ভারতবিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে। রক্ষীবাহিনী ব্যবহার করেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

আনা সম্ভব হয়নি। কুষ্টিয়ায় ঈদের জামাতে আওয়ামী লীগের একজন সংসদ সদস্যকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে চরমপন্থীরা।

দেশে বিদ্যমান এহেন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু এক গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত নিলেন। দেশের সংবিধানে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে চারটি মূলনীতির অন্যতম সমাজতন্ত্রকে বাস্তব রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একদলীয় শাসনব্যবস্থা 'বাকশাল' প্রবর্তন করা হলো। ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ তারিখে জাতীয় সংসদে মাত্র ১৪ মিনিট আলোচনার পর সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হলো, যা বাংলাদেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করে। মূলত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) ছাড়া সব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হলো। ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিমালিকানা স্থগিত করে সব কৃষিজমি সমবায় সমিতির মালিকানায় এনে রাশিয়ান মডেলের কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হলো। সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তাদের বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদ দেওয়া হলো। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধানদেরও রাজনৈতিক দল বাকশালের সদস্য করা হলো। প্রধানত মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সমর্থন ও সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করেন। ঘোষণা করা হয় জাতীয় সংসদের সদস্য পদ রাখতে হলে সব সদস্যকে বাকশালে যোগ দিতে হবে। জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন এবং দল থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁরা জাতীয় সংসদের সদস্য পদ থেকেও ইস্তফা দেন। ২৫ জানুয়ারি সংসদ সদস্যরা নিজেরাই ১ম জাতীয় সংসদের মেয়াদ দুই বছর বাড়িয়ে নেন। বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রপতির অধীন করা হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির কার্যকালের কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়নি।

দেশকে ৬০টি জেলায় বিভক্ত করে প্রতি জেলায় একজন গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হলো। জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জেলা গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত করা হলো। গভর্নরদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগের নেতা। এ ছাড়া তিনজন সাবেক সিএসপি অফিসার এবং সেনাবাহিনীর কর্নেল আনোয়ার উল্লাহকেও গভর্নর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা, আইনকানুন ও বেসামরিক প্রশাসনসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গভর্নরদের ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হলো।

বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় ধস নামে। বিরোধী রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে প্রকাশ্যে কারও পক্ষে একদলীয়

শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না। আতাউর রহমান খান ও হাজি দানেশের মতো সিনিয়র রাজনৈতিক নেতারাও বাকশালে যোগ দেন। সরকার সমর্থক চারটি সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য পত্রিকা নিষিদ্ধ করার ফলে বহু সাংবাদিক চাকরি হারান। তাঁদের জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে।

সেনাবাহিনীর চাকরিকে আমি প্রথম থেকেই সিরিয়াসলি নিয়েছি। একজন দক্ষ পেশাদার কর্মকর্তারূপে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সব সচেষ্ট ছিলাম। ডেপুটি চিফের একান্ত সচিব পদটি লোভনীয়। এর বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। কিন্তু পেশাগতভাবে এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ পদ নয়। পেশাগত ক্যারিয়ার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মেজর র‍্যাঙ্কের অফিসারের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ (অ্যাপয়েন্টমেন্ট) ব্রিগেড মেজর। দেড় বছর একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালনের পর একদিন জেনারেল জিয়াকে বললাম, 'স্যার, আমি প্রফেশনে আরও মনোযোগ দিতে চাই। স্টাফ কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষার আগে আমি সেনা সদরের বাইরে কোনো ফরমেশনে স্টাফ জব করার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই।'

জিয়া একটু অবাক হলেন। তিনি আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। এক বছর একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করার পর তিনি ১৯৭৪ সালে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (এসিআর) আমার ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং আউট স্ট্যান্ডিং গ্রেড প্রদান করেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'এ অফিসারকে (আমাকে) সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব পালনের জন্য এখন থেকে গ্রুম করা উচিত।' আমি এ মন্তব্য পড়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। এমএস ব্রাঞ্চের একজন অফিসার পরবর্তীকালে আমাকে বলেন যে এ ধরনের প্রশংসা পাওয়া মেজর র‍্যাঙ্কের অফিসারদের জন্য বিরল ঘটনা। জিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন এবং বিএম হিসেবে সেনা সদরে পদায়নের জন্য মিলিটারি সেক্রেটারি লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাসিমকে নির্দেশ দিলেন। জিয়া সেনা সদরে তখন কিছুটা কোণঠাসা অবস্থায় ছিলেন। সে কারণে তাঁর নির্দেশনা তেমন গুরুত্ব পায়নি। আমাকে '৭৫-এর জানুয়ারিতে মিলিটারি ট্রেনিং ডাইরেক্টরে জিএসও-২ পদে পদায়ন করা হলো।

১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আকারে ক্ষুদ্র ছিল, মাত্র পাঁচটি পদাতিক ব্রিগেড নিয়ে গঠিত। ব্রিগেডগুলোর অবস্থান এ রকম : ঢাকায় ৪৬তম ব্রিগেড, কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম। চট্টগ্রামে ৬৫তম ব্রিগেড, কমান্ডার কর্নেল কাজী গোলাম দস্তগীর। যশোরে ৫৫তম ব্রিগেড, কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী বীর উত্তম। কুমিল্লায় ৪৪তম ব্রিগেড, কমান্ডার কর্নেল আমজাদ খান। সৈয়দপুরে ৭২তম ব্রিগেড, কমান্ডার কর্নেল নজমুল হুদা বীর বিক্রম। সেনাবাহিনীর উন্নয়ন তৎকালে সরকারের

কাছে অগ্রাধিকার পায়নি, সরকারের আর্থিক সক্ষমতাও ছিল সীমিত। পাকিস্তানি আমলের মার্শাল লয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে আওয়ামী সরকারেরও এ বিষয়ে তেমন উৎসাহ ছিল না। সৈনিকদের একটি বড় অংশের কম্বল, বুট, ইউনিফর্ম ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জামের অভাব ছিল। অপর দিকে রক্ষীবাহিনী ছিল আর্মস ও ইকুইপমেন্টে অধিকতর সজ্জিত, তাদের যানবাহনও ছিল আধুনিক। এদের সাজসরঞ্জাম ও গর্বিত চলাফেরা সেনাসদস্যদের মর্মবেদনা ও ঈর্ষার কারণ ছিল।

সদ্য স্বাধীন দেশে আওয়ামী লীগেরও রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। পাকিস্তানের ২৪ বছর পাঞ্জাবিরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। বাঙালিরা শাসনক্ষমতার বাইরে ছিল। ১৯৭৩ সালে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানে সেনাবাহিনী সব সময়ই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় ছিল, সেনা কর্মকর্তারা বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অন্য চাকরিজীবীদের তুলনায় ভালো অবস্থানে ছিলেন। কিন্তু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির কারণে সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়।

১৯৭৫-এর আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় অবস্থিত ৪৬তম ব্রিগেডের বিএমরূপে আমার পোস্টিং হয় এবং ৭ আগস্ট আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করি। মেজর র‍্যাঙ্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। ২৫ মার্চের গণহত্যার প্রতিবাদে তিনি ২৭ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থানকালে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিক ও অফিসারদের নেতৃত্ব দিয়ে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির হায়াত ও দুজন পাঞ্জাবি অফিসারকে বন্দী করে তাঁদের নিরাপত্তা বিধান করেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনিই একমাত্র ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, যিনি সম্মুখসমরে অংশগ্রহণ করেন। সৈনিকদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য কোম্পানি অ্যাকশনেও নেতৃত্ব দিয়ে সাহসিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, সৎ ও সৈনিকসুলভ গুণাবলির অধিকারী।

৪৬তম ব্রিগেডের অধীন ইউনিটসমূহ :

১ম ইস্ট বেঙ্গল, সিও মেজর মতিয়ুর রহমান বীর প্রতীক

২য় ইস্ট বেঙ্গল, সিও মেজর আজিজুর রহমান, বীর উত্তম

৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, সিও মেজর এ জে এম আমিনুল হক বীর উত্তম

১৬ ইস্ট বেঙ্গল, সিও মেজর খালিকুজ্জামান

২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট, সিও মেজর আবদুর রশিদ

১৬ ইস্ট বেঙ্গল জয়দেবপুরে এবং অন্য ইউনিটসমূহ ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থান করছিল। ব্রিগেডের সঙ্গে কোনো গোয়েন্দা ইউনিট সংযুক্ত ছিল না। সেনাবাহিনীর একমাত্র ট্যাংক রেজিমেন্ট ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থান করছিল এবং সরাসরি সেনা সদর দপ্তরে চিফ অব জেনারেল স্টাফের অপারেশনাল কমান্ডে ছিল। এর কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর আবদুল মোমেন। অন্য অফিসার, জেসিও এবং সৈনিকেরা অধিকাংশই পাকিস্তান-ফেরত, যাদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্ভবপর হয়নি। সাঁজোয়া বাহিনীর একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা অফিসার মেজর নাসির উদ্দিন পঁচাত্তরে সেনা সদর দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের সহ-অধিনায়ক মেজর ফারুক রহমান একাত্তরের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে আবুধাবি থেকে পালিয়ে এসে কলকাতায় মুক্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে (নির্ধারিত তারিখের দুই দিন পর) যোগদানের কারণে তাঁকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গণ্য করা হয়নি এবং দুই বছরের সিনিয়রিটিও প্রদান করা হয়নি। এ কারণে ফারুক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ১৯৭২ সালে দুই বছর সিনিয়রিটি লাভের জন্য সেনা সদরে আবেদন করেন এবং পাকিস্তান সরকারের পক্ষত্যাগের প্রমাণস্বরূপ একটি এয়ার টিকিট জমা দেন। এয়ার টিকিটে আবুধাবি থেকে টেক অফ করা ফ্লাইটের তারিখে ঘষামাজা, অর্থাৎ ওভার রাইটিং থাকার কারণে জালিয়াতি করা হয়েছে সন্দেহে এটি সেনা সদরে গৃহীত হয়নি এবং ফারুকের সিনিয়রিটিপ্রাপ্তির আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়। জ্যেষ্ঠতা না পেয়ে ফারুক অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন।

২য় ফিল্ড রেজিমেন্টে সিও মেজর রশিদ শেষ পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। অন্য অফিসার ও সৈনিকেরা অধিকাংশই পাকিস্তান-ফেরত ছিলেন। ৪৬তম ব্রিগেডের অফিসার ও সৈনিকদের অধিকাংশেরই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে এটি অত্যন্ত দক্ষ ও কার্যকর ফরমেশনরূপে বিবেচিত হতো। রাজধানী শহরে অবস্থানের কারণে এর গুরুত্ব অন্যান্য ফরমেশনের চেয়ে বেশি ছিল এবং সেনা অফিসাররা এখানে চাকরি করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

রক্তাক্ত পঁচাত্তর

সপরিবারে নৃশংসভাবে খুন হলেন বঙ্গবন্ধু

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শুক্রবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সকাল পৌনে ছয়টা বাজে। দরজার কলবেলের একটানা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ড্রয়িংরুমের দরজা খুলে দেখি ২য় ফিল্ডের সিও মেজর রশিদ এবং সেনা সদরের একজন স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমীন আহম্মেদ চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন। আমীন সিভিল ড্রেসে কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত, বিমর্ষ। শান্ত-নিরুত্তাপ গলায় রশিদ বললেন, 'উই হ্যাভ ডান ইট। শেখ মুজিব হ্যাজ বিন কিলড।' সদ্য ঘুম থেকে উঠে এ ধরনের ভয়াবহ সংবাদ শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমীনের দিকে তাকালাম। এঁরা দুজন বন্ধু, পিএমের কোর্সমেট এবং আমার সিনিয়র। আমীন নিশ্চুপ রইলেন। বাইরে তাকিয়ে দেখি এক গাড়ি ভর্তি আর্টিলারি সৈনিক রশিদের সঙ্গেই আমার বাসার গেট খুলে প্রবেশ করেছে। ড্রয়িংরুমের বাইরেই তারা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। রশিদ আদেশের সুরে বললেন, 'আমি কমান্ডারের (কর্নেল শাফায়াত) কাছে যাচ্ছি। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।' ইতিমধ্যে রাইফেলধারী দুজন সৈনিক আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আমার ড্রয়িংরুমে ঢোকে। রশিদের নির্দেশ পেলেই তারা আমাকে গুলি করবে কিংবা বন্দী করবে, এমনটি মনে হলো। রশিদের কথা শুনে আমি হতভম্ব, বলে কী! প্রেসিডেন্টকে হত্যা করে এমনভাবে বলছে, যেন কিছুই হয়নি। আমি একটু সময় নিয়ে ধাতস্থ হওয়ার জন্য বললাম, 'ঠিক আছে, আমি ইউনিফর্ম পরে আসছি।'

দ্রুত ইউনিফর্ম পরে নিলাম। ভাবলাম এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমার প্রথম কাজ ব্রিগেড কমান্ডারকে ঘটনা সম্পর্কে জানানো। সুতরাং তাঁর কাছেই

যাব। রশিদের প্রস্তাবে রাজি না হলে এরা যেকোনো অঘটন ঘটাতে পারে। আমি একেবারেই নিরস্ত্র, বাসায় কোনো গার্ডও নেই। স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে। তাকেও জানালাম না।

আমার বাসা সেনানিবাসের মেইন রোডের পাশেই। রাস্তার উল্টো দিকেই ডেপুটি চিফ জেনারেল জিয়ার বাসা। জিয়ার বাসার পেছনের রাস্তার ওপারেই ৫০ গজ দূরে কমান্ডার কর্নেল শাফায়াতের বাসা। রশিদের কথামতো বাসা থেকে বেরিয়ে আমি ও আমীন আহম্মেদ তাঁর জিপে উঠলাম। গাড়িভর্তি সৈনিকেরাও আমাদের ফলো করে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ব্রিগেড কমান্ডারের বাসায় পৌছে গেলাম। রাস্তায় কোনো জনপ্রাণী নেই, সবাই তখনো সুখনিদ্রায় বিভোর। কমান্ডারের বাসায়ও ২য় ফিল্ডের সৈনিকেরা গার্ড ডিউটি করছে। আমি কলবেল বাজাতেই ব্যাটম্যান দরজা খুলে দিল। আমরা ড্রয়িংরুমে সোফায় বসলাম। মিনিট দুয়েকের মধ্যে লুঙ্গি-শার্ট পরা কর্নেল শাফায়াত ড্রয়িংরুমে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'স্যার, উই হ্যাভ কিলড প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব। আমাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অ্যাকশনে যাবেন না। গেলে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে।' বলেই কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে রশিদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শাফায়াতও হতভম্ব। আমাকে ও আমীনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রশিদ এসব কী বলছে?' এমন সময় তাঁর বেডরুমে রেড ফোন বেজে ওঠে। তিনি ফোন ধরতে গেলেন। মিনিট দুয়েক পর ফিরে এসে আমাকে বললেন, 'চিফ (জেনারেল সফিউল্লাহ) ফোন করেছেন। তিনি জানতে চাচ্ছেন কিছুক্ষণ আগে ৩২ নম্বরে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে কারা হামলা করেছে। প্রেসিডেন্ট তাঁকে ফোর্স পাঠিয়ে উদ্ধার করতে বলেছেন। আমি কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'চিফ কোনো নির্দেশ দিয়েছেন?'

'না, উনি শুধু কাঁদছেন আর বলছেন, প্রেসিডেন্ট তাঁকে বিশ্বাস করলেন না।' শাফায়াত বললেন।

'স্যার, ইউনিফর্ম পরে আসুন, তাড়াতাড়ি অফিসে যাওয়া দরকার।' আমি বললাম।

'ওকে।' বললেন শাফায়াত।

কয়েক মিনিট পরই আমি ও কমান্ডার বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। আমীন গেলেন তাঁর অফিসার মেসে। এত ভোরে কারও গাড়ি আসেনি। তাই পায়ে হেঁটে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। রাস্তার মোড়েই জেনারেল জিয়ার শহীদ মইনুল রোডের বাসার পূর্ব পাশের দেয়াল। শাফায়াত বলে উঠলেন, 'চলো, জেনারেল জিয়ার বাসায় যাই, ঘটনাটি তাঁকে জানাই।'

আমরা দুজন দ্রুত হেঁটে জিয়ার বাসায় গেলাম। সেখানে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকেরা গার্ড ডিউটি করছে, সবাই আমার পরিচিত। তারা গেট খুলে দিলে বাসার ভেতরে ঢুকি।

কলবেল টিপলে জিয়া নিজেই দরজা খুলে দিলেন। তাঁর পরনে সাদা পাজামা, সাদা হাফ হাতা গেঞ্জি। শেভ করছিলেন, মুখে সাদা শেভিং ক্রিম, কাঁধে তোয়ালে। আমাদের দেখে বললেন, 'হোয়াট হ্যাপেন্ড?'

'স্যার, প্রেসিডেন্ট হ্যাজ বিন কিলড। একটু আগে মেজর রশিদ এসে আমাকে জানিয়ে গেল।' শাফায়াত বললেন।

'সো হোয়াট? প্রেসিডেন্ট হ্যাজ বিন কিলড, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ দেয়ার। উই উইল আপহোল্ড দ্য কনস্টিটিউশন। (আমরা সংবিধান মেনে চলব) গো অ্যান্ড গেট ইউর ট্রুপস রেডি।' জিয়ার মন্তব্য। আমরা গেট দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় জিয়াকে নেওয়ার জন্য একটি জিপ বাসায় ঢুকছিল। আমরা ড্রাইভারকে বললাম আমাদের অফিসে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ড্রাইভার রাজি হয়ে গাড়ি ঘোরাল আমাদের তুলে নেওয়ার জন্য।

জিপে উঠে আমি কমান্ডারকে পরামর্শ দিলাম অরক্ষিত ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে না গিয়ে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকদের সঙ্গে থাকাই আমাদের জন্য শ্রেয়। আমার বিবেচনায় এই ইউনিট আমাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। কমান্ডার রাজি হলেন। আমরা বিগ্রেড হেডকোয়ার্টারের ২০০ গজ দূরে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের অফিস এলাকায় ঢুকে জিয়ার গাড়িটি ছেড়ে দিই। আসার পথে প্রধান সড়কে দেখা হলো আমার স্ত্রীর বড় ভাই মেজর ইকবালের সঙ্গে। তিনি ব্যক্তিগত ভক্সওয়াগন গাড়ি চালিয়ে আমার বাসার দিকে আসছিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গী হলেন। ইকবাল ১ম ইস্ট বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানির কমান্ডার।

১ম ইস্ট বেঙ্গলে যাওয়ার জন্য মেইন রোড থেকে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে এয়ারফোর্স হ্যাঙ্গারের সামনে আসতেই দেখতে পেলাম একটি ট্যাংক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্যাংকের টারেটে বসে আছেন মেজর ফারুক রহমান, ১ম ইস্ট বেঙ্গল ল্যান্সারের উপ-অধিনায়ক (2IC)। পরনে কালো ইউনিফর্ম, মাথায় কালো হেড গিয়ার। ট্যাংকের মেইনগানের মুখ প্রধান সড়কের দিকে। ৪৬তম ব্রিগেডের ঢাকায় অবস্থিত ৩টি পদাতিক ব্যাটালিয়নের দুটি ১ম ইস্ট বেঙ্গল ও ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল পাশাপাশি রয়েছে। এদের বিভক্ত করেছে একটি ২০ ফুট প্রশস্ত পাকা সড়ক। ১ম ইস্ট বেঙ্গলে প্রবেশ করার সময় লক্ষ করলাম, এ সড়কের ওপরও একটি ট্যাংক অবস্থান নিয়েছে। আমাদের দুটি ব্যাটালিয়নের মাঝামাঝি ট্যাংকের আক্রমণাত্মক অবস্থান দেখে বিস্মিত হলাম, এদের মতলবটা কী?

মিনিট দশেকের মধ্যে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সব অফিসার সিওর অফিসে সমবেত হলেন। সবার চোখেমুখে উত্তেজনা। একজন বললেন, তিনি সৈনিক ব্যারাকের পাশ দিয়ে হেঁটে আসার সময় রেডিওতে মেজর ডালিমের ঘোষণা শুনেছেন, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে এবং দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন, 'সৈনিকদের রিঅ্যাকশন কী?'

'তারা উল্লাসধ্বনি দিচ্ছে, আনন্দ প্রকাশ করছে,' অফিসারের সংক্ষিপ্ত জবাব।

কমান্ডারের নির্দেশ মোতাবেক আমি ৪৬ ব্রিগেডের সব ইউনিটকে স্ট্যান্ড টু (লোকাল ডিফেন্স এবং বাইরে মুভ করার প্রস্তুতি) অবস্থানে থাকার নির্দেশ জারি করি। অফিস কক্ষে তুমুল উত্তেজনা। মিনিটে মিনিটে টেলিফোন আসছে। কারও বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় এত বড় প্রলয়ংকরী ঘটনা। সিনিয়র অফিসাররা কেউ কিছু জানে না, দেশের প্রেসিডেন্ট নিহত! ব্রিগেড অফিসার মেসে আর্টিলারির কয়েকজন অফিসার বসবাস করেন। সবাই বলাবলি করছে, গত রাতে নাইট ট্রেনিং ছিল, ২য় ফিল্ডের অফিসাররা সকাল নাগাদ ফিরে আসেননি।

১ম ইস্ট বেঙ্গলের সিও মেজর মতিউর, কমান্ডার ও আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি। হঠাৎ কাচ ভাঙার শব্দ শুনলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি একজন লেফটেন্যান্ট সিওর অফিসের দেয়াল থেকে রাষ্ট্রপতি মুজিবের ছবি নামিয়ে সবার সামনেই আছাড় মেরে সশব্দে ভেঙে ফেলেছে। কাচের টুকরা বারান্দায়ও ছিটকে পড়ে! সবাই তাকিয়ে দেখছে, আশ্চর্য! কেউ তাকে কিছুই বললেন না!

এমন সময় অ্যাডজুট্যান্ট এসে কমান্ডারকে জানাল, সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ টেলিফোন ধরে আছেন, ব্রিগেড কমান্ডারকে চাইছেন। কমান্ডার সিওর অফিসে ঢুকে টেলিফোনে সিজিএসের সঙ্গে কথা বললেন, নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানালেন। বললেন, 'স্যার, ১ম বেঙ্গলে চলে আসুন।' মিনিট পনেরো পর সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ সিজিএস খালেদ ১ম বেঙ্গলে এসে সিওর রুমে ঢুকলেন। মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্সের কমান্ডার খালেদ, আর্টিলারি শেলের টুকরা তাঁর মাথায় আঘাত হেনেছিল। কপালে ক্ষতচিহ্ন তাঁর লম্বাটে মুখের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘকায়, সুঠামদেহী, সুদর্শন অফিসার। আসামাত্র সবাই তাঁকে ঘিরে ধরে। একই জিজ্ঞাসা, হচ্ছেটা কী? What is happening? খালেদ জানালেন, ২য় ফিল্ড আর্টিলারি এবং ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের সৈনিকেরা গান ও ট্যাংক নিয়ে শহরে মুভ করেছে গত রাতে এবং সূর্যোদয়ের কিছু আগে ৩২ নম্বরে গিয়ে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করেছে!

কর্নেল শাফায়াত সিজিএসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ট্যাংক রেজিমেন্ট তো আপনার অধীনে, আমার ইউনিট এলাকায় ট্যাংক পজিশন নিয়েছে কেন?'

'তারা আমার নির্দেশ ছাড়াই মুভ করেছে, they are rebels.' খালেদ বললেন!

'এখন আমাদের করণীয় কী?' শাফায়াত বললেন।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে খালেদ বললেন, 'Let us bargain with them.'

এমন সময় চিফ মেজর জেনারেল সফিউল্লাহর টেলিফোন এল। খালেদ ধরলেন। চিফ সিজিএসকে সেনা সদরে ডেকে পাঠালেন। উপস্থিত সবার ধারণা, এ ধরনের ক্রাইসিস মুহূর্তে ব্রিগেডিয়ার খালেদই ত্বরিত সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম। শাফায়াত খালেদকে বললেন, 'আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আমার ব্রিগেড স্ট্যান্ড টু অবস্থায় রয়েছে। বলুন আমরা কী করব?'

'আমাকে যেতে দাও। আমি চিফের সঙ্গে কথা বলে আধা ঘণ্টার মধ্যেই এখানে ফিরে আসছি।' খালেদ বেরিয়ে গেলেন।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় আমরা অপেক্ষমাণ সেনা সদরের নির্দেশের। নয়টা বেজে গেল। কোনো নির্দেশ আসেনি ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের কাছে।

সকাল নয়টার একটু পরই ১ম বেঙ্গলে একটি বড় গাড়িবহর এসে উপস্থিত হলো। সর্বাগ্রে ফ্ল্যাগ কারে চিফ সফিউল্লাহ, তারপর নেভি চিফ রিয়ার অ্যাডমিরাল এম এইচ খান, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং শেষ প্রান্তে একটি এম-৩৮ হুডখোলা জিপে অবসরপ্রাপ্ত মেজর শরিফুল হক ডালিম। ডালিমের পরনে ইস্তিরিবিহীন পুরোনো ইউনিফর্ম, কাঁধে ঝোলানো ভারতে তৈরি নাইনএমএম স্টেন কারবাইন।

চিফ, ডেপুটি চিফ, নেভি চিফ ও এয়ার চিফ, ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত সিওর অফিসে ঢুকে মিনিট দশেক আলাপ করলেন। অন্যান্য অফিসার বাইরে বারান্দায়। চিফ ও অন্যরা বারান্দায় বেরিয়ে এলে সবাই জিজ্ঞেস করলেন, কী হচ্ছে? চিফ সংক্ষেপে জানালেন, 'রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। মেজর ডালিম সেনা সদরে আমার অফিসে এসেছে কিছুক্ষণ আগে। সে বলছে খন্দকার মোশতাক নাকি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি রেডিও স্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।' 'এখন কী করা যায়?' সবার দিকে তাকিয়ে বললেন সিএএস মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ।

বারান্দায় দণ্ডায়মান সাত-আটজন অফিসার, এমনকি নেভি চিফ বললেন, 'স্যার, আপনার যাওয়া উচিত। Please save the situation. Bring things under control.' মেজর ডালিম এগিয়ে এসে তীব্র স্বরে বলে ওঠে, 'স্যার, তাড়াতাড়ি করুন, প্রেসিডেন্ট ইজ ওয়েটিং।'

এরপর সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর চিফত্রয় গাড়িতে উঠে রেডিও স্টেশনের দিকে যাত্রা করলেন। মেজর জেনারেল জিয়া এতক্ষণ নীরবে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'স্যার, আপনি রেডিও স্টেশনে যাচ্ছেন না?'

'নাহ্, আমি আমার অফিসে যাচ্ছি।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন জিয়া।

আমি ও কমান্ডার শাফায়াত ১ম বেঙ্গলে বসে বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে টেলিফোনে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ করছি। সিএএস ১ম বেঙ্গলে থাকার সময়ই শাফায়াত তাঁকে জানালেন, ১৬ ইস্ট বেঙ্গলের সিও মেজর খালেকুজ্জামান ছুটিতে রয়েছেন। ক্রাইসিস পিরিয়ডে পল্টন পরিচালনা করার জন্য একজন নিয়মিত কমান্ডিং অফিসার প্রয়োজন। চিফ বললেন, 'কাকে চাও?' কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমীন আহম্মেদ চৌধুরীর নাম বললেন। চিফ সিও অফিসের ডেস্ক ক্যালেন্ডারের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আমীন আহম্মেদ চৌধুরীকে ১৬ ইস্ট বেঙ্গলের সিওরূপে পোস্টিং দিলেন। আমীন সেটি হাতে নিয়ে জয়দেবপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন। '৭২ সালে তিনি এই ইউনিট কমান্ড করেছিলেন।

আমরা একটি রেডিও আনিয়ে সংবাদ বুলেটিন শুনছিলাম। একটু পরই শুনতে পেলাম খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানেরা নিজ নিজ বাহিনীর পক্ষ থেকে খন্দকার মোশতাকের প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন ব্যক্ত করেন। বিডিআর, পুলিশ প্রধান এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মেজর আবুল হাসানও নতুন রাষ্ট্রপতির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান এ সময় সরকারি কাজে বিদেশে ছিলেন।

বাহিনীপ্রধানদের আনুগত্য প্রকাশের পর প্রতিটি সেনানিবাসে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। মেজর ডালিমের রেডিও ঘোষণার কোনো প্রতিক্রিয়া কোনো সেনানিবাসে দেখা যায়নি। একমাত্র চট্টগ্রামে ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার কাজী গোলাম দস্তগীর চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশনে ফোন করে ডালিমের ঘোষণা প্রচার না করার নির্দেশ দেন। তবে নানা কারণে সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সদস্যরা আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁরা নির্দ্বিধায় এ পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন। এত বড় মাপের নেতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা দেশে আওয়ামী লীগ কিংবা কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়নি। রাজধানী এবং জেলা শহরের আওয়ামী লীগ নেতারা আতঙ্কিত হয়ে গা ঢাকা দেন।

বাহিনীপ্রধানদের রেডিও ঘোষণার পর কমান্ডার ও আমি ব্রিগেড

হেডকোয়ার্টারে চলে আসি। হেডকোয়ার্টারের অফিসার ইনচার্জ ব্রিগেড মেজর। আমি সকালেই টেলিফোনে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে সৈনিকদের লোকাল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলাম। একটু পরই সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ আমাদের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে এসে কমান্ডারের রুমে বসে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। আমরা অফিসে আসার পর থেকেই ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন ফরমেশন এবং ইউনিট থেকে অফিসাররা সর্বশেষ খবর জানার জন্য ৪৬ ব্রিগেড সদর দপ্তরে আসতে থাকেন।

মেজর ডালিম বেতারের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাকের পক্ষ থেকে সারা দেশে মার্শাল ল জারির ঘোষণা দেন। একসময় তিনি অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসারদের ৪৬তম ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করার নির্দেশ জারি করেন। দুপুরের আগেই জনা বিশেক অবসরপ্রাপ্ত হাজির, ক্যাপ্টেন ও মেজর। আওয়ামী লীগ শাসনামলে এঁদের বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছিল। অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকালে শাসকদলীয় কর্মীদের মারপিট করার কারণেই এঁদের অধিকাংশকে চাকরিচ্যুত করা হয়। রেডিও ঘোষণা শুনেই তাঁরা তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছেন চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য। হেয়ারকাট নেওয়ার সময় পাননি, ইউনিফর্মও ইস্তিরিবিহীন। একজনকে দেখলাম খাকি শার্টে মেজর র‍্যাঙ্কের শাপলা ফুল লাগানো, পরনে সাদা রঙের সিভিল প্যান্ট। বেল্ট ও ক্যাপ নেই, বিচিত্র সাজ। আমি তাঁদের চা পানে আপ্যায়িত করে জানালাম, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর রেখে যান, সেনা সদরের নির্দেশনা পেলেই জানানো হবে।

দুপুর ১২টার দিকে মেজর ফারুক বীরদর্পে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে পদার্পণ করেন। সমবেত অফিসাররা তাঁকে ঘিরে ধরে অভিনন্দন জানায়। ফারুকও বিষয়টি খুব উপভোগ করেন। কর্নেল শাফায়াত সকাল থেকেই মনমরা ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর অধীন ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করে হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করায় তিনি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু বাইরে কাউকে কিছু বুঝতে দেননি। তিনি ফারুককে তেমন পাত্তা দেননি। ফারুক অন্য অফিসারদের সঙ্গে মিনিট পনেরো কথাবার্তা বলে বিদায় নেন। ফারুক জানান যে মাত্র একটি ট্যাংক নিয়ে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরই তেজগাঁও এয়ারপোর্টের দেয়াল ভেঙে তিনি শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারের সামনের গেটে অবস্থান নেন। ট্যাংকের মেইনগানের কোনো গোলা ছিল না। ফারুক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেন, রক্ষীর জওয়ানেরা ইউনিফর্ম পর্যন্ত পরেনি, তারা অধিকাংশই লুঙ্গি-শার্ট পরিহিত ছিল। ফারুক তাদের জানান যে রাষ্ট্রপতিকে সেনাবাহিনী হত্যা করেছে। তারা যেন চুপচাপ থাকে। কোনো ধরনের প্রতিবাদী অ্যাকশনে

গেলে তাদের ট্যাংকের গোলা নিক্ষেপ করে উড়িয়ে দেওয়া হবে। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। ফারুক আবার বিমানবন্দর হয়ে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসেন।

ঢাকা সেনানিবাসের দুটি ইউনিট ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার এবং সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারি এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে। ল্যান্সারের সিও মেজর মোমেন তখন ছুটিতে ছিলেন এবং ফারুক অ্যাক্টিং সিওর দায়িত্ব পালন করছিলেন। রাত ১০টার দিকে নৈশকালীন ট্রেনিংয়ের ছদ্মাবরণে ল্যান্সার ও ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট ট্যাংক, কামানসহ কুর্মিটোলা নির্মীয়মাণ বিমানবন্দরের রানওয়েতে সমবেত হয়। এই দুটি ইউনিটে ফারুক এবং তাঁর ভায়রা রশিদ ছাড়া বাকি অফিসার ও সৈনিকদের অধিকাংশই পাকিস্তান-প্রত্যাগত ছিল। এদের সঙ্গে রানওয়েতে আরও যোগ দেন সেনা সদরে কর্মরত স্টাফ অফিসার মেজর বজলুল হুদা ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর ডালিম, শাহরিয়ার, নূর চৌধুরী, রাশেদ চৌধুরী প্রমুখ। এঁরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। রশিদ ও ফারুক সমবেত সৈনিকদের উদ্দেশে রাজনৈতিক বক্তব্য দেন এবং বলপ্রয়োগে ভারতপন্থী সরকারকে উৎখাতের সংকল্প ব্যক্ত করেন। সৈনিকেরাও অভিযানে অংশগ্রহণে তাদের সম্মতি জানায়। এরপর বিভিন্ন টার্গেট, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীর বাড়ি, রেডিও স্টেশন ইত্যাদিতে অপারেশন চালানোর জন্য অফিসার ও সৈনিকদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়।

মধ্যরাতের পরপরই ট্যাংকসমূহ, একটি আর্টিলারিগানসহ সেনাদল বিভিন্ন টার্গেটের উদ্দেশ্যে সেনানিবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডে রাষ্ট্রপতির বাড়িতে গার্ড ডিউটি করছিল কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে আসা ১ম ফিল্ড রেজিমেন্ট। মেজর ডালিম ও মেজর বজলুল হুদা এই রেজিমেন্টের সাবেক অফিসার এবং পাহারারত সৈনিকদের কাছে অতিপরিচিত মুখ। মেজর হুদা ও নূর চৌধুরী ল্যান্সার সৈনিকদের নেতৃত্ব দিয়ে রাষ্ট্রপতির বাসভবনে প্রবেশ করলে পাহারারত সৈনিকেরা তাঁদের কোনো বাধা দেয়নি। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ভেতর থেকে আক্রমণকারী সৈনিকদের প্রতি গুলিবর্ষণ করা হলে ১ম ফিল্ডের একজন সৈনিক নিহত হয়। কিন্তু তাদের প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। আক্রমণকারী সৈনিকেরা সহজেই বাড়িতে ঢুকে রাষ্ট্রপতিকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করে।

ফারুক চলে যাওয়ার পর হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রপতি ছাড়াও তাঁর স্ত্রী, শিশু রাসেলসহ তিন পুত্র, দুই পুত্রবধূ, ভাই শেখ নাসের ৩২ নম্বরে নিহত হন। রাষ্ট্রপতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আবদুর রব সেরনিয়াবাত (মন্ত্রী) এবং ভাগনে শেখ ফজলুল হক মনি স্ত্রী-পুত্রসহ তাঁদের বাসভবনে নিহত হন। এই দুই পরিবারের অল্প কয়েকজন ভাগ্যক্রমে পালিয়ে

রক্ষা পান। রাষ্ট্রপতির দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। এ ধরনের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পরও সেনা কর্মকর্তারা, বিশেষ করে মাঝারি ও জুনিয়র র‍্যাঙ্কের অফিসাররা, উল্লাস প্রকাশ করছিল। এ হত্যাকাণ্ড তাদের মনে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হচ্ছিল না। সেনাবাহিনীতে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আলাপ-সালাপ নিষিদ্ধ, অফিসারদেরও রাজনীতিতে আগ্রহী বলে কখনো মনে হয়নি। ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে তাদের উগ্র প্রতিক্রিয়া দেখে কিছুটা অবাক হলাম।

১৫ আগস্টের ঘটনা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই ঘটেছে। রাষ্ট্রপতির বাড়িসহ তিনটি বাড়িতে পাইকারি হারে হত্যাকাণ্ড, রেডিও ও টিভি স্টেশন দখল, ট্যাংক মুভমেন্ট। অথচ এত বড় ঘটনা ঘটার আগে কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ কিছুই জানতে পারেনি। ব্যাপারটা এককথায় অবিশ্বাস্য। পাকিস্তান আর্মিতে কু এবং সরকার পরিবর্তনকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু পঁচাত্তরের আগস্টে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো এত বিশাল মাপের নেতার হত্যাকাণ্ড সাধারণ মানুষের কাছে অকল্পনীয় ছিল।

ঘটনার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হলো। দুপুরের পর সিজিএস খালেদ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াতকে বঙ্গভবনের প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্য পাঠাতে হবে বলে জানান এবং আমাকে বঙ্গভবনে তাঁর কাছে বিকেলে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেন। আমি দ্রুত লাঞ্চ করে তিনজন এসকর্ট সঙ্গে নিয়ে জিপে আরোহণ করি। হাবিলদার সোবহান এবং দুজন সৈনিককে ১ম ইস্ট বেঙ্গল থেকে পাঠানো হয়েছে আমার নিরাপত্তার জন্য। এরা মুক্তিযুদ্ধে আমার অধীন সৈনিক ছিল এবং এদের পেয়ে আমিও নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম।

ক্যান্টমেন্টের জাহাঙ্গীর গেট দিয়ে জিপ নিয়ে বের হলাম। রাস্তাঘাট নির্জন, দু-একটি সামরিক যান ছাড়া কোনো গাড়ি চলছিল না। তেজগাঁও এয়ারপোর্টের সামনে রাস্তায় কিছু উৎসুক জনতা দাঁড়িয়ে আছে। সামরিক যান দেখে তারা হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। এদের কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বলে মনে হলো না। পটপরিবর্তনে তারা উল্লসিত। চকিতে মনে পড়ে গেল মাত্র সাড়ে তিন বছর আগেকার এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ঢাকায় ফিরে আসছেন। সারা দেশে সেদিন আনন্দের বান ডেকেছিল। প্রিয় নেতাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ তাঁকে স্বাগত জানায়। তাদের অনেকের চোখে সেদিন ছিল আনন্দের অশ্রু। তাঁকে

ফিরে পেয়ে দুহাত তুলে সৃষ্টিকর্তার দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছিল তারা। আমি নিজেও বিমানবন্দরের টারম্যাকে দাঁড়িয়ে নেতার ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তেজগাঁও থেকে রেসকোর্স মাত্র ১৫ মিনিটের পথ, সেদিন উৎফুল্ল জনতার ভিড় অতিক্রম করে তাঁর রেসকোর্সে পৌঁছাতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

রাস্তার দুই ধারে, বাড়ির বারান্দায়, এমনকি ছাদেও দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষ তাঁকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। রেসকোর্সের জনসভায়ও মানুষের ঢল নেমেছিল। অথচ মাত্র সাড়ে তিন বছরের ব্যবধানে দৃশ্যপটের কী আমূল পরিবর্তন। যে রাজপথের দুই ধারে দাঁড়িয়ে অগণিত মানুষ হাততালি দিয়ে তাঁকে স্বাগতম জানিয়েছিল, কয়েক বছরের ব্যবধানে আজ সেই একই রাজপথের দুই ধারে দাঁড়িয়ে মানুষ (সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হলেও) তাঁর হত্যাকারী ট্যাংক বাহিনীকেও অভিনন্দন জানাচ্ছে! টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত জনপদের কোথাও এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো না।

ফার্মগেট এসে ভাবলাম, বঙ্গভবনে যাওয়ার আগে ৩২ নম্বর রোডের অবস্থাটা একটু দেখে যাই। ডানে মোড় ঘুরে প্রথমে গেলাম রাষ্ট্রপতির কার্যালয় গণভবনে। জাতীয় সংসদ ভবনের উত্তর-পশ্চিমে লেকের পাড়ে অবস্থিত বিশাল কমপ্লেক্স গণভবন। রাষ্ট্রপতির অফিস, বাসভবন, সুপরিসর সবুজ লন এবং সিরামিক ইটে নির্মিত ইমারতসমূহ অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। গেটে কোনো পাহারা নেই। এত বিরাট অফিস, বাসভবন কমপ্লেক্স, অথচ কোথাও কোনো জনপ্রাণী দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই সামনের বড় বিল্ডিংয়ে ঢুকলাম। একজন ইউনিফর্মধারী এসে অভিবাদন জানালেন, অনারারি লেফটেন্যান্ট আবুল খায়ের। ১ম ইস্ট বেঙ্গল যশোরে অবস্থানকালে আমার কোম্পানির সিনিয়র জেসিও (সুবেদার) ছিলেন। ভালো ফুটবলার। পাকিস্তান জাতীয় দলেও খেলেছেন। ৩০ মার্চে আমাদের বিদ্রোহে যোগ দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী-পুত্র যশোরের ফ্যামিলি কোয়ার্টারে রয়ে যায়। দুই দিন চৌগাছা এলাকায় অবস্থানের পর বউ-বাচ্চার খোঁজে বেরিয়ে গেলেন আমার অনুমতি নিয়ে, আর ফিরে এলেন না। চার বছর পর বিচিত্র পরিস্থিতিতে আবার দেখা হলো। তিনি গণভবনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কম্পট্রোলার। আমাকে দেখে তিনি স্বস্তি ফিরে পেলেন। তাঁর হাতে অনেকগুলো চাবির তোড়া। এগুলো আমাকে গছিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চাচ্ছেন, 'স্যার, এই চাবিগুলো আপনি আমার কাছ থেকে বুঝে নেন।' আমি হতবাক। আমাকে কেন চাবি হস্তান্তর করতে চাচ্ছেন গণভবনের কম্পট্রোলার, বোঝাই যাচ্ছে, সকালের ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি

মানসিকভাবে এলোমেলো হয়ে গেছেন!

'কোনো অফিসার আছেন এখানে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি জানালেন কেউ নেই, তবে একজন সিনিয়র অফিসার এখানে বন্দী আছেন। তিনি আমাকে পাশের একটি ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সিভিল ড্রেসে গুটিসুটি মেরে ফ্লোরে বসে আছেন কর্নেল মাশহুরুল হক, রাষ্ট্রপতির মিলিটারি সেক্রেটারি। তিনি ১ম বেঙ্গলে ১৯৫১ সালে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার। রুমে কোনো আসবাব নেই। তাঁকে কেউ পাহারাও দিচ্ছে না। একাকী বসে আছেন। তিনি ভীত, সন্ত্রস্ত, বিধ্বস্ত। আমার দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন। আমি স্যালুট করে বললাম, 'স্যার, আপনি এখানে কেন?' 'আমাকে ল্যান্সার সৈনিকেরা রাস্তা থেকে ধরে এনে এখানে রেখে গেছে,' মাশহুরুল বললেন।

'স্যার, আপনি বাসায় যাবেন?' আমি বললাম।

'আমি তো বন্দী।' মাশহুরুল বললেন।

'কিসের বন্দী? এখানে তো কোনো গার্ডও নেই। আপনি বসে আছেন কেন?' আমি বললাম।

তিনি নিরুত্তর, বিহ্বল। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু নেমে এল। তিনি সিনিয়র, মোস্ট সিনিয়র টাইগার, আমি এবং আবুল খায়েরও একই পল্টনের সৈনিক। আমাদের সামনে মাশহুরুল নিজেকে অপদস্থ, অসহায় ভাবছেন।

আমি আবুল খায়েরকে বললাম একটি গাড়ি জোগাড় করে আনতে। মিনিট দশেক পর একটি জিপ পাওয়া গেল। আমি মাশহুরুল হককে জিপে তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে বললাম কর্নেল সাহেব যেখানে যেতে চান, দিয়ে আসবে। কেউ প্রশ্ন করলে বলবে মেজর হাফিজ পাঠিয়েছে। আমি আমার গাড়িতে উঠে বসলাম, আবুল খায়ের আমার পিছু পিছু:

'স্যার, আমার চাবির কী হবে, নেবেন না?' খায়ের বললেন।

'সাহেব, আপনি এখনো সুবেদার নাকি? রাষ্ট্রপতির বাসভবনের কম্পট্রোলার, অনারারি লেফটেন্যান্ট। রাষ্ট্রপতি নিহত আর আপনি আছেন চাবি নিয়ে। চুপচাপ বসে থাকেন। কেউ আপনার কাছে চাবির হিসাব চাইবে না।' বলে আমি জিপে স্টার্ট দিলাম।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের সেই বিখ্যাত বাসভবনটিতে। গেটে প্রহরায় রয়েছে ১ম ফিল্ড রেজিমেন্টের সৈনিকেরা। গেটে গাড়ি থেকে নামতেই ভেতর থেকে এগিয়ে এল মেজর বজলুল হুদা।

'ভেতরে যাব,' আমি বললাম।

'অবশ্যই, চলুন আমিই আপনাকে নিয়ে যাব,' হুদা বলল।

প্রথমবারের মতো এ বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকতেই হাতের বাঁ দিকে রিসেপশন কক্ষ। টেবিলের ওপর রক্তমাখা টেলিফোন। ফ্লোরে একটি লাশ। পরনের জামা রক্তে লাল হয়ে আছে। হুদা জানাল, ইনি প্রেসিডেন্টের ভাই শেখ নাসের। বাড়ির ভেতরে ঢুকেই বাঁ দিকে সিঁড়ি দিয়ে ল্যান্ডিংয়ে উঠলাম। ওপরে তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা আমার আজীবন মনে থাকবে। ল্যান্ডিং পেরিয়েই ওপরের দু-একটি ধাপের পরই সিঁড়ির ওপর লম্বালম্বি শায়িত রয়েছে বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ। পরনে লুঙ্গি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, গোড়ালি থেকে গলা পর্যন্ত একটি সাদা চাদরে ঢাকা। কোথাও রক্তের দাগ নেই। সেই অতিপরিচিত অবয়ব, নিমীলিত চোখ, ঈষৎ হাসিমুখ। দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ফিরে আসার উদ্যোগ নিতেই হুদা বলল, 'স্যার, ওপরে চলেন। সেখানে পরিবারের সদস্যদের ডেডবডি রয়েছে।'

'আমার তাড়া আছে, বঙ্গভবনে যেতে হবে আমাকে,' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। হুদা আমাকে জিপ পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

রাষ্ট্রপতির ৩২ নম্বরের বাড়ির সামনেই ধানমন্ডি লেক। লেকের অপর পাড়ে কলাবাগানের মাঠসংলগ্ন একটি জায়গায় ২য় ফিল্ডের সৈনিকেরা মেজর মুহিউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি ফিল্ডগান বসিয়ে রাষ্ট্রপতির বাড়ি লক্ষ্য করে সকালে দুটি গোলাবর্ষণ করে। দুটি গোলাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মোহাম্মদপুর এলাকায় পড়ে এবং তাতে কয়েকজন নিরীহ মানুষ নিহত হয়। পরবর্তীকালে ক্যান্টনমেন্টে অফিসাররা মুহিউদ্দিনকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত, 'চোখের সামনে ৩০০ গজ দূরে এত বড় টার্গেট, গোলা নিক্ষেপ করে হিট করতে পারলে না? কী ধরনের আর্টিলারি অফিসার তুমি! পদাতিক বাহিনীর অফিসার যখন বেতারযন্ত্র মারফত তোমাকে ম্যাপ রেফারেন্স পাঠিয়ে শত্রুর অবস্থান জানাবে, তোমার নিক্ষিপ্ত গোলা যে কোথায় পড়বে, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানবে না!' মুহিউদ্দিন শুনে বোকার মতো হাসত। সে যে বোকার হদ্দ, পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়েছে। ১৫ আগস্টের বিদ্রোহী অফিসাররা যখন ৩ নভেম্বর দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, এই মুহিউদ্দিন একাই দেশে থেকে গেছে। পরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার অনুষ্ঠিত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তা কার্যকর করা হয়।

প্রায় আড়াইটা বাজে। ফার্মগেট হয়ে বঙ্গভবনের উদ্দেশে এগিয়ে চলেছি। রেডিও স্টেশনের সামনে একটি ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে। ট্যাংকের ডান দিকের ট্র্যাক আইল্যান্ডের ওপর উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুটা কাত হয়ে আছে কালো রঙের ধাতব বস্তুটি। কয়েকজন লোক ট্যাংকের গায়ে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছে আর্মার প্লেটের ঘনত্ব। ভাবলাম রেডিও স্টেশনের ভেতরের হাল-হকিকত দেখেই যাই।

বাংলাদেশ বেতারের নাম ইতিমধ্যে ঘোষকের মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন এটি 'রেডিও বাংলাদেশ'। স্থাপনাটিতে গার্ড ডিউটি করছে ২য় ফিল্ডের সৈনিকেরা। ভেতরে বেশ কিছু অনুসন্ধিৎসু মানুষ কাজে-অকাজে ভিড় জমিয়েছে। মনে হচ্ছে আজ সবার জন্যই অবাধ প্রবেশাধিকার। একটি বড়সড় কক্ষে বসে আছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর শাহরিয়ার রশিদ খান। রেডিওর সিনিয়র, জুনিয়র সব পর্যায়ের কর্মকর্তা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশ অনুযায়ী বেতারের যাবতীয় কার্যক্রম চালাচ্ছেন। তিনি ধীরস্থির, শান্তভাবে সম্প্রচারসম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছেন, উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। তাঁর রুমে মিনিট দশেক বসে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে গেটের কাছে দেখা হলো অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহেরের সঙ্গে। একটি সিভিল জিপ থেকে নামলেন। জিপের পেছনে দুজন সিগন্যাল কোরের সৈনিক। তারা কুঁচকানো ইউনিফর্ম পরা, নিরস্ত্র। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক বলেই মনে হলো। তাহের আমাকে দেখে জিপ থেকে নেমে ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন।

'হাফিজ, কেমন আছ?' তাহের বললেন।

'ফাইন স্যার, ধন্যবাদ।' আমি বললাম।

'ভেতরে ফারুক বা রশিদ আছে?' তাহের বললেন।

'না, ওদের দেখলাম না। শাহরিয়ার আছে।' আমার সংক্ষিপ্ত জবাব।

আমার আশপাশে কৌতূহলী পাবলিক জড়ো হচ্ছে। তাই সময়ক্ষেপণ না করে জিপে উঠলাম। তাহের রেডিও স্টেশনের ভেতরে ঢুকলেন।

ঢাকা ক্লাব পেরিয়ে ডান দিকে তাকিয়ে দেখি পাঁচ-ছয়টি ট্যাংক রেসকোর্সে অবস্থান নিয়েছে। কারফিউ ঘোষণা সত্ত্বেও রাস্তায় লোকজনের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেলা তিনটার দিকে প্রথমবারের মতো বঙ্গভবনের ভেতরে ঢুকি। এর আগে কয়েকবার বঙ্গভবনের লনে এসেছি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। তৎকালীন সামরিক বাহিনী সাইজে ছোট, সব অফিসারই আমন্ত্রণ পেতেন। দেখলাম বঙ্গভবনের লবিতে, করিডরে সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিরা ভিড় জমিয়েছেন। সামনে চলমান দুজনকে অনুসরণ করে একটি বড়সড় কক্ষে প্রবেশ করে দেখি এটি খোদ রাষ্ট্রপতির অফিস কক্ষ। পথে কিংবা দরজায় কেউ পরিচয়ও জিজ্ঞেস করল না। অনুধাবন করলাম, সামরিক ইউনিফর্মই আজ সব বাধা অতিক্রমকারী পাসপোর্ট।

রাষ্ট্রপতির চেয়ারে আয়েশি ভঙ্গিতে বসে আছেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। মাথায় সুপরিচিত টুপি না থাকায় বড়সড় টাক দৃশ্যমান। তাঁকে আগে কখনো সামনাসামনি দেখিনি। উঁচু চেয়ারে বসা না থাকলে বোঝাই

যেত না যে ঘরের সবচেয়ে খর্বাকৃতি ব্যক্তিটিই নতুন রাষ্ট্রপতি। যেভাবে রিল্যাক্সড মুড়ে বসে আছেন, মনে হচ্ছে তিনি এ ঘরেই জন্মগ্রহণ করে এখানেই বেড়ে উঠেছেন। রাষ্ট্রপতির টেবিলের সামনে চার-পাঁচ সারি চেয়ারে বসে আছেন আমলারা এবং অপরিচিত কয়েকজন রাজনীতিক। বরিশালের এমপি, এককালের তুখোড় ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম মনজুরও বসে আছেন দ্বিতীয় সারিতে। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় হলো।

রাষ্ট্রপতির ডান পাশে রক্ষিত চেয়ারের সারিতে বসে আছেন তিন বাহিনীর প্রধানেরা। সেনা উপপ্রধান জিয়াউর রহমান, সিজিএস খালেদ মোশারফ, বিডিআর প্রধান ব্রিগেডিয়ার খলিল প্রমুখ। রাষ্ট্রপতির টেবিলের বাঁ দিকে কক্ষের এক কোনায় চুপচাপ বসে আছে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী অফিসাররা—রশিদ, ফারুক, ডালিম, নূর, রাশেদ। এঁরা সবাই আমার বন্ধু, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ আজিজ পল্লিতে প্রতিবেশী। এঁদের সারিতেই বসে আছেন একমাত্র নারী, রশিদের স্ত্রী যুবায়েদা রশিদ। রশিদ ও ফারুক সম্পর্কে ভায়রা। চট্টগ্রামের শিল্পপতি এ কে খানের ভাইয়ের দুই মেয়েকে বিয়ে করেছেন তাঁরা। এই অফিসারদের সঙ্গে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হতো গ্যারিসন সিনেমা হলে কিংবা অফিসার মেসে বিভিন্ন পার্টিতে। এঁদের কারও মুখে কখনো রাজনৈতিক আলাপ শুনিনি। ফারুক তো বাংলাই ভালোমতো বলতে পারেন না। পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর পিতা মেজর রহমান আর্মি মেডিকেল কোরের অফিসার, চাকরিকালীন অধিকাংশ সময় পশ্চিম পাকিস্তানেই কাটিয়েছেন। ফারুক অবশ্য একটু এক্সট্রোভার্ট টাইপ, অতিকথনের অভ্যাস আছে। কিন্তু এ গ্রুপের কাউকেই রাজনীতিসচেতন বলে মনে হয়নি। অথচ এঁরাই কত বড় অঘটন ঘটিয়ে বসেছেন।

সিজিএস খালেদের কাছে রিপোর্ট করতেই বললেন, 'বসো, একটু পরই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। এর পরই তোমাকে করণীয় সম্পর্কে ব্রিফ করব।' আমি ডালিমের পাশে বসে ঘরের পরিবেশ বোঝার চেষ্টা করলাম।

খন্দকার মোশতাক সাইজে ছোট হলেও ফৌজি জেনারেলের ভঙ্গিতে ডাটে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। পাঁচ-সাত মিনিট পরপর টেলিফোনে একে-ওকে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিচ্ছেন। 'ওকে, জাস্ট ডু ইট, লেট মি নো'—এভাবেই টেলিফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তির সঙ্গে বাতচিত করছেন। একবার মনে হলো নিহত নেতার মৃতদেহ টুঙ্গিপাড়া পাঠানোর অগ্রগতি সম্পর্কে কেউ তাঁকে টেলিফোনে ব্রিফ করলেন।

মোশতাক শান্ত, ধীরস্থিরভাবে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। তাঁর মধ্যে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। নেতা সপরিবারে নিহত, সাদা চাদরে ঢাকা তাঁর মৃতদেহ সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে—এসব তাঁর মনোজগতে কোনো প্রভাব ফেলতে

পারেনি। একপর্যায়ে একজন উপসচিবকে কড়া ধমক লাগালেন, 'কী ড্রাফট নিয়ে এসেছেন, পেটে তো বিদ্যা বলতে কিছু নেই। ইংরেজি এক লাইনও ঠিকমতো লিখতে পারেন না।' সে ধমকে সামনে বসা লোকজন একটু নড়েচড়ে বসলেন।

বঙ্গভবনে ঢোকার আগে ভেবেছিলাম এখন থেকে সেনাপ্রধানই বোধ হয় রাষ্ট্র চালাবেন। রাষ্ট্রপতির ঘরে কয়েক মিনিট বসেই মনে হলো খন্দকার মোশতাকই Master of the Ceremony। সামরিক বাহিনীর তিন প্রধান ভেজা বিড়ালের মতো জি-হুজুর ভঙ্গিতে বসে আছেন। ঘণ্টাখানেক রাষ্ট্রপতির ঘরে ছিলাম। এঁরা এ সময়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। মেজর রশিদ দু-একবার উঠে গিয়ে খন্দকার মোশতাকের কানের কাছে নিচু স্বরে কিছু বলতেই তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। ক্যাবিনেট সেক্রেটারি এইচ টি ইমাম একবার এসে তাঁকে নিচু গলায় ব্রিফ করলেন।

বঙ্গভবনের দরবার হলে মুজিব সরকারের মন্ত্রীরা প্রায় সবাই উপস্থিত, শুধু পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বিদেশে ছিলেন। এঁদের কাউকে জোর করে ধরে আনা হয়েছে বলে মনে হলো না। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুটা অসুস্থ ছিলেন, তাঁর একটি চোখ সাদা ব্যান্ডেজে ঢাকা। সবাই নীরবে বসে ছিলেন। দু-একজন কিছুটা বিষণ্ন, চিন্তিত। আমার সরাসরি শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডা. মুজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী (ম্যাক) তাঁদের একজন। বিকেল চারটার দিকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রথমে রাষ্ট্রপতি পদে খন্দকার মোশতাক, পরে অন্যরা মন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পর মন্ত্রিরা মোটামুটি স্বস্তি ফিরে পেলেন। উপলব্ধি হলো তাঁদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। সবকিছুই গতকালের মতো রয়েছে। সরকার, পদ-পদবি সবই আগের মতো। শুধু নেতা নেই, ব্যস, এইটুকু!

সিজিএস বঙ্গভবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমাকে ব্রিফ করলেন। বেঙ্গল ল্যান্সারের সাত-আটটি ট্যাংক বঙ্গভবনের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে। তিনি ৪৬ ব্রিগেড থেকে ইস্ট বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি পাঠানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন, জানালেন বিডিআর থেকেও ট্রুপস আসবে বঙ্গভবনের প্রতিরক্ষায়।

সেনানিবাসে ফিরে যাওয়ার জন্য বঙ্গভবনের গাড়িবারান্দায় এলাম। কালো ডাংরি পরা ল্যান্সার সৈনিকেরা লনে ঘোরাঘুরি করছে। একজন আমার সামনে এসে স্যালুট করে নিজের পরিচয় দিল।

'স্যার, আমার নাম মোসলেমউদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ৮ম বেঙ্গলে সুবেদার ছিলাম। তেলঢালায় আপনাকে দেখেছি।'

'কী খবর, কেমন চলছে সবকিছু,' ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করলাম।

'স্যার, আজ আমাকে প্রমোশন দিয়ে অনারারি ক্যাপ্টেন বানানো হয়েছে,' মোসলেম জানাল।

তার কাঁধের দিকে তাকালাম। দেখি এক কাঁধে ক্যাপ্টেনের তিনটি পিপ, অপর কাঁধ খালি। কোনো র‍্যাঙ্ক ব্যাজ বা পিপ নেই। সুবেদারের দুই কাঁধে দুটি করে মোট চারটি পিপ থাকে, জেসিও পদের লাল চিকন ফিতাসহ। ব্যাজেস অব র‍্যাঙ্ক (পিপ) ক্যান্টনমেন্টের দোকান ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। অনারারি ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্ক সাধারণ সৈনিক বা জেসিওর জন্য পরম আরাধ্য বস্তু। হত্যাকাণ্ডে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য মোসলেমকে সুবেদার থেকে সরাসরি অনারারি ক্যাপ্টেন পদে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। তার আনন্দ আর ধরে না! তাড়াহুড়ো করে সুবেদারের লাল ফিতা সরিয়ে এক কাঁধ থেকে দুটি পিপ খুলে অপর কাঁধে একটি যোগ করেছে, অন্যটি পকেটে। এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি। ক্যাপ্টেনের এক কাঁধে ব্যাজেস অব র‍্যাঙ্ক, অপর কাঁধ খালি। আজ ১৫ আগস্ট, সবকিছুই জায়েজ!

ক্যান্টনমেন্টে ফেরার পথে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের দৃশ্য চোখে ভাসছিল। গতকালও এঁরা বঙ্গবন্ধু বলতে অজ্ঞান ছিলেন, তোষামোদের প্রতিযোগিতায় একে অন্যকে হারানোর কসরতে লিপ্ত ছিলেন। আজ অম্লান বদনে শপথ নিলেন, বিধি মোতাবেক সবার প্রতি যথাবিহিত আচরণ করবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। গতকাল পর্যন্ত টেলিভিশনের খবরে দেখা গেছে ঝাঁকে ঝাঁকে বিভিন্ন পেশার লোকজন দীর্ঘ লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষমাণ থেকে নেতার হাতে পুষ্পস্তবক দিয়ে বাকশালে যোগ দিচ্ছেন। এমনকি ঢাকার শীর্ষস্থানীয় ফুটবলাররা পর্যন্ত নিজ টিমের জার্সি পরে বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে বাকশালে যোগ দিচ্ছেন। আজ কোথায় গেলেন তাঁরা? কোথায় গেল মাইক ফাটানো ছাত্র-যুব নেতারা!

সেনাবাহিনীতে নানা প্রতিক্রিয়া, রদবদল

সরকার পরিবর্তন, সামরিক আইন জারি এতই সহজ? মাত্র দুজন মেজরের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল গোলাবিহীন কয়েকটি ট্যাংক নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রে এত বড় পরিবর্তন কেমন করে ঘটাল! বঙ্গভবন থেকে জাহাঙ্গীর গেট পর্যন্ত কয়েক মিনিটের ভ্রমণ আমার মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অনেক প্রশ্নের উত্তরও পেয়েছি। '৭২-এর ১০ জানুয়ারি যে নেতার আগমনে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ব্যস্ত জনপদে আনন্দের বান ডেকেছিল, মাত্র সাড়ে তিন

বছরের ব্যবধানে তাঁর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে সেই জনপদ নীরব, নিস্তব্ধ, নিরুত্তর। যে রাজনৈতিক দল পাকিস্তান আমলে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল, স্বাধীন দেশে তাদের পক্ষ থেকেই আসে প্রথম সামরিক আইন জারির ঘোষণা। Truth is stranger than fiction.

সন্ধ্যার কিছু পরই আমি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসি। কমান্ডার শাফায়াত জামিল অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন অফিসের বারান্দায়। আমি ফিরে আসায় তিনি স্বস্তি ফিরে পেলেন। তিনি আমাকে খুবই পছন্দ করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার মতামতের ওপর খুবই আস্থাশীল ছিলেন। সিজিএস খালেদ ব্রিগেড কমান্ডারের রুমে বসে ঢাকার বাইরের ব্রিগেড ও অন্য ফরমেশনগুলোর সঙ্গে বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে টেলিফোনে মত বিনিময় করছিলেন। দুপুরের দিকে সেনাপ্রধান বঙ্গভবন থেকে খালেদকে নির্দেশ দেন বেঙ্গল ল্যান্সারকে ট্যাংকের গোলা (অ্যামুনিশন) সরবরাহ করার জন্য। শান্তিকালীন সময়ে ট্যাংকের অ্যামুনিশন অর্ডন্যান্স ডিপোতে সিজিএসের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এভাবেই আমরা জানতে পারলাম ট্যাংকগুলো গোলা ছাড়াই রাতের অভ্যুত্থান এবং হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল। খালেদ অর্ডন্যান্স ডিপোকে ট্যাংকের গোলা ইস্যু করার জন্য অফিশিয়াল অর্ডার দুপুর ১২টার দিকে জারি করেন।

আমি কমান্ডার শাফায়াতকে ৩২ নম্বর, শাহবাগ রেডিও স্টেশন এবং বঙ্গভবনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাই। বঙ্গভবনে বিদ্রোহী মেজরদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাও তুলে ধরি।

শাফায়াত অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করতেন, বঙ্গবন্ধুও তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি শাফায়াতকে তাঁর মিলিটারি সেক্রেটারি নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন—মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্কে পদোন্নতি দিয়ে। শাফায়াত কোনো সিরিমনিয়াল র‍্যাঙ্কে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। সে কারণে বিনয়ের সঙ্গে এ অফার ফিরিয়ে দেন। মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণে শাফায়াত বিস্মিত হন এবং এঁদের বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেন।

ক্যান্টনমেন্টে ৪৬ ব্রিগেড ছাড়াও লগ এরিয়া, আর্টিলারি, সিগন্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই কোরের বিভিন্ন ইউনিট মোতায়েন ছিল। এসব ইউনিটের অফিসাররা পটপরিবর্তনে খুবই উল্লসিত ছিলেন এবং অভ্যুত্থানকারী অফিসারদের বিভিন্ন সময়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শাফায়াত তাঁদের টেলিফোন করে চেইন অব কমান্ডের প্রতি অনুগত থাকার জন্য নির্দেশ দেন। অভ্যুত্থানকারী মেজর রশিদ খন্দকার মোশতাকের বরাত দিয়ে কুমিল্লার

ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল আমজাদকে ঢাকায় সৈন্য পাঠানোর নির্দেশ দেন। আমজাদ এ নির্দেশ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ খবর জানতে পেরে শাফায়াত আমজাদকে চেইন অব কমান্ডের প্রতি অনুগত থাকার অনুরোধ করেন এবং সেনাপ্রধানের নির্দেশ ছাড়া সেনা পাঠাতে নিষেধ করেন। আমজাদ ঢাকায় সেনা পাঠানো থেকে বিরত থাকেন।

সেনাপ্রধানের নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার ফলে সব সেনানিবাসেই পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কর্নেল শাফায়াত এবং আমি ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকদের ব্যারাকে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিই। সিজিএস খালেদ মোশাররফও আমাদের অনুগামী হলেন। ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সুবেদার মেজর চাঁদ বখশ কাজী সৈনিক ব্যারাকে আমাদের স্বাগত জানান এবং তিনটি রুমে আমাদের থাকার সুবন্দোবস্ত করেন। ইতিমধ্যেই ১ম ইস্ট বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি বঙ্গভবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পাঠানো হলো, একটির কমান্ডার মেজর ইকবাল। বৈবাহিক সম্পর্কে আমার গুরুজন হলেও ইকবাল সামরিক প্রটোকল মেনে চলতেন এবং আমার নিষেধ সত্ত্বেও আমাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করতেন।

১ম ইস্ট বেঙ্গলের ব্যারাকে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা তিনজন, অর্থাৎ খালেদ, শাফায়াত ও আমি সারা দিনের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলাম। খালেদের ধারণা, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ঘটনার পেছনে কলকাঠি নেড়েছে। শাফায়াতও একমত হলেন। আমি অধস্তন অফিসার, চুপচাপ তাঁদের বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলাম। বিকেলে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির রুমে অবস্থানকালে এক ফাঁকে ফারুককে একান্তে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিদেশি পরাশক্তিসমূহের এ অভ্যুত্থান সম্পর্কে রিঅ্যাকশন কেমন হবে? ফারুক রিল্যাক্সড মুডে জানালেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের সমর্থন করবে এবং মাসখানেক আগে তিনি নিজেই আমেরিকার দূতাবাসে গিয়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করেছেন। তিনি এমনও বললেন, আজ তাঁরা অভ্যুত্থানে ব্যর্থ হলে তাঁদের পলায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে একটি বিদেশি বিমান ঢাকা বিমানবন্দরে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তাঁর অতিকথনের অভ্যাস রয়েছে, তাই আমি কোনো মন্তব্য করিনি। খালেদ সম্পর্কে ফারুকের দূরসম্পর্কের মামা, তাঁর সামনে বঙ্গভবনে ফারুকের সঙ্গে কথোপকথনের উল্লেখ করিনি। শাফায়াতকে একপর্যায়ে ফারুকের আমেরিকান দূতাবাসে যাওয়ার কথা জানালে তিনি অবাক হলেন। জানালেন যে সদ্য স্বাধীন দেশে অনেক জুনিয়র অফিসার বড় দায়িত্ব পেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। কয়েক মাস আগে তিনি জানতে পারেন মেজর ফারুক তাঁর মামা নুরুল কাদের খানের (সরকারের সচিব) বনানীর বাসভবনে ল্যান্সারের সৈনিকদের গার্ড

ডিউটি করার জন্য পাঠান। এটি সেনা আইনে একটি গর্হিত অপরাধ। শাফায়াত সেনা সদরে এ মর্মে জানালে গার্ড পাঠানো বন্ধ হয়। কিন্তু ফারুককে তার জন্য কোনো শাস্তি ভোগ করতে হয়নি।

ঘুমানোর জন্য ঘরে ঢোকার পর সুবেদার মেজর কাজী এবং দুজন জেসিও অনুমতি নিয়ে আমার ঘরে আসেন। তাঁরা জানতে চান, 'হচ্ছেটা কী, এর পরিণতি কী হবে?'

'আমিও কিছুই জানি না। এত বড় ঘটনা ঘটল, কেউ টেরই পেল না। কী আশ্চর্য!' আমি বললাম।

'স্যার, ট্যাংকের ব্যারেল আমাদের ব্যারাকের দিকে তাক করে আছে কেন?' ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর কাজীর।

'বুঝতে পারছি না, তবে সতর্ক থাকবেন এবং সৈনিকদের চেইন অব কমান্ডের আওতায় রাখবেন।' আমি বললাম।

'জি স্যার, কোনো চিন্তা করবেন না। আপনাকে দেখলেই আমাদের একাত্তরের কথা মনে পড়ে, আশ্বস্ত হই।' কাজী বললেন।

বিভিন্ন আর্মস, সার্ভিস, কোর সেনাবাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু সবারই নিজস্ব আর্মস কিংবা সার্ভিস নিয়ে গর্ব রয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভিত্তি, স্বাধীনতাযুদ্ধে ইতিহাস সৃষ্টিকারী সংগঠন, এদের দিকে ট্যাংকের ব্যারেল নিশানা করেছে, এটি প্রবীণ টাইগারদের কাছে ভালো লাগেনি।

রাতে উত্তেজনায় ঘুম আসছে না, অকল্পনীয় ঘটনা অবলীলায় ঘটিয়েছেন কয়েকজন জুনিয়র অফিসার। এর পরিণতি কী হবে? শহীদ আজিজ পল্লিতে আমার পরিবার উৎকণ্ঠায় রয়েছে, বিকেলে স্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছি। গতকাল আব্বাও নিজস্ব কাজে ঢাকায় এসে আমার বাসায় উঠেছেন। পরিস্থিতি শান্ত জেনে তিনিও নির্ভার হলেন। ১৫ আগস্টের রাতটি নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল।

১৬ আগস্ট সকালে ঘুম থেকে উঠে সিজিএস খালেদ সেনা সদরে তাঁর অফিসে চলে গেলেন। কমান্ডার শাফায়াত ও আমি আমাদের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে চলে এলাম।

সেনাবাহিনী কর্তৃক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্বাভাবিক ঘটনা। সাধারণত পরাশক্তির যোগসাজশেই এমন ঘটনা ঘটে থাকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলের অনেকের ধারণা, আমেরিকা ১৫ আগস্টের ঘটনায় মদদ দিয়েছে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের যেভাবে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, সেটি সবাইকে স্তম্ভিত করেছে। অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরই চীন ও সৌদি আরব

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। উল্লসিত পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাসমতি চাল এবং কাপড় বাংলাদেশকে সাহায্য হিসেবে পাঠান। পাকিস্তান ভাঙার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টো অনেকাংশে দায়ী, তাঁর উসকানিতেই পাকিস্তানি সামরিক জান্তা একাত্তরে বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে। বাংলাদেশ ভাত-কাপড়ের জন্য কারও কাছে আত্মবিক্রয় করেনি এবং এ ধরনের অযাচিত দাক্ষিণ্য বিকৃত মানসিকতার পরিচায়ক। পঁচাত্তরেও আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে কোল্ড ওয়ার চলমান ছিল। বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ধরে নেয় তিনি সোভিয়েত ব্লকে যোগ দিয়েছেন। এ কারণেই তাদের গোয়েন্দা সংস্থা ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে মদদ জুগিয়েছে বলে জনমনে ধারণা জন্মায়। একাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার, বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মেনে নিতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে তাঁর মিটিং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল এবং ফোর্ড প্রথম সাক্ষাতে শীতল মনোভাব প্রদর্শন করায় বঙ্গবন্ধু কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিলেন। এটিও তাঁর সোভিয়েত ব্লকের প্রতি ঝুঁকে পড়ার অন্যতম কারণ বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন।

১৫ আগস্টের ঘটনা অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই ঘটে। সরকার ও আওয়ামী লীগ নেতারা ঘুণাক্ষরেও এ ধরনের তৎপরতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। পঁচাত্তরে শাসনব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে জনমনে অসন্তোষ ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীতে এর কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। সেকালে সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিকেরা রাজনীতি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন না। রাজনৈতিক মতবাদের অনুপ্রবেশও লক্ষ করা যায়নি। ১৯৭৩-এর পর সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান-প্রত্যাগত এই দুটি গ্রুপের উপস্থিতি ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। উভয় গ্রুপের সিনিয়র অফিসাররা বঙ্গবন্ধুর আনুকূল্যলাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তবে এঁরা কেউই সরকারের জন্য হুমকি ছিলেন না। জুনিয়র অফিসাররা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রত্যাগত সিনিয়রদের উভয় গ্রুপ সরকারের উচ্চপর্যায়ে আনুকূল্যলাভের জন্য ধরনা দেওয়ায় সরকার সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। কিন্তু সামরিক অফিসারদের হ্যান্ডল করার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে কারোরই ছিল না। উচ্চপর্যায়ের পদোন্নতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিল এবং বঙ্গবন্ধু নিজেই ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তদবিরের মাধ্যমে দুটি পদোন্নতি সেনাবাহিনী কর্মকর্তাদের মানসিক ভারসাম্য কিছুটা নষ্ট করে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মালেক একজন প্রত্যাগত অফিসার, পেশাগতভাবে মোটামুটি দক্ষ ছিলেন। রাজনৈতিক মহলের তদবিরে বেশ কয়েকজন সিনিয়র

কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে তাঁকে কর্নেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এতে সিনিয়র ও যোগ্যতর প্রত্যাগত অফিসাররা নাখোশ হন। মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল মীর শওকত একজন দক্ষ কর্মকর্তা, সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তিনি ও খালেদ মোশাররফ একই কোর্সে কমিশন পেলেও শওকত পাসিং আউট মেধাক্রমে খালেদের সিনিয়র ছিলেন। খালেদের রাজনৈতিক খুঁটির জোর বেশি, তিনি তদবিরের মাধ্যমে শওকতের আগেই ব্রিগেডিয়ার র‍্যাঙ্কে পদোন্নতি লাভ করেন। শওকত স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হলেন এবং রাজনৈতিক আনুকূল্যলাভে সচেষ্ট হলেন। কিছুদিন পর বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ইন্তেকাল করেন। যশোর ব্রিগেডের কমান্ডার মীর শওকত টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে তাঁর পিতার কবরে সামরিক পোশাক পরে মাল্যদান করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনিও ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

রাজনৈতিক আনুকূল্যলাভের জন্য সেনা কর্মকর্তাদের এ ধরনের প্রকাশ্য তৎপরতা সামরিক বাহিনীর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে ফাটল ধরায়। এভাবে গ্রুপিং এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড ও পেশাদারত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ সময়ে সেনাবাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ একাত্তরের মার্চে মেজর পদবিতে একটি ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক ছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের ফলে মাত্র এক বছর পরই ৬ এপ্রিল ১৯৭২ তিনি পুরো সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বনে যান। স্বাভাবিকভাবেই এত বড় গুরুদায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তাঁর এবং অন্য সিনিয়রদেরও অভিজ্ঞতার ঘাটতি ছিল। সফিউল্লাহ একজন সহজ-সরল নরম প্রকৃতির কর্মকর্তা ছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশে বিভিন্ন গ্রুপকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি দক্ষ সুশৃঙ্খল পেশাদার বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁকে তৎপর বলে মনে হয়নি।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের ফলে সেনাবাহিনী প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করে। দু-চার দিনের মধ্যেই ঢাকা গ্যারিসনে দুটি বিপরীতমুখী স্রোতোধারার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হলো। এক. সেনাপ্রধানের চেইন অব কমান্ডের অনুগত প্রথাগত বাহিনী। দুই. ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী বিদ্রোহী সেনাদল, ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার ও ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট। সেনাবাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তারা প্রথম এবং বৃহৎ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা ও কমান্ড অব চেইন অনুসরণ করা তাঁদের কাছে এক নিতান্তই সাধারণ কর্তব্য, এর বাইরে কোনো কিছু তাঁদের চিন্তাচেতনার বহির্ভূত। দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত বিদ্রোহী অফিসার ও সৈনিকেরা মূল বাহিনীর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ। অভ্যুত্থানে এত সহজে, বিনা বাধায় সাফল্য তাদের

অত্যুৎসাহী ও দুর্বিনীত করে তোলে। সেনাপ্রধান ও অন্য সিনিয়রদের উপেক্ষা করে তারা মেজর ফারুক-রশিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। বঙ্গভবন ও রেসকোর্সে মোতায়েন ট্যাংকসমূহ তাদের শক্তির উৎস এবং তারা নিজেদের এলিট বাহিনী এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ামক শক্তি বলে মনে করে। শিশু ও নারীদের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণের ফলে এদের একটি অংশ মানসিক ভারসাম্য হারায়। তবে রক্ত ঝরানো অভিযানে অংশগ্রহণের ফলে তাদের মধ্যেকার ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

মেজর ফারুক ও রশিদ বঙ্গভবনে ঘাঁটি গেড়ে বসেন। রাষ্ট্রপতি মোশতাকের আস্থাভাজন ব্যক্তিত্বরূপে তাঁরা সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহকে ব্যবহার করে পুরো সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। চাকরি বজায় রাখার স্বার্থে সেনাপ্রধান রশিদ-ফারুকের ইচ্ছা অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে কয়েকটি পদায়ন অনুমোদন করেন। ১৫ আগস্ট-পরবর্তী দুই দিন সেনাপ্রধান সফিউল্লাহকে বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাক ও বিদ্রোহীদের সান্নিধ্যেই সার্বক্ষণিকভাবে ব্যস্ত রাখা হয়। রশিদ ও ফারুক সেনাপ্রধানের হাতে কয়েকটি ছোট চিট ধরিয়ে দেন। গুরত্বপূর্ণ পদে পোস্টিং ও ট্রান্সফারের তালিকাসংবলিত চিটগুলো দ্রুত কার্যকর করার জন্য সেনাপ্রধানের ওপর চাপও সৃষ্টি করেন তাঁরা।

খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হয়ে আওয়ামী লীগকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেন। শীর্ষ পর্যায়ের চারজন সিনিয়র নেতাসহ কয়েকজনকে তিনি জেলে পাঠিয়ে দেন। অন্যরা নিরাপদে ক্ষমতা ভোগ করার জন্য তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। জাতীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে মোশতাক নিয়মিতভাবে বঙ্গভবনে সভা করতে থাকেন। মাসখানেকের মধ্যেই তিনি দলে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিজের অবস্থান সংহত করেন। স্পিকার আবদুল মালেক উকিল ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সভায় যোগদানের পথে লন্ডনে যাত্রাবিরতি করেন। হিথরো বিমানবন্দরে বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁর মন্তব্য ছিল, 'ফেরাউনের' পতন ঘটেছে। ন্যাপের সিনিয়র নেতা মহিউদ্দিন আহমেদ মোশতাকের দূত হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া সফর করে সরকারের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন।

খন্দকার মোশতাক সেনাপ্রধান সফিউল্লাহকে সেনা সদরে সিনিয়র অফিসারদের বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করার জন্য নির্দেশ দেন। ১৯ আগস্ট সেনাপ্রধান ঢাকায় সিনিয়র অফিসারদের মিটিং ডাকেন। তিনি ফারুক ও রশিদকে নিয়ে সভায় প্রবেশ করেন এবং প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে তাঁরা অফিসারদের বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দেবেন বলে জানান। প্রথমে রশিদ বক্তব্য শুরু করেন। তিনি ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের কারণ এবং

যৌক্তিকতা সম্পর্কে সিনিয়র অফিসারদের অবহিত করেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন যে এই অভ্যুত্থান ছিল সময়ের দাবি এবং সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অফিসারদের সঙ্গে অভ্যুত্থানের আগে বিভিন্ন সময় তাঁরা মতবিনিময়ও করেছেন। কর্নেল শাফায়াত এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং রশিদকে সরাসরি বলেন, 'You are all liars, Mutineers and Murderers. Moshtaq is a userper, he is not my President.' 'মোশতাককে বলো প্রথম সুযোগেই আমি তাঁকে উৎখাত করব এবং চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করার জন্য তোমাদের বিচারের সম্মুখীন করা হবে।'

শাফায়াতের বক্তব্যে রশিদ ও ফারুক স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। তাঁদের এভাবে কেউ ভর্ৎসনা করতে পারে, এটি তাঁরা কল্পনাও করেননি। তাঁরা মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকেন। সভাস্থলে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। সেনাপ্রধান সভা ভেঙে দিয়ে তাঁর অফিস ঘরে গেলেন, উপপ্রধান জিয়াও তাঁকে ফলো করেন। শাফায়াত জামিলও দু-চার মিনিট পর সেনাপ্রধানের ঘরে ঢুকলে জিয়া তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বলেন, 'শাফায়াত, ভেরি ওয়েল ডান। তুমি এদের সঙ্গে সঠিক আচরণ করেছ, Keep it up.'

শাফায়াত বললেন, 'স্যার, আমি এ খুনিদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছি, আপনারাও খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে একই ভাষায় কথা বলবেন। আপনারা বঙ্গভবন থেকে সব ষড়যন্ত্রকারীকে উচ্ছেদ করুন।' কিন্তু সেনাপ্রধান ও উপপ্রধান বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিলেন। চেইন অব কমান্ড ভঙ্গুর হয়ে পড়ায় তাঁরা নিজেরাও একধরনের আস্থাহীনতায় ভুগছিলেন।

২৪ আগস্ট সেনাবাহিনীতে বড়সড় পরিবর্তন ঘটানো হলো। সেনা উপপ্রধান জিয়া ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াতকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তাঁর অফিসে ডাকলেন। সেখানে বসেই তাঁরা রেডিও খবরে শুনলেন যে জিয়াকে সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সেনাপ্রধানের ওপরেও একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। তিন বাহিনীপ্রধানকে তাঁর অধীনে ন্যস্ত করা হলো। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির সামরিক উপদেষ্টা পদে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে। আমি সন্ধ্যার পর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে আমার অফিসে বসে আছি। সাড়ে সাতটার দিকে বিডিআর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান আমার অফিসে আসেন। আমি তাঁকে জানালাম যে কমান্ডার অফিসে নেই। তিনি সেনা সদরে গিয়েছেন। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমার সঙ্গেই গল্পসল্প করি।' প্রায় এক ঘণ্টা সময় তিনি এটা-সেটা নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে গল্পগুজব করে বেরিয়ে

যান। আমি তখনো সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদসমূহে পরিবর্তনের কথা জানতাম না। তিনি আসলে তাঁর চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) পদে নিয়োগ সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া জানার জন্যই অফিসে এসেছিলেন। ১ম ইস্ট বেঙ্গলে আমার একসময়ের কমান্ডিং অফিসার কাজী গোলাম দস্তগীরকে বিডিআর মহাপরিচালকরূপে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বাসায় ফিরে রাত ১০টার দিকে জেনারেল জিয়ার এডিসি ক্যাপ্টেন জিল্লুরের ফোন পেলাম; অপর প্রান্তে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সিএএস জিয়াউর রহমান।

'হাফিজ, খবর শুনেছ?'

'স্যার, কনগ্র্যাচুলেশনস।' আমি অভিনন্দন জানালাম।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, শেখ সাহেব কখনো আমাকে চিফ বানাবেন না।' জিয়া বললেন।

'বেস্ট অব লাক, স্যার।' শুভ কামনা জানালাম।

বছর দেড়েক আগে তাঁর পিএস থাকাকালে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে আওয়ামী সরকার তাঁকে কখনো চিফ বানাবে না। জিয়া কথাটি মনে রেখেছেন দেখে অবাক হলাম।

সেনা উপপ্রধান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ব্রিগেডিয়ার এরশাদকে। তিনি দিল্লিতে একটি সামরিক কোর্সে অংশগ্রহণ করছিলেন। সাধারণত সেনাবাহিনীর বাইরে, বিশেষ করে বিদেশে অবস্থানকালে একজন অফিসারকে পদোন্নতি দেওয়া হয় না। নিয়ম ভঙ্গ করে এরশাদকে প্রথমে ব্রিগেডিয়ার ও দুই মাস পর মেজর জেনারেল পদে প্রমোশন দেওয়া হলো।

জিয়া বাহাত্তরে চিফ পদে সুপারসিডেড হওয়ার পর থেকেই নীরবে মাটি কামড়ে পড়ে ছিলেন। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর—তিনটি বছর আওয়ামী সরকারের মন জয় করার চেষ্টা চালিয়েছেন। অবশেষে তাঁর ভাগ্যে শিকা ছিঁড়লেও তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। তাঁকে চিফ নিয়োগ দেওয়া হলেও তাঁর ওপরে তিন বাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য সিডিএস পদে জেনারেল খলিলুর রহমানকে নিয়োগ দেওয়ায় জিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হন। তবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দুঃসময়ে ধৈর্য ধারণ করা। খলিলকে তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। কিন্তু এহেন দুঃসময়ে অপেক্ষা করা ছাড়া তাঁর কোনো উপায় ছিল না। অন্যদিকে আবার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী জিয়াকে পছন্দ করতেন না। ফলে জিয়া দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত চিফ পদে আসীন হয়েও কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর রক্ষীবাহিনী অসহায় হয়ে পড়ে। এ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল দুঃসময়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে সর্বরকম সাহায্য করার জন্য।

কিন্তু চরম দুর্যোগ মুহূর্তে এ বাহিনী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অলিভ গ্রিন পোশাক পরিহিত এ বাহিনী তাদের কার্যক্রম ও নিষ্ঠুরতার জন্য সাধারণ জনগণের কাছে সমালোচিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে রক্ষীবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয় এবং এদের সৈনিক ও অফিসারদের সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করা হয়। এরাও সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের পদবি ছিল 'লিডার'। এদের অনেকেই ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ছিল। অফিসার হিসেবে আত্তীকৃত হলেও এদের শতকরা ৮০ জনই মুক্তিযোদ্ধা হলেও নিয়মিত সেনাবাহিনীর অফিসার হওয়ার যোগ্য ছিল না। দুজন উপপরিচালক ছাত্রলীগ নেতা আনোয়ারুল আলম শহীদ ও মো. সারওয়ারকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল র‍্যাঙ্ক দিয়ে সেনা সদরে অ্যাটাচ করা হলো। রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গলের সেনাসদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে কয়েকটি নতুন পদাতিক ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলা হলো।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ছিল একটি বৃহৎ পরাশক্তির ছত্রচ্ছায়ায় প্রণীত সুপরিকল্পিত প্রয়াস। এর টাইমিংও ছিল গভীর চিন্তাপ্রসূত। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস, দেশটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ও সামরিক বাহিনী সেদিন দিবসটি উদ্‌যাপনে ব্যস্ত থাকে। ঘটনা ঘটানো হয় শুক্রবারে। বাংলাদেশে এটি জুমার নামাজের দিন, ফলে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তিরা অনেকটা ছুটির মেজাজে থাকেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সংকটকালে প্রধান ভরসা রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান ১৫ আগস্টে সরকারি কাজে বিদেশে অবস্থান করছিলেন। ফলে অভ্যুত্থানকারীদের বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী ডিজিএফআইয়ের প্রধানরূপে মাত্র কয়েক দিন আগে নিয়োগ পেয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জামিল উদ্দিন। তিনি ব্রিগেডিয়ার আবদুর রউফের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ পদে ধাতস্থ হওয়ার আগেই অভ্যুত্থান ঘটে যায়। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু আক্রান্ত হওয়ার পরপরই জামিলকে ফোন করে তাঁর সাহায্য চান। জামিল সিভিল ড্রেসে তাঁর ব্যক্তিগত কার নিয়ে একাকী ৩২ নম্বরের উদ্দেশে ছুটে যান। বোঝাই যাচ্ছে তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারেননি। সোবহানবাগ এলাকায় পৌঁছালে অভ্যুত্থানকারী সৈনিকেরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

সারা দেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার কোনো প্রতিবাদ সেদিন দৃশ্যমান হয়নি। আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনসমূহের নেতারা গা ঢাকা দিয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম যুবনেতা কাদের সিদ্দিকী। তিনি কয়েক শ ছাত্র-যুবককে

সংগঠিত করে বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান নেন। ভারতের অভ্যন্তরে ঘাঁটি গেড়ে তাঁরা বাংলাদেশের সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ভারত সরকারও তাঁদের সীমিত সাহায্য দিতে সম্মত হয়। কিন্তু এবারের প্রেক্ষাপট একাত্তরের প্রেক্ষাপটের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন। একাত্তরে সাত কোটি মানুষ মুক্তিবাহিনীকে ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। কিন্তু পঁচাত্তরে সাধারণ মানুষ কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীকে সমর্থন-সহযোগিতা দেয়নি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে কাদের সিদ্দিকী তাঁর লোকজন নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থান নেন। কয়েক মাস পর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারেও পরিবর্তন আসে। মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কাদেরিয়া বাহিনীকে কোনো ধরনের সাহায্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। ফলে এ বাহিনী ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

খন্দকার মোশতাক মাসখানেকের মধ্যেই তাঁর অবস্থান মোটামুটি সংহত করেন। পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই তিনি বঙ্গভবনে মিটিং করতেন। কিন্তু ফারুক-রশিদ সেনাপ্রধানকে ব্যবহার করে রিমোট কন্ট্রোলে সেনাবাহিনীকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করেও সফল হতে পারছিলেন না। সেনাবাহিনীর বৃহৎ অংশ প্রথাগত চেইন অব কমান্ডের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অনুগত থাকে। বিদ্রোহী গ্রুপ বঙ্গভবনে ১২টি, রেসকোর্সে ১২টি এবং ক্যান্টনমেন্টে ১০টি ট্যাংক মোতায়েন করে সেনাবাহিনীতে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। এ ট্যাংক বাহিনী সেনাপ্রধান জিয়া, সিডিএস খলিলুর রহমান কিংবা প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী কারও নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তারা একমাত্র মেজর ফারুকের নির্দেশ মেনে চলত। ফারুক ও রশিদ সার্বক্ষণিকভাবে বঙ্গভবনে অবস্থান করে খন্দকার মোশতাককে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। ডালিম, নূর ও শাহরিয়ার রেডিও স্টেশনে অবস্থান করে নানা ধরনের বৈধ-অবৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।

ইতিমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিদ্রোহী অফিসারদের সেনাবাহিনীতে নিয়মিতরূপে আত্তীকরণ করা হয়। তাদের বিভিন্ন ইউনিটে পোস্টিং দেওয়া হলেও নিরাপত্তাহীনতার কারণে তারা সেখানে যোগদান করতে গড়িমসি করতে থাকে। অক্টোবরের শেষার্ধে সেনা সদরে প্রমোশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহী মেজরদের লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতির প্রশ্নে সিনিয়র অফিসাররা বিভক্ত হয়ে পড়েন। কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার দস্তগীর ও ব্রিগেডিয়ার আমজাদ বিদ্রোহীদের পদোন্নতির বিরোধিতা করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়ে রশিদ, ফারুক ও ডালিম লেফনেট্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এর আগেই খন্দকার মোশতাক অর্ডিন্যান্স জারি

করে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ও সৈনিকদের দায়মুক্তি (ইনডেমনিটি) প্রদান করেন, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো আদালতে তাঁদের বিচার করা যাবে না।

সামরিক বাহিনীতে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য রশিদ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম জি তাওয়াব চার বছর আগেই অবসর গ্রহণ করে জার্মানিতে বসবাস করছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন জার্মান নাগরিক। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রশিদ জার্মানিতে গিয়ে তাওয়াবকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তারপর নিয়ম ভঙ্গ করে তাঁকে দুটি তাৎক্ষণিক প্রমোশন দিয়ে এয়ার ভাইস মার্শাল র‍্যাঙ্কে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান, অর্থাৎ চিফ অব এয়ার স্টাফ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। বিমানবাহিনী প্রধান ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এ কে খন্দকারকে রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়।

স্মার্ট অফিসার তাওয়াব দ্রুত বিমানবাহিনীতে তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। বিমানবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা, তাওয়াব পাকিস্তান-প্রত্যাগত অফিসারদের আনুগত্য সহজেই পেলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ মদদে বিমানবাহিনীতে সিরাত মাহফিল, তাবলিগ ইত্যাদি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত হলো।

এদিকে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহী মেজরদের কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা গুজব প্রতিনিয়ত ডালপালা ছড়াতে লাগল। সদ্য ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া অফিসাররাও নানা ঠাট্টা-রসিকতায় মেতে ওঠে। একটি জোক সবচেয়ে বেশি মার্কেট পেল। রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করে মেজর রশিদ একটি ট্যাংকে চড়ে আগা মসিহ লেনে খন্দকার মোশতাকের বাড়িতে যান। মোশতাক বেরিয়ে এলেন। এরপর তাঁদের কথোপকথন :

'স্যার, প্রেসিডেন্ট মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।' রশিদ বললেন।

'ইন্না লিল্লাহ।' মোশতাক বললেন।

'আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' রশিদ বললেন।

'নাউজুবিল্লাহ।' মোশতাক (তাঁকেও হত্যা করা হবে ভেবে)।

'ঘাবড়াবেন না। আপনাকে আমরা প্রেসিডেন্ট বানাব।' রশিদ বললেন।

'আলহামদুলিল্লাহ।' মোশতাক বললেন।

'ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবেন?' রশিদ বললেন।

'মোহাম্মদ উল্লাহ।' মোশতাক বললেন।

'সেনাপ্রধান?' রশিদ বললেন।

'সফিউল্লাহ থাকুক।' মোশতাক বললেন।

দেশে রাজনৈতিক সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। বাকশাল ব্যবস্থা বাতিল হলেও সামরিক আইন জারি করার ফলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। মোশতাক বাকশালের পার্লামেন্ট বহাল রাখেন এবং শাসনব্যবস্থায় কোনোরূপ সংস্কার কিংবা পরিবর্তনে আগ্রহী ছিলেন না। আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের শাসন জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শীর্ষ পর্যায়ের নেতা, যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল না, এমন চারজনকেই মোশতাক কারারুদ্ধ করেন। এর আগে ১৯৭৩-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। ১১ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন এবং পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। খন্দকার মোশতাক বিদ্যমান পার্লামেন্টকে নিয়েই এগোনোর পক্ষপাতী ছিলেন। জনগণ একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করেছিল। কিন্তু মোশতাকের শাসনামলে তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না।

মাসখানেকের মধ্যেই বিদ্রোহী অফিসারদের কর্মকাণ্ডে সেনাবাহিনীতে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কয়েকজন অফিসার আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের রেডিও স্টেশনে ধরে এনে নির্যাতন করে এবং তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবিদুর রহমানকে নির্যাতনের পর কয়েকটি চেক লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। এ ছাড়া আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ আওয়ামী নেতারাও তাদের হাতে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হন। তোফায়েলের সহকারী একান্ত সচিব মিন্টুকে রেডিও স্টেশনে পিটিয়ে হত্যা করে তার লাশ গুম করে ফেলা হয়। সামরিক বাহিনীর অফিসারদের এ ধরনের চাঁদাবাজি ও হত্যাকাণ্ড তাদের 'বিপ্লবী' ভাবমূর্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে। দু-একজন অফিসার ও সৈনিক ৩২ নম্বরে রাষ্ট্রপতির বাড়ি থেকে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নেয়। সেনা সদরের অফিসার মেসে মেজর বজলুল হুদার কাছে শেখ কামালের স্ত্রীর একটি স্বর্ণমুকুট দেখে তরুণ অফিসাররা তাকে নানা প্রশ্ন করে, যার সদুত্তর সে দিতে পারেনি। বিদ্রোহী অফিসাররা মাঝেমধ্যে সরকারের সচিবদের বঙ্গভবনে ডেকে এনে নানা ধরনের নির্দেশ জারি করতে থাকে, যেটি সম্পূর্ণরূপে তাদের এখতিয়ারবহির্ভূত। ফলে সরকারি অফিসারদের মনেও একধরনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

১৫ আগস্টের ঘটনায় অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল

পাকিস্তান-প্রত্যাগত, কর্মরত অফিসারদের মধ্যে মাত্র তিনজন—রশিদ, ফারুক ও হুদা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। সেনাবাহিনীর মূল ভিত্তি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেনি। এটি ছিল বিদ্রোহীদের প্রধান দুর্বলতা। অবসরপ্রাপ্ত বিদ্রোহী অফিসাররা তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডে অবসরপ্রাপ্ত সার্ভিস কোর ও সিগন্যালের সৈনিকদের ব্যবহার করছিল, যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ছিল।

সেনা চেইন অব কমান্ড ভঙ্গকারী বিদ্রোহী অফিসারদের কর্মকাণ্ডে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান প্রায়শ বিব্রত ও অসন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস পেতেন না। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সবার জন্যই ভীতিকর ছিল। এ ছাড়া বিদ্রোহীরাই তাঁকে সেনাপ্রধান বানিয়েছেন, এ জন্য তিনি তাঁদের প্রতি কিছুটা দুর্বল ছিলেন। এঁদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য একসময় জিয়া উদ্যোগ নিলেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বঙ্গভবনে তিনটি ট্যাংক রেখে বাকি সব ট্যাংক সেনানিবাসে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু ফারুকের নেতৃত্বাধীন ট্যাংক রেজিমেন্ট এ আদেশ অমান্য করে। মুখরক্ষার খাতিরে সেনাপ্রধান সাত দিন পর এ আদেশ বাতিল করেন।

৪৬তম ব্রিগেডের কমান্ডার শাফায়াত জামিল একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সহজ-সরল, সৎ অফিসার ছিলেন। সৈনিকসুলভ গুণাবলির জন্য তিনি অফিসারদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে 'জেড' ফোর্সের একজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডাররূপে তিনি জিয়াউর রহমানেরও প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের চেইন অব কমান্ডে ফিরিয়ে আনার জন্য সেনাপ্রধান জিয়াকে কয়েকবার অনুরোধ করেন। তিনি এ কাজে ব্রিগেডকে ব্যবহার করার জন্য জিয়ার নির্দেশ কামনা করেন। কিন্তু জিয়া আরও চিন্তাভাবনা করার জন্য সময় নিতে চাচ্ছিলেন।

১৯ আগস্ট সেনা সদরে অনুষ্ঠিত সভায় শাফায়াত মোশতাককে উৎখাত করার হুমকি দেওয়ায় ফারুক, রশিদও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা আর্মার্ড কোরের সুদক্ষ অফিসার কর্নেল মান্নাফের নেতৃত্বে সাভারে একটি নতুন ব্রিগেড গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ ব্রিগেড গঠিত হলে কর্নেল শাফায়াত ও ৪৬ ব্রিগেডের একচ্ছত্র ক্ষমতা খর্ব হবে। সুতরাং শাফায়াতও নতুন ব্রিগেড গঠিত হওয়ার আগেই বিদ্রোহীদের ওপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বিদ্রোহী ইউনিট এবং ৪৬ ব্রিগেডের মুখোমুখি অবস্থানের ফলে ঢাকা সেনানিবাসে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হলো। যেকোনো মুহূর্তে যে এদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হতে পারে, সে বিষয়টি আর গোপন রইল না। উভয়

শিবিরই তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। আগে থেকেই সেনাপ্রধান জিয়া ও সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক ছিল। জিয়া খালেদকে মোটেও পছন্দ করতেন না এবং সেনাপ্রধান পদের জন্য একে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন। খালেদ আশঙ্কা করছিলেন যে জিয়া বিদ্রোহী অফিসারদের ব্যবহার করে তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে অবসরে পাঠিয়ে দিতে পারেন। খালেদ ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডাররূপে মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন। তরুণ অফিসারদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা ছিল। খালেদ ও শাফায়াত একই ব্যাটালিয়ন ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলে কমিশন লাভ করেছিলেন। একসময় খালেদ শাফায়াতকে অনুরোধ করেন বলপ্রয়োগ করে বিদ্রোহী অফিসারদের চেইন অব কমান্ডে ফিরিয়ে আনার জন্য। কর্নেল শাফায়াত যখন নিশ্চিত হলেন, সেনাপ্রধান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনে যাবেন না, তিনি চেইন অব কমান্ডে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের আহ্বানে সাড়া দিলেন। সৈয়দপুরের ৭২তম ব্রিগেড কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল নজমুল হুদা এবং রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানও আসন্ন অপারেশনে শাফায়াতকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সম্মত হলেন। হুদা ও নুরুজ্জামান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত এবং বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য ছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁদের কোনো দুর্বলতা ছিল না, কেবল সেনা চেইন অব কমান্ড ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁরা খালেদকে সাহায্য করতে রাজি হলেন।

কর্নেল শাফায়াতের প্রকাশ্য হুমকির কারণে বঙ্গভবনে অবস্থানকারী বিদ্রোহী অফিসাররা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। সেনাপ্রধান তাঁদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন না বুঝতে পেরে তাঁরা জেনারেল ওসমানীর শরণাপন্ন হন। খন্দকার মোশতাকের অনুরোধে ওসমানী অক্টোবরের মাঝামাঝি বঙ্গভবনে সিনিয়র সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সভা ডাকেন। সভায় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ওসমানী অফিসারদের খন্দকার মোশতাক ও তাঁর সরকারের প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশ দেন। এ ছাড়া কয়েক দিন পরপর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন সুবেদার মেজরকে ডেকে এনে মোশতাক সরকারকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে যারা এ সরকারের বিরোধিতা করবে, তারা ভারতীয় এজেন্ট এবং দেশের শত্রু।

বিদ্রোহীদের প্রধান শক্তি ছিল ট্যাংক বাহিনী এবং ট্যাংকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত রকেট। ট্যাংক ধ্বংস করার জন্য কর্নেল শাফায়াত আমাকে বিমানবাহিনীর সমমনা অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেন। স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত আলী বীর উত্তম

মুক্তিযুদ্ধে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের অ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে অংশ নেয়। আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে একদিন স্কোয়াড্রন লিডার বদরুল আলম বীর উত্তম ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ওয়ালীকে নিয়ে আমার বাসায় আসে। বিমানবাহিনী প্রধান তাওয়াব তাদের বিরুদ্ধে থাকবেন জেনেও চেইন অব কমান্ড উপেক্ষা করে তারা বিদ্রোহীদের দমনে জেট বিমান ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে সম্মত হলো।

২৯ অক্টোবর রাতে সেনাপ্রধান জিয়া কর্নেল শাফায়াতকে ডেকে বললেন যে মেজর শাহরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার স্ত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছেন। ট্যাংক রেজিমেন্টের বলে বলীয়ান হয়েই বিদ্রোহী অফিসাররা নানা ধরনের অপকর্ম করে যাচ্ছেন। তিনি ট্যাংকগুলো কীভাবে ঢাকার বাইরে নেওয়া যায়, এ বিষয়ে শাফায়াতের মতামত চাইলেন। শাফায়াত বললেন, চিফ নির্দেশ দিলে আগামী দুই দিনের মধ্যেই তিনি ট্যাংক বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। জিয়া তাঁকে আরও দু-তিন মাস অপেক্ষা করতে বললেন। শাফায়াত হতাশ হলেন।

পঁচাত্তরের আগস্টে ঢাকায় ৪৬ ব্রিগেডের অধীন তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ব্যাটল সিজনড, অর্থাৎ অভিজ্ঞ ইউনিটরূপে পরিগণিত ছিল। ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার (সিও) ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর রহমান বীর প্রতীক, ২য় ইস্ট বেঙ্গলের সিও ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজিজুর রহমান বীর উত্তম এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের সিও ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ জে এম আমিনুল হক বীর উত্তম। সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল সিওদের ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে ডেকে খোলাখুলিভাবে সেনাবাহিনীতে বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর অসন্তোষের কথা জানান। তিনি বলেন যে সেনা কর্মকর্তা হিসেবে সবাইকে দেশের সংবিধান মেনে চলা উচিত। বিদ্রোহী অফিসাররা প্রতিদিনই সেনা চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করছেন, যা একটি সেনাবাহিনীর জন্য খুবই ক্ষতিকর। বললেন হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ পেলেই তিনি ট্যাংক বাহিনী ও বিদ্রোহী অফিসারদের শায়েস্তা করবেন।

একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শাফায়াত অধীনদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সিওরা তাঁর নির্দেশ পালন ও তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বস্ত করলেন। আমি চাকরিজীবনে সব অবস্থায় কমান্ডিং অফিসারের প্রতি অনুগত ছিলাম এবং শাফায়াত জামিলকে তাঁর সৈনিকসুলভ গুণাবলির জন্য শ্রদ্ধা করতাম। ব্রিগেডের অন্য স্টাফ অফিসাররা যেমন ডিকিউ মেজর শাখাওয়াত হোসেন এবং স্টাফ ক্যাপ্টেন মুক্তিযোদ্ধা এ বি তাজুল ইসলামও কমান্ডারের সব নির্দেশ পালনে প্রস্তুত বলে জানালেন। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের

নিয়ে গঠিত নতুন পদাতিক ব্যাটালিয়ন ২২ ইস্ট বেঙ্গলের সিও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম গাফফার বীর উত্তমও বঙ্গভবন অভিযানে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সম্মতি দিলেন।

১ নভেম্বর সকালে জিএস খালেদ তাঁর অফিসে শাফায়াত ও ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানকে নিয়ে বৈঠকে বসে ৩ নভেম্বর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। অভিযানের লক্ষ্যসমূহ ছিল এ রকম :

১. সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

২. সংবিধানবহির্ভূত অবৈধ সরকারের অপসারণ।

৩. একজন নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির অধীনে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।

যেহেতু সেনাপ্রধান জিয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী নন, তাঁকে না জানিয়েই অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন সিজিএস খালেদ। সিডিএস মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান পাকিস্তান-প্রত্যাগত অফিসার। তাঁর অধীনে কোনো সেনা ইউনিটও নেই। তাঁর পক্ষে কোনো ধরনের অভিযান পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং তাঁকেও অন্ধকারে রাখা হলো।

অক্টোবরের মাঝামাঝি ২য় ইস্ট বেঙ্গলের সিও লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজিজ কর্নেল শাফায়াতের কাছে প্রস্তাব দিলেন, 'স্যার, বঙ্গভবনে ট্যাংকের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানো খুবই ঝামেলার কাজ। তার চেয়ে একটা কাজ করি, ফারুক বা রশিদ প্রায় প্রতিদিনই ক্যান্টনমেন্টের বাসায় আসে। আমি এদের একজনকে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যেই বলপ্রয়োগ করে আটক করব। তারপর তাকে জিম্মি করে আলটিমেটাম দিয়ে ট্যাংকগুলো সেনানিবাসে ফিরিয়ে আনব। কী বলেন?'

প্রস্তাব মন্দ নয়। শাফায়াত অনুমতি দিলেন আজিজকে। পরবর্তী তিন-চার দিন আমরা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি কখন এই অ্যামবুশ কার্যকর হয়। কিন্তু চার-পাঁচ দিন অপেক্ষার পর আজিজ এসে জানালেন, 'ভেবে দেখলাম, এই অপারেশন রিস্কি হবে, তাই পরিকল্পনা বাদ দিলাম।' খামাখাই একটি ব্যাটালিয়নকে সতর্কাবস্থায় রাখা হলো এক সপ্তাহ, কাজের কাজ কিছুই হলো না।

আড়াই মাস ধরে যে সংঘাতের কথা প্রতিদিনই সেনানিবাসে শোনা যেত, অবশেষে সেটি বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সেনাপ্রধানের অজান্তে এ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, এ কারণে অস্বস্তিতে ভুগছিলাম। আমি কমান্ডার শাফায়াতকে বললাম শেষবারের মতো চিফকে অ্যাকশনে যাওয়ার

অনুরোধ জানাতে। তিনি বললেন, 'অনেকবার বলেছি, তিনি ওদের (বিদ্রোহীদের) বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাবেন না।' আমি জিয়ার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলাম। ১ নভেম্বর সন্ধ্যায় আমি নিজেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গেলাম সেনাপ্রধানের মইনুল রোডের বাসায়। তিনি বাইরে অন্য প্রোগ্রামে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমাকে ২০ মিনিট সময় দিলেন। আমি তাঁকে জানালাম, 'আমার ব্রিগেড কমান্ডার দু-এক দিনের মধ্যেই বঙ্গভবনে অভিযান চালাবেন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি এ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিন। আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।' জিয়া বললেন, 'আমার কানেও এ কথা এসেছে। এখন অ্যাকশনে গেলে রক্তারক্তির আশঙ্কা আছে। আমি বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ডে ফেডআপ কিন্তু আরও অপেক্ষা করতে চাই।'

'স্যার, ১৯ আগস্টের মিটিংয়ের পর আপনি কর্নেল শাফায়াতকে বলেছেন ওয়েলডান, কিপ ইট আপ। এখন তিনি আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন।' আমি বললাম।

'তাকে বলো অপেক্ষা করতে, আই নিড মোর টাইম।'

জিয়া দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। শাফায়াত জামিল তাঁর প্রিয়পাত্র, মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অধীন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ছিলেন। শাফায়াতের দ্বারা তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, জিয়ার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে।

চেইন অব কমান্ড ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান

বঙ্গভবনের বিদ্রোহী অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলো। ২য় ইস্ট বেঙ্গলের দুজন সাহসী অফিসার মেজর নজরুল ইসলাম ও মেজর সাইদ আহমেদ এবং ট্যাংক রেজিমেন্টের মেজর নাসির বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে প্লাটুন কমান্ডাররূপে কর্মরত ছিলেন। কমান্ডার তাঁদের ঢাকায় ডেকে আনার জন্য ক্যাপ্টেন তাজকে কুমিল্লায় পাঠালেন। তাঁরা তিনজন সন্ধ্যার পরপরই ঢাকায় এসে পৌঁছালেন। ১ম ও ২য় ইস্ট বেঙ্গলের সিও এবং কয়েকজন কোম্পানি কমান্ডারকে যথাসময়ে ব্রিফ করা হলো। ৪ ইস্ট বেঙ্গলকে রিজার্ভ হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত ছিল। সিও লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিনুল হককে শেষ মুহূর্তেও জানানো হয়নি।

বঙ্গভবন অভিযান সম্পর্কে সেনানিবাসে প্রায় সব অফিসারই অবহিত ছিলেন, শুধু তারিখ ও সময়, অর্থাৎ এইচ আওয়ার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল

ছিলেন না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে ২ নভেম্বর সন্ধ্যার পর শাফায়াত গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে অংশগ্রহণকারী অফিসারদের আলাদাভাবে ব্রিফ করেন। অপারেশন প্ল্যান খুবই সিম্পল। রাত দুইটায় এইচ আওয়ারে বঙ্গভবনে ডিউটিরত ১ম ইস্ট বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি কাউকে কিছু না জানিয়ে সেনানিবাসে ফেরত চলে আসবে। ঢাকা সেনানিবাসের প্রধান সড়কে সিগন্যাল গেটের সামনে ২য় ইস্ট বেঙ্গল এবং স্টাফ রোডের পূর্ব প্রান্তে রেল ক্রসিংয়ে ২২ বেঙ্গল কয়েকটি অ্যান্টি ট্যাংক মাইন স্থাপন করবে, যাতে ল্যান্সারের কোনো ট্যাংক কিংবা ভারী যানবাহন সড়কে বের হতে না পারে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিমানবাহিনীর দুটি জেট বিমান ও হেলিকপ্টার রকেট সজ্জিত হয়ে বঙ্গভবন ও রেসকোর্সের ওপর চক্কর দেবে। কারওয়ান বাজার চৌরাস্তায় এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরি চৌরাস্তায় দুটি কোম্পানি অ্যান্টি ট্যাংক অস্ত্র রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে জেট বিমানের সামনে অসহায় ট্যাংক বাহিনী কোনো প্রতিরোধই গড়ে তুলতে সাহস করবে না এবং আত্মসমর্পণ ছাড়া বিদ্রোহীদের কোনো গতি থাকবে না। বঙ্গভবনে পদাতিক বাহিনীর কোনো অভিযান চালানোর প্রয়োজনই পড়বে না। আমি যেমন ধারণা করেছিলাম, বাস্তবেও তা-ই ঘটেছে।

৩ নভেম্বর ভোরে অভিযান শুরু হলো। প্রথমে কিছুটা বিপত্তি দেখা দিলেও তা অভিযানে কোনো প্রভাব ফেলেনি। ২য় বেঙ্গলের সিও কর্নেল আজিজ শেষ মুহূর্তে সাহস হারিয়ে ফেলেন এবং ব্যাটালিয়নে এসে দায়িত্বভার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। বিএমএ থেকে আসা ২য় বেঙ্গলের যুদ্ধকালীন সাহসী কোম্পানি কমান্ডার মেজর নজরুল গভীর রাতে ব্যাটালিয়নে গিয়ে ব্যাটালিয়নকে রণসাজে প্রস্তুত করেন এবং সিগন্যাল গেটের সামনে মাইন স্থাপন করেন। সিও না আসায় বিএমএ থেকে আসা অপর অফিসার সাইদ কুমিল্লায় ফিরে যান। ২২ ইস্ট বেঙ্গল লেফটেন্যান্ট কর্নেল গাফফারের নেতৃত্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং রেল ক্রসিংয়ে মাইন স্থাপন করে। ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের ক্যাপ্টেন শামসুদ্দিন তার ইউনিট থেকে মাইন সরবরাহ করে। রাত দুইটার সময় বঙ্গভবনের দুটি কোম্পানি মেজর ইকবালের নেতৃত্বে কয়েকটি বাস সংগ্রহ করে দ্রুত ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসে। কারওয়ান বাজার ও সায়েন্স ল্যাবরেটরি চৌরাস্তায় ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকেরা রিকয়েললেস রাইফেলসহ প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। একটি কোম্পানি তেজগাঁও এয়ারপোর্ট এলাকায় অবস্থান নেয়।

৩ নভেম্বরের অভিযানে চকমপ্রদ ভূমিকা গ্রহণ করে বিমানবাহিনীর কয়েকজন দুঃসাহসী পাইলট। তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে খালেদ ও শাফায়াত

ছাড়া কারোরই কোনো ধারণা ছিল না। তাওয়াবের মতো জাঁদরেল কমান্ডারও কিছুই আঁচ করতে পারেননি। একটি জেট বিমানকে রকেট সজ্জিত করা ও অন্যান্য প্রস্তুতি নিতে সাধারণত তিন ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু দুঃসাহসী বিমানসেনারা গভীর রাতে মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় নিয়ে দুটি ফাইটার জেট ও দুটি হেলিকপ্টারকে কমব্যাটের জন্য প্রস্তুত করেন। বৈমানিকেরা সাধারণভাবে সেনা অফিসারদের তুলনায় কম কথা বলেন এবং নীরবে দুঃসাহসিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ভোর চারটার দিকে মিগ-২৯ স্কোয়াড্রনের সামনে টারম্যাকের ওপর স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত আলী খান বীর উত্তম এবং স্কোয়াড্রন লিডার বদরুল আলম বীর উত্তম কয়েকজন পাইলট ও বিমান টেকনিশিয়ানকে বঙ্গভবনে রকেট আক্রমণের জন্য ব্রিফ করেন। ফলে এ খবর বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াবের গোচরে আসে। তাওয়াব নিজেও সিতারা-এ-জুরাত খেতাবধারী দুর্ধর্ষ পাইলট ছিলেন একসময়, অত্যন্ত স্মার্ট ও সাহসী অফিসার। তিনি বিদ্রোহীদের সমর্থক, সুতরাং অপারেশন ভন্ডুল করার জন্য নির্দেশ জারি করতে পারেন, এমন শঙ্কা দেখা দেয়। দুঃসাহসী পাইলট লিয়াকত ও ইকবাল রশিদ তাওয়াবকে খুঁজতে বের হন, সঙ্গে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের চারজন সশস্ত্র সৈনিক। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সংলগ্ন এয়ারফোর্স অফিসার কোয়ার্টারে পাঁচটি বাসভবনে সিনিয়র অফিসাররা বসবাস করছিলেন। তাঁরা উইং কমান্ডার সুলতান মাহমুদ বীর উত্তমের বাসায় ঢুকে তাওয়াবকে খুঁজতে গেলে মিসেস মাহমুদ বেরিয়ে আসেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর তাওয়াবের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে মিসেস অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ সময় লিয়াকতের সঙ্গী সৈনিকদের একজনের রাইফেল থেকে অসাবধানতাবশত এক রাউন্ড গুলি প্রচণ্ড শব্দে বেরিয়ে আসে। মিসেস মাহমুদ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বলে বসেন উল্টো দিকের কোয়ার্টারে খোঁজ করতে। বাসাটি তাওয়াবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এয়ার ভাইস মার্শাল আমিনুল ইসলামের। লিয়াকত ও ইকবাল রশিদ ওই বাসায় ঢুকলে আমিনুল ইসলাম বেরিয়ে আসেন এবং জানান যে এয়ার চিফ কোথায় তিনি তা জানেন না। লিয়াকত তাঁর অবস্থান জানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। হঠাৎ পাশের রুমের দরজা খুলে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করেন ইউনিফর্ম পরিহিত এয়ার চিফ তাওয়াব।

'স্যার, আপনি আমাদের সঙ্গে আর্মির অপারেশন কন্ট্রোলরুমে চলুন।' লিয়াকত বললেন।

'হোয়াট অপারেশন, আমি কেন যাব?' তাওয়াব বললেন।

'স্যার, ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি, জয়েন্ট ফোর্সেস অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। প্লিজ, সময় নষ্ট না করে আমাদের সঙ্গে চলুন।' লিয়াকত বললেন।

আমিনুল ইসলাম বলেন, 'এয়ার চিফ এভাবে যেতে পারেন না। প্রটোকল নেই, চিফের গাড়ি পর্যন্ত নেই।' ইকবাল রশিদ পিস্তল তাওয়াবের দিকে তাক করে বলেন, 'স্যার, আমার গাড়িতে উঠুন। হারি আপ।'

সশস্ত্র সৈনিকদের ভাবসাব দেখে একসময় তাওয়াব ইকবাল রশিদের গাড়িতে উঠে বসেন। তাঁকে সরাসরি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলে নিয়ে আসা হয়। আসার পথে তাওয়াব ইকবালকে বলেন, 'আমাকে রাষ্ট্রদূত করে বিদেশে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ো।'

মিগ স্কোয়াড্রনে আন ইউজুয়াল তৎপরতার খবর পেয়ে বিমানবাহিনী উপপ্রধান এয়ার কমোডর খাদেমুল বাশার বীর উত্তম সিভিল ড্রেসে টারমাকে ঢোকার উদ্যোগ নিলে মেজর ইকবালের সৈনিকেরা বাধা দেয়। এরা তাঁকে বন্দী করে ১ম ইস্ট বেঙ্গলে নিয়ে আসে। পাইলট ও টেকনিশিয়ানরা বিনা বাধায় উড্ডয়নের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

অভিযানে অংশগ্রহণকারী বিমানবাহিনীর পাইলটরা ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার বদরুল আলম, লিয়াকত আলী খান, ফ্লাইট লেফনেট্যান্ট সালাহউদ্দিন, জামাল উদ্দিন, ইকবাল রশিদ, ফ্লাইং অফিসার ফরিদুজ্জামান ও কাইয়ুম। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ওয়ালিউল হক খোন্দকার, আবদুল হক (আর্মামেন্ট), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মিজানুর রহমান এবং বিমানের পাইলট ক্যাপ্টেন কামাল মাহমুদ।

রাত দুইটায় ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল, আমি, স্টাফ ক্যাপ্টেন তাজ, সেনা সদরে কর্মরত ল্যান্সার মেজর নাসির উদ্দিন, ওসি মিলিটারি পুলিশ মেজর আমিনুল ইসলাম ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের অফিস ব্লকে গিয়ে অপারেশন হেডকোয়ার্টার স্থাপন করি। পূর্বপরিকল্পনামাফিক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানেরও রাত দুইটায় ৪র্থ বেঙ্গলে আসার কথা। তাঁরা আসেন ভোর পাঁচটার দিকে, ব্রিগেডের সেনা মুভমেন্ট শুরু হওয়ার পর। ডিকিউ মেজর সাখাওয়াত রাতে অফিসে আসার নির্দেশ পেয়েও সকালে সুবিধাজনক সময়ে হেডকোয়ার্টারে আসেন। ৭২ ব্রিগেডের একজন তরুণ অফিসার লেফটেন্যান্ট কাদের ভোর চারটার দিকে ৪র্থ বেঙ্গলে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের সিও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোমেন অত্যন্ত সহজ-সরল ও দক্ষ অফিসার ছিলেন। ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানকালে তিনি ছুটিতে ছিলেন। তাঁর অবর্তমানেই মেজর ফারুক ট্যাংক বাহিনী নিয়ে অভিযান চালান। চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করার কারণে মোমেন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর অধীন সৈনিকেরা হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করায় তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর রেজিমেন্ট মেজর ফারুকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সৈনিকেরা নানা কারণে ফারুকের অন্ধ ভক্ত ছিল। গভীর

রাতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোমেনকে ৪র্থ বেঙ্গলে আসতে বলা হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসেন।

রাত আড়াইটায় ১ম ইস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লাহ একটি প্লাটুনসহ সেনাপ্রধান জিয়ার বাসভবনে যান তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার জন্য। ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকেরাই চিফের বাসায় গার্ড ডিউটিতে নিয়োজিত ছিল। হাফিজউল্লাহ বিনা বাধায় জিয়ার ড্রয়িংরুমে ঢোকেন, তিনি জেগেই ছিলেন। বঙ্গভবন থেকে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি চলে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল রশিদ সেনাপ্রধানকে ফোন করেন এবং সেনা মুভমেন্টের কারণ জানতে চান। জিয়া এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানালেন।

হাফিজউল্লাহ তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বলেন, 'স্যার, আমরা ব্রিগেড কমান্ডারের নির্দেশে বিদ্রোহী অফিসারদের দমন করার জন্য অভিযান পরিচালনা করছি। আপনি ড্রয়িংরুমে বসে চুপচাপ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন, কিন্তু কাউকে কোনো নির্দেশ দেবেন না।' জিয়া নীরবে তাঁর সঙ্গে ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে থাকেন। হাফিজউল্লাহ ড্রয়িংরুমের দুটি টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ফেলেন, যাতে চিফ কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন। কিন্তু তাঁর জানা ছিল না যে ড্রয়িংরুমের সিভিল টেলিফোনের একটি প্যারারাল লাইন বেডরুমে রয়েছে। জিয়া বেডরুমের টেলিফোন সেটটি ব্যবহার করে লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাহের এবং আরও দু-একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

রাত তিনটার দিকে ৪৬ ব্রিগেডের সিগন্যাল অফিসার মেজর মুসা কমান্ডারের নির্দেশে গুলিস্তানসংলগ্ন সেন্ট্রাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জে প্রবেশ করে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে টেলি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। তাঁকে সহায়তা করেন সিগন্যাল অফিসার মেজর লিয়াকত।

মেজর ইকবাল বঙ্গভবন থেকে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকদের নিয়ে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফারুক ও রশিদের নেতৃত্বে বিদ্রোহী অফিসার এবং ল্যান্সার সৈনিকেরা তৎপর হয়ে ওঠে। বঙ্গভবন ও রেসকোর্সের ট্যাংকসমূহ পদাতিক বাহিনীর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। ক্যান্টনমেন্টে সিগন্যাল গেটসংলগ্ন ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের অফিস এলাকায় ট্যাংক পার্কে দুটি ট্যাংক অবস্থান করছিল। ট্যাংকসমূহ এবং ল্যান্সার অফিসারদের নিষ্ক্রিয় করার জন্য মেজর নাসিরকে ল্যান্সার অফিসে পাঠানো হলো। উত্তেজিত ল্যান্সার অফিসার এবং সৈনিকেরা ফারুকের নির্দেশে তাঁকে কোয়ার্টার গার্ডে বন্দী করে রাখে।

ফাইটার জেট ট্যাংক বহরের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কার্যকর অস্ত্র। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তেজগাঁও বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে দুটি মিগ-২১

ও একটি হেলিকপ্টার রকেট সজ্জিত হয়ে বঙ্গভবন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনের ওপর নিচু ডাইভ করলে ট্যাংক বাহিনী হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। পাইলটরা ট্যাংকের ওপর রকেট নিক্ষেপ করার অনুমতি চাইলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ তাদের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। তাঁর নির্দেশ ছাড়া ফায়ার করা যাবে না বলে উত্তেজিত পাইলটদের নিবৃত্ত করেন।

সকালে মিগ ও হেলিকপ্টারের আক্রমণাত্মক ভূমিকা দেখার পর ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন পদবির অফিসাররা ঝাঁকে ঝাঁকে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলে এসে সিজিএস এবং ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডারকে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। এঁদের কাউকে কাউকে ভালো পোস্টিং পাওয়ার জন্য বঙ্গভবনে ফারুক-রশিদের কাছে তদবির করতেও দেখা গিয়েছিল। রাতে ফোন করে যাঁদের আনা যায়নি, সকাল হতেই তড়িঘড়ি করে তাঁরা অপারেশন হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হন। ২য় বেঙ্গলের মেজর নজরুল তাঁর সিওকে নিয়ে উপস্থিত হন এবং কমান্ডার শাফায়াতকে বলেন যে রাতে নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য তাঁর সিও খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত। বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এ ব্যাপারে কমান্ডারের কাছে সুপারিশ করার জন্য নজরুল আমাকেও পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। অভিযানের প্রারম্ভে রাতে ৪র্থ বেঙ্গলে কমান্ডারসহ আমরা মাত্র চারজন অফিসার উপস্থিত ছিলাম। সকালে সুযোগসন্ধানীদের ভিড় এতই বেড়ে গেল যে আমরা জুনিয়র অফিসাররা অফিস কক্ষে বসার চেয়ারই পাচ্ছিলাম না।

সকাল থেকেই ৪র্থ বেঙ্গলের সিওর অফিসে জেঁকে বসেছেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ, শাফায়াত জামিল ও সেনা সদরের সিনিয়র অফিসাররা। নেভি চিফ রিয়ার অ্যাডমিরাল এম এইচ খানও এসে উপস্থিত হলেন। আমি রুমের বাইরে সবুজ লনে এসে একাকী একটি চেয়ারে বসে অফিসারদের আনাগোনা দেখছিলাম। সকাল নয়টার দিকে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন ফ্লাইং স্যুট পরা স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশিদ, সঙ্গে বিমানবাহিনী প্রধান তাওয়াব। তাওয়াবকে একটু দূরে দণ্ডায়মান রেখে লিয়াকত আমার কাছে এসে নিচু স্বরে বলেন, 'এয়ার চিফকে ধরে নিয়ে এসেছি, বহুত ঝানু মাল। একে আটকে রাখা এখন থেকে তোমার দায়িত্ব, আমি চললাম।' বলেই তিনি দ্রুত গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি এয়ার চিফকে স্যালুট করে আমার চেয়ারে বসালাম এবং একটি চেয়ার আনিয়ে পাশাপাশি বসলাম। তাওয়াব কিছুটা বিড়ম্বিত কিন্তু বাইরে ভাব দেখাচ্ছেন যেন কিছুই হয়নি, সবকিছু ঠিক আছে। আমি তাঁকে খালেদের অফিসরুমে ঢোকানোর আগে তাঁর মনোভাব বোঝার জন্য সেনা অভিযান

সম্পর্কে কিছু কথা জানালাম, 'বিদ্রোহী অফিসাররা অনেক বাড়াবাড়ি করেছে, তাদের চেইন অব কমান্ডে আনার জন্যই সিজিএস অভিযান পরিচালনা করছেন।'

তাওয়াব বললেন, 'তাই নাকি! আমি তো কিছুই জানতাম না। ভালোই তো, এখন কী করতে চাও তোমরা?'

'সিজিএস একটু পরই আপনাকে ব্রিফ করবেন। আপাতত এখানেই বসুন।' তাওয়াব আশপাশে তাকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন। একটু পর আমি একটি টেলিফোন কল ধরার জন্য অ্যাডজুট্যান্টের রুমে ঢুকলে তাওয়াব উঠে সোজা খালেদের অফিসরুমে চলে যান, পিছু পিছু ঢোকেন ইকবাল রশিদ। খালেদ জানেন না যে তাওয়াবকে ধরে আনা হয়েছে। ভেবেছেন উনি নিজেই এসেছেন, 'ওয়েল কাম চিফ, আসুন, আপনি আসায় কোরাম পূর্ণ হলো, বসুন। নেভি চিফ ইজ অলরেডি হিয়ার।' খালেদ দাঁড়িয়ে তাওয়াবকে স্বাগতম জানালেন। তাওয়াব বুঝে গেলেন তিনি আর বন্দী নন। ইকবাল রশিদের দিকে কঠিন দৃষ্টি হেনে খালেদকে বললেন, 'হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং?'

আমি টেলিফোন কল সেরে এসে দেখি তাওয়াবের চেয়ার খালি, তিনি রুমের ভেতরে। ৪র্থ বেঙ্গলের সিওর রুমটি ছোট, সেখানে গাদাগাদি করে সিনিয়র অফিসাররা বসে আছেন।

এমনকি ব্যাটালিয়নের সিও আমিনুল হকও রুমের বাইরে বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছেন। তিনি একটু অসন্তুষ্ট, তাঁকে না জানিয়েই ৪র্থ বেঙ্গলে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়েছে।

৪র্থ বেঙ্গলের সিওর ঘরে নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে আলাপ করছেন সিজিএস খালেদ, শাফায়াত, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল কর্নেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, ডাইরেক্টর মিলিটারি অপারেশন লেফটেন্যান্ট কর্নেল নুরুদ্দিন, লগ এরিয়া কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আবদুর রউফ, রক্ষীবাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান, ডাইরেক্টর সিগন্যালস কর্নেল নাজিরুল আজিজ চিশতী, ডাইরেক্টর প্রশিক্ষণ কর্নেল মালেক। সকালবেলায় ৭২তম ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল নজমুল হুদা খালেদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। নৌবাহিনী প্রধান আগেই এসেছেন, সর্বশেষ আবির্ভূত হলেন বিমানবাহিনী প্রধান তাওয়াব।

খালেদ মোশাররফ চলমান অপারেশন সম্পর্কে উপস্থিত অফিসারদের সংক্ষেপে ব্রিফ করেন। বিদ্রোহী অফিসারদের দমন করে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড পুনরুদ্ধার করাই এ অপারেশনের লক্ষ্য বলে জানান। উপস্থিত অফিসাররা তাঁকে এ ব্যাপারে সমর্থন জানান।

খালেদ জানালেন, তিনি রক্তপাত চান না, বিদ্রোহী অফিসাররা যদি

আত্মসমর্পণ করে সেনানিবাসে ফিরে আসে, তাহলে অভিযান চালানো হবে না। তাওয়াব বন্দী হিসেবে আনীত হলেও তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি বললেন, 'আমি বিদ্রোহী অফিসার এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নরমাল করার চেষ্টা করে দেখি।' কক্ষের টেলিফোন সেটে তাওয়াব প্রথমে রশিদ, ফারুক ও খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে পালাক্রমে আলাপ করেন। রশিদ ও ফারুক ঘাবড়ে গেলেও বাইরে সাহসীভাব দেখালেন এবং আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান। খালেদের নির্দেশে তাওয়াব মোশতাককে বলেন, 'স্যার, আপনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল থাকবেন, কোনো অসুবিধা নেই। তবে ট্যাংকসমূহ অবিলম্বে সেনানিবাসে ফিরে আসতে হবে, বিদ্রোহী অফিসারদেরও চেইন অব কমান্ড মানতে হবে।' তাওয়াবের কথা বলার ধরন ও কৌশল দেখে আমরা সবাই ইমপ্রেস হলাম। ফারুক-রশিদের সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক টেলি সংলাপ চলার পর খালেদ বঙ্গভবনে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য একটি টিম পাঠালেন। টিমের সদস্য ব্রিগেডিয়ার আবদুর রউফ, কর্নেল চিশতী ও কর্নেল মালেক। এ টিম বঙ্গভবনে পৌঁছে বিদ্রোহী অফিসার ও খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে আলোচনা করে। মোশতাকের অনুরোধে জেনারেল ওসমানীও এসে আলোচনায় যোগ দেন। বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর গত্যন্তর না দেখে বিকেলের দিকে বিদ্রোহীরা নমনীয় হলেন। তাঁরা জানালেন তাঁরা বিদেশে চলে যাবেন এবং সেফ প্যাসেজ দাবি করলেন।

এম জি তাওয়াব বিদ্রোহীদের ব্যাংককে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিমান প্রস্তুত করে কূটনৈতিক মহলে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বেলা দুইটার দিকে বাসভবনে অন্তরীণ জেনারেল জিয়া সেনাপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। জিয়ার স্থলে সেনাপ্রধান পদে খালেদ মোশাররফকে নিয়োগ প্রদানের জন্য খন্দকার মোশতাকের কাছে দাবি জানায় আলোচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম। মোশতাক জানালেন যে তিনি জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে আলাপ করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

সকালে অভিযান শুরু হওয়ার পরপরই শাহবাগ রেডিও স্টেশনে মোতায়েন সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈনিকেরা ৪৬তম ব্রিগেড কমান্ডারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। জানিয়ে দেন খালেদ মোশাররফের যেকোনো বার্তা দেশব্যাপী প্রচার করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত। খালেদ দিনভর বিদ্রোহী অফিসার ও মোশতাকের সঙ্গে টেলিফোন সংলাপে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে রেডিওতে কোনো বক্তব্য দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। ফলে সারা দিন বেতার সম্প্রচার বন্ধ থাকল এবং জনগণ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করে।

রাত ১১টার সময় একটি ফোকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানযোগে ফারুক, রশিদ, ডালিম, শাহরিয়ার, নূরসহ বিদ্রোহী অফিসাররা এবং মোসলেমসহ জেসিও, এনসিওরা ব্যাংককের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এঁদের পরিবারও সঙ্গে যায়। তেজগাঁও এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা করে রিফুয়েলিংয়ের জন্য বিমানটি চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে এবং কিছুক্ষণ বিরতির পর ব্যাংককের উদ্দেশে উড়াল দেয়। রাত ১০টার দিকে কর্নেল হুদা খালেদ মোশাররফকে ফোন করে বিমানটিকে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানান। সৈয়দপুরে অবতরণ করার পর তিনি খুনি মেজরদের হত্যা করার অনুমতি চান। কিন্তু খালেদ এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের জন্য অনুমতি দেননি এবং বিদ্রোহীরা বিনা বাধায় ব্যাংকক পৌঁছে যান।

২ নভেম্বর রাতে একটি ভয়াবহ, নৃশংস ঘটনা ঘটে; যা খালেদ এবং অভিযানে অংশগ্রহণকারী অফিসাররা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। ২ নভেম্বর দিবাগত রাত দুইটায় মেজর ইকবালের নেতৃত্বে বঙ্গভবন থেকে দুটি কোম্পানি চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী অফিসাররা পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের রিসালদার মোসলেমের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র সেনাদল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠান। এঁরা অস্ত্রসহ জেলের ভেতরে ঢুকতে চাইলে জেল কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়। এ সময় প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক নিজেই টেলিফোনে জেলারকে নির্দেশ দেন মোসলেম ও সঙ্গীদের জেলের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিতে। জেলের ভেতরে ঢুকে ল্যান্সার সৈনিকেরা জেলের একটি কক্ষে চারজন শীর্ষ পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এবং ভবিষ্যৎ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি করার জন্য খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ৩ নভেম্বর সারা দিন ও রাতে এ ভয়াবহ ঘটনার বিন্দুবিসর্গ খালেদ মোশাররফ কিংবা অভিযানে অংশগ্রহণকারী কেউ জানতে পারেননি।

পরদিন ৪ নভেম্বর কর্নেল শাফায়াত জামিল এবং ৪৬ ব্রিগেডের অফিসাররা ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলে অবস্থান করছিলেন। বিদ্রোহীরা দেশত্যাগ করায় সবাই উৎফুল্ল। সকাল ১০টায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ই এ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ৪র্থ বেঙ্গলের সিওর রুমে গেলেন। জনাব চৌধুরী জানালেন যে ২ নভেম্বর রাতে জেলখানায় চারজন সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতাকে ল্যান্সার বাহিনী হত্যা করেছে। এ সংবাদ শুনে সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ খন্দকার মোশতাককে কিছুদিন রাষ্ট্রপতি পদে বহাল

রাখতে চেয়েছিলেন। জেল হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়েই কর্নেল শাফায়াত ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বললেন, 'আপনি এখনই বঙ্গভবনে গিয়ে খন্দকার মোশতাককে অপসারণ করুন। আমরা আর এক মুহূর্তও তাঁকে এ পদে দেখতে চাই না।' খালেদ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গভবনে গেলেন। খুনি অফিসাররা দেশ ত্যাগ করার সময় মোশতাকও তাঁদের সঙ্গে বিদেশে যেতে চাইলেন। কিন্তু জেনারেল ওসমানীর অনুরোধে ও ভরসায় তিনি দেশেই থেকে গেলেন। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী একজন অফিসার, ২য় ফিল্ডের মেজর মহিউদ্দিনও কোনো কারণবশত দেশেই থেকে যান।

খন্দকার মোশতাক ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ। খালেদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর ধারণা জন্মেছে, তিনি রাষ্ট্রপতি পদেই বহাল থাকবেন। খালেদ ও বাহিনীপ্রধানেরা তাঁকে রাষ্ট্রপতিরূপে সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করেই চলেছেন। তদুপরি জেনারেল ওসমানী সামরিক বাহিনীতে সবারই শ্রদ্ধার পাত্র, তিনিও মোশতাকের পক্ষে রয়েছেন। সুতরাং চতুর মোশতাক বঙ্গভবনে আসা খালেদ ও দুজন বাহিনীপ্রধানকে তেমন পাত্তা দিচ্ছিলেন না। অপর দিকে জেনারেল জিয়া পদত্যাগ করায় খালেদ ভাবলেন, তাঁর সেনাপ্রধান হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার। খুনি অফিসারেরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে বিদেশে চলে যাওয়ার কারণে খালেদও নির্ভার, তাঁরও কোনো তাড়াহুড়ো নেই। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকারী সেনা কর্মকর্তারা ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছেন, কেন মোশতাককে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অপসারণ করা হচ্ছে না। এদিকে বাংলাদেশ বেতারে দ্বিতীয় দিনের মতো সম্প্রচার বন্ধ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

বিদ্রোহীদের দেশত্যাগের পর ক্যাপ্টেন নজরুল ও ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদের নেতৃত্বে ২য় ইস্ট বেঙ্গলের দুটি কোম্পানি বঙ্গভবনে মোতায়েন করা হয়েছে। বিকেল পাঁচটার দিকে মেজর ইকবাল বঙ্গভবন থেকে আমাকে ফোন করেন। তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে জানতে চান, মোশতাককে কেন সরানো হচ্ছে না, খালেদ ও দুই বাহিনীপ্রধান মোশতাককে কেন বাগে আনতে পারছেন না। আমি কর্নেল শাফায়াতকে জুনিয়র অফিসারদের ক্ষোভের কথা জানালাম। শাফায়াত দুজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওনা দিলেন।

সন্ধ্যা ছয়টায় শাফায়াত বঙ্গভবনে ঢুকলে মেজর ইকবাল, মেজর দিদার এবং অন্য অফিসাররা মোশতাককে অপসারণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। খালেদ এবং দুই বাহিনীপ্রধান রাষ্ট্রপতির সচিবের কক্ষে কয়েক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছিলেন। মোশতাক ক্যাবিনেট মিটিং করছেন দীর্ঘ সময় ধরে। খালেদ মোশাররফ দুই বাহিনীপ্রধানকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাবিনেট রুমের কাছে

গেলে মোশতাক করিডরে বেরিয়ে আসেন। খালেদ অত্যন্ত বিনীতভাবে রাষ্ট্রপতিকে বলেন, 'স্যার, অনেকক্ষণ ধরে আমরা অপেক্ষা করছি, আপনার সঙ্গে আমাদের জরুরি আলাপ আছে।'

মোশতাক উত্তেজিত হয়ে উচ্চ স্বরে বলে ওঠেন, 'I have seen many Brigadiers and generals of Pakistan Army in the Past (আমি অতীতে অনেক ব্রিগেডিয়ার ও জেনারেল দেখেছি)। I am busy in cabinet meeting. I know what to do.' মোশতাকের উচ্চ কণ্ঠের বক্তব্য শুনে করিডরে দণ্ডায়মান মেজর ইকবালের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। চারজন সৈনিকসহ তিনি সামনে এগিয়ে এসে একে ৪৭ সাবমেশিন গান কক করে মোশতাকের দিকে তাক করেন এবং বলে ওঠেন, 'You have seen Brigadiers and generals of Pakistan Army, now you will see majors of Bangladesh Army.' (আপনি পাকিস্তানি বাহিনীর জেনারেলদের দেখেছেন। এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজরদের দেখবেন)। ইকবাল ও সৈনিকদের রুদ্রমূর্তি দেখে মোশতাক ভয়ে চুপসে গেলেন। শাফায়াত জামিল এগিয়ে এসে মোশতাক ও ইকবালের মাঝামাঝি দাঁড়ালেন এবং মোশতাককে ক্যাবিনেট রুমে ঢুকিয়ে দিলেন। জেনারেল ওসমানী বাগ্‌বিতণ্ডা শুনে করিডরে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, 'Shafaat save the situation, Don't repeat Burma.' শাফায়াত ইকবালকে শান্ত করে ক্যাবিনেট রুমের ভেতরে ঢুকলেন। সিডিএস মেজর জেনারেল খলিলকে তিনি বলেন, 'জেলখানায় চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই জেনেছেন, কিন্তু আমাদের কিছুই জানাননি। দেশের অশান্ত পরিস্থিতিতে আপনি নিষ্ক্রিয়। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।' খলিল মাথা নিচু করে বসে থাকলেন।

শাফায়াত খন্দকার মোশতাককে বলেন, 'আপনি একজন খুনি। আপনার নির্দেশে জেলহত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। ১৫ আগস্টের রাষ্ট্রপতি হত্যাকাণ্ডেও আপনি জড়িত। অতএব, এখনই রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করুন। পদত্যাগের আগে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ করুন।'

কর্নেল শাফায়াত, মেজর ইকবাল ও সৈনিকদের রুদ্রমূর্তি দেখে মন্ত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে টেবিলের নিচে ঢুকে পড়েন। দু-একজন পানি পানি বলে চিৎকার করছিলেন। তাঁদের এক বালতি পানি এনে দেওয়া হলে সেখানে গ্লাস ডুবিয়ে কয়েকজন পানি পান করেন। জেনারেল ওসমানী পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য শাফায়াত ও ইকবালকে ক্যাবিনেট রুম থেকে বাইরে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেন। শাফায়াত ও ইকবাল সৈনিকদের

নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কর্নেল মালেককে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

অল্প সময়ের ব্যবধানে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য কাগজপত্র পেশ করা হলো। সেনাপ্রধানের পদ থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্কে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ করে আদেশ জারি করেন খন্দকার মোশতাক। এ ছাড়া জেল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার জন্য বিচারপতি আহসান উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। শান্ত-সুবোধ বালকের মতো অবশেষে নিজ পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। এরপর তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্টের সুইটে নিয়ে রাখা হয়। চারজন মন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান ও নুরুল ইসলাম মনজুরকে জেল হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের সিও লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিনুল হককে সেনাপ্রধানের পিএস হিসেবে বদলি করা হয় এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল গাফফারকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। জেলহত্যার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য জেল সুপারকে বঙ্গভবনে তলব করা হয় এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিনুল হক তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করেন। টেপকৃত রেকর্ড ৪৬ ব্রিগেডে আমার অফিসের স্টিল আলমারিতে রেখে দেওয়া হয়, পরবর্তীকালে এটি সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়।

রাত ১০টার দিকে আমি অবস্থা দেখার জন্য বঙ্গভবনে গেলাম। ১৫ আগস্টের পর ওটাই আমার প্রথমবার সেখানে যাওয়া। গিয়ে দেখি পরিবেশ শান্ত, মোশতাক পদত্যাগ করেছেন, খালেদ নতুন সেনাপ্রধান। অর্থাৎ ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান পুরোপুরি সফল হয়েছে। বিনা রক্তপাতে, একটি গুলিও ছুড়তে হয়নি কোথাও। রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ে গুঞ্জন চলছে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ সম্পর্কে। এখানে দেখা হলো দুজন সাবেক সিএসপি অফিসার এজাজুল হক এমরান এবং ড. কামাল সিদ্দিকীর সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় এজাজ আমার সহপাঠী এবং কামাল এক বছরের জুনিয়র ছিল। আমাকে দেখে তারা ছুটে এল। জানতে চাইল রাষ্ট্রপতি কে হবেন? আমি জানালাম, 'এসব সিনিয়ররা ঠিক করবেন।' তোমাদের মতামত কী? একজন যোগ্য ব্যক্তির নাম বলো, আমি জিজ্ঞেস করলাম। তারা একজন অবসরপ্রাপ্ত সিএসপি অফিসারের নাম উল্লেখ করে। কিছুক্ষণ পর কর্নেল শাফায়াত আমাদের রুমে এসে বসলেন। একসময় সেখানে এলেন চিফ সেক্রেটারি প্রবীণ আমলা জনাব শফিউল আযম। শাফায়াত তাঁকে বললেন, 'স্যার, রাষ্ট্রপতি পদের জন্য একজন দক্ষ, যোগ্য ব্যক্তির নাম বলুন।'

'পাশের রুমে আমার কয়েকজন সিনিয়র কলিগ বসে আছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আপনাকে জানাব।' বলে শফিউল আযম চলে গেলেন। মিনিট দশেক পর তিনি ফিরে এসে একটি চিরকুট শাফায়াতের হাতে দিলেন। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যোগ্য তিনজন ব্যক্তির নাম রয়েছে সেখানে—এক. বিচারপতি মোরশেদ, দুই. বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী, তিন. শফিউল আযম। একেই বলে সুযোগসন্ধানী আমলা!

গভীর রাতে বাসায় ফিরে এলাম। বিনা রক্তপাতে ব্রিগেডের অভিযান সফল হওয়ায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের ভ্যাগাকাশে নতুন দুর্যোগের মেঘ ঘনীভূত হতে শুরু হয়েছে। সেনানিবাসে খালেদ মোশাররফসহ সব অফিসার তখন চেইন অব কমান্ড পুনরুদ্ধার হয়েছে ভেবে আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন। ক্যান্টনমেন্টের বাইরে সারা দেশে জনগণের মনোভাব নিয়ে তাঁরা চিন্তাগ্রস্ত নন। চিন্তা করার মনমানসিকতাও যেন তাঁদের নেই। তাঁদের কাছে ক্যান্টনমেন্টই বাংলাদেশ। রাজনৈতিক ধ্যানধারণার দিক থেকে অপরিপক্ব, দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন একজন সেনাধ্যক্ষ খালেদ মোশাররফ একের পর এক ভুল করেই চলেছেন। দুই দিন ধরে রেডিও স্টেশন বন্ধ থাকায় দেশে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর রেডিওতে গিয়ে ভাষণ দেননি বিজয়ী সেনাপতি, এমন ঘটনা কোথাও ঘটেনি! সেটিই ঘটল বাংলাদেশে। কেন সরকার ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা হলো, এ বিষয়ে কোনো ঘোষণাই দিলেন না অভ্যুত্থানের নেতা খালেদ মোশাররফ। এত বড় রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হলো কিন্তু জনগণকে সে সম্পর্কে কিছুই জানানো হলো না! একেই বলে অবিমৃষ্যকারিতা। ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের লক্ষ্যসমূহ রেডিও মারফত জনগণকে জানানো হলে জনগণ হয়তো খালেদকে অভিনন্দন জানাত। কিন্তু জনগণকে অন্ধকারে রাখার কারণে জনমত তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেল।

চক্রান্তের আরেক অধ্যায়

৫ নভেম্বর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবি খালেদ মোশাররফকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। ৪ নভেম্বর আওয়ামী লীগের একটি মিছিল কয়েকটি রাস্তা প্রদক্ষিণ করে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন খালেদ মোশাররফের মা এবং ভাই রাশেদ মোশাররফ। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পাঠ করে জনমনে ধারণা

হওয়া স্বাভাবিক যে ৩ নভেম্বরের খালেদের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান আওয়ামী লীগকে আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানোর জন্যই সংগঠিত হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ মিছিল রাজপথে নামানোর জন্য দুই সপ্তাহ আগেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। খালেদ এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তা হারানোর কারণেই ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে তারা সারা দেশে কোনো প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। বাকশালের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা দেখে জনমত খালেদের বিরুদ্ধে চলে গেল। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিমূর্ত ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী নয়, তারা সোজা হিসাব বোঝে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী সরকারকে তারা মনে করেছে ভারতপন্থী। এ সরকারকে যারা উৎখাত করেছে, অর্থাৎ ফারুক-রশিদ গং, তারা নিশ্চয় ভারতবিরোধী। আবার ভারতবিরোধী মোশতাক গংকে যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অপসারণ করেছে, সাধারণ মানুষের চোখে তারা হলো ভারতপন্থী। এটা হলো আমজনতার সোজা হিসাব!

এ সোজা হিসাবকে ভুল প্রমাণ করে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকে জাতীয়তাবাদী, জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপরূপে উপস্থাপন করতে পারতেন একজন ব্যক্তি, তিনি অভ্যুত্থানের নেতা খালেদ মোশাররফ। রেডিও-টেলিভিশনে ভাষণ দিয়ে, পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে তিনি জনগণকে বোঝাতে পারতেন যে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য তিনি অভ্যুত্থান করেননি। তাঁর মূল লক্ষ্য সংবিধান সমুন্নত রাখা, জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব নতুন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা এবং একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে জিম্মি সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড পুনরুদ্ধার করা। প্রথম দিনেই, অর্থাৎ ৩ নভেম্বর, জাতীয় সংসদ ভেঙে দিলেই তিনি নিরপেক্ষ ব্যক্তিরূপে জনসমক্ষে প্রতিভাত হতেন। সংসদ তিনি ভেঙে দিলেন ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

রেডিও তিন দিন কার্যত বন্ধ রাখায় এবং অভ্যুত্থানের লক্ষ্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত না করায় সাধারণ মানুষ একে ভারতীয় ষড়যন্ত্র বলে ধারণা করে বসে। বাংলাদেশে বহু মানুষ, এমনকি শিক্ষিতজনও ষড়যন্ত্রতত্ত্বে বিশ্বাসী। দেশে যা কিছু ঘটে, তারা মনে করে, এটি বিদেশি ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী কিংবা দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত কিছু সাহসী রাজনৈতিক কর্মী নিজ উদ্যোগে দেশের স্বার্থে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ নিতে পারে, এটা ভাবার মতো মানসিক গঠন তাদের নেই। সবকিছুতেই তারা ষড়যন্ত্র দেখে। এই ধারা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে।

৫ নভেম্বর সকাল আটটার দিকে আমার বেডরুমের সিভিল টেলিফোন বেজে ওঠে। অপর প্রান্তে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাবেক সিএসপি শাহ মোহাম্মদ

ফরিদ, সরকারের উপসচিব। ফরিদ পত্রিকায় প্রকাশিত আওয়ামী লীগের একটি মিছিলের ছবির কথা উল্লেখ করে জানাল, ঢাকা এখন গুজবের শহর, সাধারণ মানুষ বলাবলি করছে, ভারত ৩ নভেম্বরে ঢাকায় অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। ফরিদের কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তাৎক্ষণিক উপলব্ধি হলো, খালেদের পরাজয় কেবল সময়ের ব্যাপার। সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে তিনি শতভাগ সফল, কিন্তু রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। রাজনীতিতে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ। সরকার পরিবর্তনের মতো বৃহৎ রাজনৈতিক কাণ্ড ঘটিয়ে, ব্যাকরণ মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি কীভাবে নির্লিপ্ত, উদাসীন হয়ে গেলেন! অবিশ্বাস্য! দেশের জনগণের প্রতিক্রিয়া তাঁর হিসাবের মধ্যেই ছিল না।

খালেদ মোশাররফ মুক্তিযুদ্ধের এক কিংবদন্তি সমরনায়কের নাম। একজন দক্ষ সেনা কর্মকর্তারূপেই তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। আমি তাঁকে দূর থেকেই দেখেছি, মাত্র দুই দিন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। আমার কমান্ডিং অফিসার কর্নেল শাফায়াত জামিলের ওপর গভীর আস্থার কারণেই আমি এ অভিযানে শরিক হয়েছিলাম। খালেদ যে রাজনীতি সম্পর্কে এতটা অনভিজ্ঞ, অপরিপক্ক, এটা আমরা কল্পনাও করিনি। যে রাষ্ট্রপতিকে তিনি অপসারণ করলেন, তাঁর কাছ থেকেই প্রমোশন ও পদায়ন ভিক্ষা করে দুই দিন সময় নষ্ট করলেন। ৩ কিংবা ৪ নভেম্বর তিনি বেতারে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে যদি জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতেন এবং তিন মাসের মধ্যে পরবর্তী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিতেন, তিনি একজন জাতীয় বীর হিসেবে নন্দিত হতেন। কিন্তু তিনি সেটি করতে ব্যর্থ হলেন এবং তার জন্য চরম মূল্য দিলেন। সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়ের চেয়েও কার্যকর। বিনা রক্তপাতে বিদ্রোহীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে এবং অনায়াসে সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ পেয়ে তিনি নির্ভার হয়ে গেলেন। অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী অফিসারদের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে গেলেন। অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কহীন কয়েকজন প্রত্যাগত অফিসার, এমনকি জার্মানি থেকে এসে এম জি তাওয়াবও তাঁর উপদেষ্টা বনে গেলেন। একজন বেসামরিক ব্যক্তি, রাজনীতিতে যাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল, আনোয়ার হোসেন মঞ্জুও তাঁর বাড়িতে এসে নানা উপদেশ দেওয়া শুরু করলেন। ঈশান কোণে যে ভয়াবহ দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে, এ সম্পর্কে কেউ কোনো ধারণা খালেদকে দেয়নি।

৫ নভেম্বর সকাল নয়টার আগেই আমি আমার অফিসে পৌঁছালাম। ভেবেচিন্তে মনে হলো, সামনের ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে খালেদ মোশাররফের বেতার ভাষণ প্রচার। দুপুর ১২টার মধ্যে জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণ দিয়ে অভ্যুত্থানের লক্ষ্যসমূহ

এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করতে হবে। তাঁর বক্তব্য বাতাসে ভাসমান যাবতীয় গুজবের অবসান ঘটাবে।

সকাল সাড়ে ১০টায় নতুন সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ সেনা সদরে বাহিনীপ্রধান ও সিনিয়র অফিসারদের সভা আহ্বান করেছেন। কর্নেল শাফায়াত ও ৭২ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল নজমুল হুদা সকাল সাড়ে নয়টার মধ্যেই ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে এলেন। আমি অফিসে এসেই বিডিআর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল দস্তগীরকে ফোন করি। দস্তগীর ১ম ইস্ট বেঙ্গলে আমার কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। অত্যন্ত বিচক্ষণ, পেশাদার কর্মকর্তা, আমার মতো তরুণ অফিসারদের রোল মডেল ছিলেন একসময়। আমি আবেগপ্রবণ হয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু কথা বলে তাঁকে সেনা সদরে যাওয়ার পথে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে এসে শাফায়াত জামিলের সঙ্গে চা খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানালাম। তিনিও আধা ঘণ্টার মধ্যে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছলেন।

সকালে শাফায়াত ও হুদার সামনে আমি সকালের পত্রিকায় প্রকাশিত মিছিলের অগ্রভাগে খালেদের মা, ভাইয়ের ছবিসংবলিত খবর এবং দেশে ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট অভ্যুত্থানের গুজব সম্পর্কে তাঁদের জানালাম। আমি অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলাম এবং দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। শাফায়াত ও হুদাও পত্রিকার খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং আশু বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে জেনারেল দস্তগীরও আমার অফিসে ঢুকলেন। আমি তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলাম। আমি তিনজন সিনিয়রকে আবেগপ্রবণ হয়ে জানালাম যে সামনে জাতির জন্য মহাদুর্যোগ অপেক্ষা করছে। এ মুহূর্তে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হবে জাতির উদ্দেশে সেনাপ্রধান খালেদের বেতার ভাষণ, যা জাতিকে আশ্বস্ত করবে। তাঁরাও একমত হলেন এবং আমাকেই একটি ভাষণ লিখে সেনা সদরে সেনাপ্রধানের সামনে উপস্থাপনের নির্দেশ দিলেন। 'আমরা কনফারেন্সে যাচ্ছি, তুমি দ্রুত ভাষণ রেডি করে নিয়ে এসো।' বলে তাঁরা তিনজন সেনা সদরের উদ্দেশ্যে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার ত্যাগ করলেন।

আবেগপ্রবণ হয়ে সেনাপ্রধানের বেতার ভাষণের খসড়া করছি, দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে কাগজ ভিজিয়ে দিচ্ছে। ব্রিগেড মেজরের অফিস প্যাডে লিখিত ভাষণের শুরুটা এ রকম, 'প্রিয় দেশবাসী, আমি মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বলছি।' মূল বক্তব্য এ রকম :

১. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে জাতি অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্যসমূহ বিগত সাড়ে তিন বছরে মোটেও অর্জিত হয়নি। জাতি অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, আইনশৃঙ্খলা

পরিস্থিতির ঘোরতর অবনতি ঘটেছে। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

২. বিগত ১৫ আগস্টে সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে সপরিবার হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনী এ ঘটনায় জড়িত ছিল না। কয়েকজন বিপথগামী কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও সৈনিক এ ঘটনা ঘটায়, যা ছিল নিছক হত্যাকাণ্ড। রাষ্ট্রকাঠামোতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সংসদ আগের মতোই বহাল রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বার্থে সেনাবাহিনী প্রধান এ বিষয় মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৫ আগস্টের খুনি অফিসাররা সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড প্রতিদিনই লঙ্ঘন করেছেন। তাঁরা জেলখানার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করেছেন এবং নানা ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। বিদ্রোহী অফিসাররা রেডিও স্টেশনে টর্চার সেল স্থাপন করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নির্যাতন করেন এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করেছেন। কয়েকজন ব্যক্তিকে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে ৩ নভেম্বর অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করা হয়েছে। রক্তপাত পরিহার করার জন্য তাঁদের বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড পুনঃস্থাপিত হয়েছে এবং শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩. রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ দেশে প্রথমবারের মতো সামরিক আইন জারি করেছেন। সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করতে আগ্রহী নয়। মোশতাকের ৮৩ দিনের শাসন জাতিকে হতাশ করেছে। জনগণ নিরাশ হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের জন্য এবং সংবিধান সমুন্নত রাখার স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এ সাদাত সায়েম রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি বর্তমান জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগেই পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

৪. সব রাজনৈতিক বন্দীকে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি দেওয়া হবে। প্রত্যেক নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা এবং সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

৫. সেনাবাহিনী সীমান্তে চোরাচালান রোধ করবে, দুর্নীতি দমন করবে এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। জাতীয় নির্বাচনের পর সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে গিয়ে দেশরক্ষার মূল দায়িত্ব পালন করবে।

ভাষণটি সঙ্গে নিয়ে বেলা ১১টায় সেনা সদর দপ্তরে পৌঁছালাম। সিজিএসের রুমেই নতুন সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ সিনিয়র কর্মকর্তাদের সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন। সভায় নৌবাহিনী প্রধান এম এইচ খান, বিমানবাহিনী প্রধান এম জি তাওয়াব, বিডিআর প্রধান কাজী গোলাম দস্তগীর, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, কিউএমজি সি আর দত্ত, লগ এরিয়া কমান্ডার আবদুর রউফ, ব্রিগেড কমান্ডার নাজমুল হুদা, শাফায়াত জামিল, ডি এম, নুরুদ্দিন খানসহ সিনিয়র অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। আমি পুবদিকের দরজা খুলে সভায় ঢুকলে অনেকেই বিস্মিত হন। তাওয়াবের চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখলাম। ভাবখানা, এত উচ্চপর্যায়ের সভায় মেজর সাহেব কেন উদয় হলেন! খালেদ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, 'ইয়েস হাফিজ?' জবাবে আমি আবেগপ্রবণ গলায় বলে উঠলাম, 'স্যার, এখানে অনেকেই ভাবছেন একজন জুনিয়র অফিসারের আগমনের কারণ কী? আমি বিনীতভাবে জানাতে চাই, আমরা এ মুহূর্তে এক অস্বাভাবিক, অস্থির সময় পার করছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য এবং জাতিকে আশ্বস্ত করার জন্য আমি একটি ভাষণের খসড়া নিয়ে এসেছি। এ ভাষণ সেনাপ্রধান অবিলম্বে রেডিও-টিভি মারফত জাতির উদ্দেশে প্রচার করবেন। আমি কি খসড়াটি পড়ে শোনাতে পারি?' খালেদ বললেন, 'ওকে, গো অ্যাহেড।'

আমি দ্রুত ভাষণটি পড়া শেষ করলাম। মাঝেমধ্যে তাকিয়ে দেখলাম অধিকাংশ অফিসার সম্মতিসূচক মাথা নাড়ছেন। পড়া শেষ হতেই খালেদ বললেন, 'হাফিজ, তুমি পাশে ডিএমওর রুমে অপেক্ষা করো, আমরা নিজেদের মধ্যে একটু আলাপ-আলোচনা করে নিই।' আমি ভাষণের খসড়াটি সেনাপ্রধানের সামনে রেখে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে ডিএমওর রুমে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ডিএমও লেফটেন্যান্ট কর্নেল নুরুদ্দিন সভাকক্ষে। আমি তাঁর অফিসে একাই বসে রইলাম। অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল আর আমি মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আমার ডাক পড়ল। আবার সভাকক্ষে গেলাম। খালেদ বললেন, 'খসড়াটি খুবই সুন্দর এবং সময়োপযোগী হয়েছে, ভেরি ওয়েল ডান। আমরা এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা মনে করি রেডিও-টিভিতে ভাষণটি আমি নই, রাষ্ট্রপতিই দেবেন। এর সঙ্গে জাতির ভবিষ্যৎ জড়িত। সুতরাং রাষ্ট্রপতিই এ ধরনের ভাষণ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। আজই আমরা একজন যোগ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেব। তুমি কনফারেন্স রুমে অপেক্ষা করো। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয় থেকে দুজন প্রতিনিধি আসবেন। তাঁরা খসড়া ভাষণে দুটি প্যারাগ্রাফ যোগ করবেন। থ্যাংক ইউ।'

হতাশ হয়ে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে করিডরের উল্টো দিকে সেনা সদর কনফারেন্স রুমে বসে থাকলাম। সময় ও সুযোগ হাত থেকে ক্রমেই বেরিয়ে যাচ্ছে। তিন দিন ধরে রেডিও বন্ধ, সারা জাতি একজন নেতার বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু নির্লিপ্ত, অসচেতন খালেদ শুধু মিটিং করে সময় নষ্ট করে চলেছেন। জনগণের প্রতিক্রিয়া তাঁর হিসাবের মধ্যেই নেই!

বেলা দেড়টার দিকে কনফারেন্স রুমে এলেন আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব কুদ্দুস চৌধুরী (পরবর্তীকালে বিচারপতি)। তিনি অত্যন্ত ঝানু ব্যক্তি। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধানে যতগুলো সংশোধনী আনা হয়েছে, যেমন ইমার্জেন্সি, মার্শাল ল প্রোক্লেমেশন ইত্যাদি, সব কটিই তাঁর কলম থেকে এসেছে। ইতিমধ্যেই আমার হাতে লেখা ভাষণটির কয়েকটি কপি করা হয়েছে। কুদ্দুস চৌধুরী বললেন, 'প্রধান বিচারপতি কীভাবে রাষ্ট্রপতি হবেন? সংবিধানে এমন বিধান তো নেই।' জবাবে আমি বললাম, যেভাবে খন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতি বানিয়েছেন, সেভাবেই চিফ জাস্টিসকে ওখানে বসিয়ে দিন। আপনিই তো হরফুন মওলা। একটু হেসে তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভাষণে একটি প্যারা যোগ করে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যুগ্ম সচিব মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) শমসের মবিন এসে ভাষণে নিরপেক্ষ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র প্যারাগ্রাফ যোগ করলেন। অবশেষে ভাষণ সম্পূর্ণ হলো। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় সিনিয়র কুতুবদের সারগর্ভ মতামত নিতে গিয়ে একটি পুরো দিন নষ্ট করলেন খালেদ মোশাররফ। দেশের জনগণ একজন সেনানায়কের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর শোনার জন্য তিন দিন ধরে অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু তাদের প্রত্যাশা পূরণ হলো না। সভায় একপর্যায়ে তাওয়াব মন্তব্য করলেন, 'মার্শাল ল এখনই উঠিয়ে দেওয়া উচিত। সামরিক আইন বহাল থাকলে আমেরিকা এবং উন্নত বিশ্বের দেশগুলো বাংলাদেশকে কোনো প্রকার সাহায্য-সহযেগিতা দেবে না।' এই বিষয়ের ওপরই উপস্থিত সিনিয়র কর্মকর্তারা আলোচনা করে এক ঘণ্টা মূল্যবান সময় নষ্ট করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদকে এ জন্য চড়া মূল্য দিতে হয়েছে, সমসাময়িক ইতিহাসে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি রুশ-ভারতের দালালরূপে চিহ্নিত থাকলেন।

কনফারেন্স রুম থেকে বের হয়ে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে আসতে আসতে চারটা বেজে গেল। সকাল থেকে আমি অভুক্ত কিন্তু খেতে রুচি নেই। মেজর ইকবাল, নাসির, তাজ, জাফর ইমাম, গাফফারসহ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সব জুনিয়র অফিসার ক্ষুব্ধ, হতাশ। খালেদের মায়ের মিছিলে অংশগ্রহণের সংবাদ যে জাতিকে ভুল মেসেজ দিয়েছে, এটি সবাই উপলব্ধি করতে পারলেও খালেদ এর গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। দ্রুত বেতার ভাষণ না দেওয়ার

কারণে সবাই অস্বস্তিতে ভুগছে। কর্নেল হুদা ও শাফায়াতের সামনেই একজন ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠলেন, 'এখন খালেদকেই সরিয়ে দেওয়া দরকার।' আমরা শুধু মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম।

বিকেলের দিকে অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে ১ম ইস্ট বেঙ্গলে গেলাম। সেখানেও অফিসারদের মধ্যে হতাশা লক্ষ করলাম। সবাই জানতে চায় কেন রেডিও বন্ধ, কেন কর্মসূচি ঘোষণা করা হচ্ছে না।

১ম ইস্ট বেঙ্গল থেকে বাসায় ফেরার পথে জেনারেল জিয়ার বাসার গেটে সেনাপ্রধান খালেদ ও ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানকে দণ্ডায়মান দেখতে পেলাম। আমি জিপ থেকে নেমে তাঁদের সামনে গেলাম। খালেদ আমাকে রাস্তার এক পাশে নিয়ে নিম্নস্বরে বললেন, 'নুরুজ্জামান বলছে জেনারেল জিয়াকে এ বাসায় রাখা নিরাপদ নয়, তাঁকে সাভারে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে স্থানান্তর করা উচিত। কী বলো?'

মুহূর্তেই বিষাদগ্রস্ত হলাম। দৃঢ়ভাবে বললাম, 'স্যার, গতকালও জিয়া আমাদের সেনাপ্রধান ছিলেন। একজন সেনাপ্রধানকে রক্ষীবাহিনীর হেফাজতে পাঠানো চরম অবমাননাকর। এ ধরনের চিন্তাভাবনা করা ঠিক নয়।' আমার মনোভাব দেখে পরমুহূর্তেই খালেদ ও নুরুজ্জামান গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

জিয়ার বাসভবনে তখনো ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকেরা গার্ড ডিউটি করছে, ভেতরে ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ। আমি গার্ড কমান্ডার সুবেদার রইস উদ্দিনকে ডেকে বললাম, 'সুবেদার সাহেব, নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি। জেনারেল জিয়া একজন সেনাপ্রধান ছিলেন, অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি বাড়িতেই থাকবেন। তাঁকে যেন এ বাড়ি থেকে কোথাও সরানো না হয়। এমনকি সেনাপ্রধানও যদি সরাতে চান, আমাকে না জানিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না। ঠিক আছে?' রইস উদ্দিন একসময় আমার কোম্পানির সিনিয়র জেসিও ছিল, অত্যন্ত বিশ্বস্ত সৈনিক।

'অবশ্যই স্যার, আপনার আদেশ জীবনের বিনিময়ে হলেও পালন করব।' রইস উদ্দিন জানাল।

পরিস্থিতি দেখার জন্য একসময় বাড়ির ভেতরে গেলাম। বারান্দায় মলিন মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন খালেদা জিয়া। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'ভাই, কী হচ্ছে এসব?'

'ভাবি, আমি দুই দিন আগেই এসে স্যারকে ৪৬ ব্রিগেডের অভিযান সম্পর্কে জানিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি কিছুই করলেন না। আজ আমি এসেছি আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য। স্যারকে বলবেন ওনার আর কোনো ধরনের ক্ষতি কিংবা অসম্মান কেউ করতে পারবে না। কোনো অসুবিধা হলে যেকোনো গার্ডের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন। আমি ছুটে আসব।' আমার

কথা শুনে বেগম জিয়া কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। আমি দ্রুত আমার বাসায় ফিরে এলাম।

৫ নভেম্বর বিকেলের মধ্যেই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী অফিসাররা উপলব্ধি করলেন যে খালেদ লাইনচ্যুত হয়েছেন। তিনি এতে অংশগ্রহণ করেছেন একটিমাত্র লক্ষ্য সামনে রেখে, তাঁকে সেনাপ্রধান হতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ামাত্র তিনি শুধু নিজেকে নিয়েই ভেবেছেন। খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি থাকে থাকুক, দেশ ও জাতি নিয়ে যাবতীয় ভাবনা ধীরেসুস্থে করা যাবে। তাঁকে Chief Martial law Administrator হতে হবে, অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকতে হবে। নৌবাহিনী প্রধান ও বিমানবাহিনী প্রধান Deputy CMLA হিসেবে তাঁর এক ধাপ নিচে থাকবেন। রিয়ার অ্যাডমিরাল এ এইচ খান এবং এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াব এটি মানতে অস্বীকৃতি জানান।

মধ্যমাঠে নতুন খেলোয়াড়

খালেদ যখন নির্লিপ্ত, আত্মতৃপ্তিতে ভুগছেন, তখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহের। তিনি পদাতিক বাহিনীর অফিসার, বালুচ রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানের অফিসার, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে সিরিয়াস ছিলেন না। মেধাবী ক্যাপ্টেন-মেজররা যে ধরনের পদে নিয়োগ পান, তিনি কখনো তেমন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। স্টাফ কলেজের জন্যও কোয়ালিফাই করেননি। শারীরিকভাবে শক্ত-সমর্থ ছিলেন, কমান্ডো বাহিনীতে যোগ দিয়ে আমেরিকায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন রোমান্টিক সমাজতন্ত্রী। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বামপন্থী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯৭১-এর জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে তাহের, মেজর জিয়াউদ্দিন, মেজর আবুল মঞ্জুর (সস্ত্রীক) ও ক্যাপ্টেন বজলুল গনি পাটোয়ারী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য শিয়ালকোট থেকে পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। মেজর মঞ্জুর অত্যন্ত মেধাবী অফিসার ছিলেন, কানাডার স্টাফ কলেজ থেকে স্নাতক। কলকাতায় পৌঁছালে তাঁকে ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। মেজর জিয়াউদ্দিনকে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক এবং ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীকে একই ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার পদে পদায়ন করা হয়। মেজর আবু তাহেরকে ১১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কামালপুরে একটি অভিযান পরিচালনাকালে তাহের অ্যান্টি পারসোনেল মাইনে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং ভারতীয় হাসপাতালে চিকিৎসাকালে তাঁর একটি পা কেটে ফেলতে হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে তাহের ও জিয়াউদ্দিনের মাঝে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তাঁরা উভয়েই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠুক, এটি তাঁরা উভয়েই মনেপ্রাণে চাইতেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, জনতার হয়ে লড়াই করে তাঁরা আদর্শ বাস্তবায়নের ব্যাপারে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির অন্যতম সমাজতন্ত্র, কিন্তু স্বাধীনতার এক বছর পার হতে না হতেই সমাজতন্ত্রের অনুসারীরা উপলব্ধি করেন যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তরণের সম্ভাবনা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। ৪৬তম ব্রিগেডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউদ্দিন সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে *হলিডে* পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ এনে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। অত্যন্ত আবেগতাড়িত হয়ে সেনাবাহিনীর প্রচলিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করেই তিনি এ কাজ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী (যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন) তাঁকে সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পদচ্যুত করেন। চাকরিচ্যুত হওয়ার পরই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন।

জিয়াউদ্দিনের পরিণতি দেখার পর কর্নেল তাহের সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অব্যাহতি চান, তাঁকে অবসর দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি সরকারের সঙ্গেই দেন-দরবার করে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ড্রেজার সংস্থার পরিচালকরূপে চাকরিতে যোগ দেন। আর গোপনে যোগ দেন সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে (জাসদ)। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের স্লোগান দিয়ে দলটি বহু ছাত্র ও তরুণ-যুবককে আকৃষ্ট করে, কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার-কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তারা জনসমক্ষে পেশ করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দেশের জনগণকে খেপিয়ে তুলে তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাবে বলে আশাবাদী ছিল। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তারা কোনো ভিত গড়ে তুলতে পারেনি, কেবল ছাত্রদের মধ্যেই তারা প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৭৩-এর নির্বাচনে জাসদ আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করে, একটি দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী (ক্যাডার) গড়ে তুলে রাশিয়া, চীন বা কিউবার মতো দেশের উদাহরণ অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে যে সময় কিংবা

সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, তত দিন অপেক্ষা করার ধৈর্য তাহেরের ছিল না। একটি পা হারানোর ফলে তিনি মানসিকভাবে জেদি ও টেম্পারেমেন্টাল হয়ে পড়েন। শর্টকাটে সাফল্য অর্জন, অর্থাৎ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১৯৭৪ সালে মেজর জলিলের নেতৃত্বে কয়েকজন সাধারণ সৈনিককে নিয়ে গড়ে তোলেন 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'। জলিল জেলে গেলে এর অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পান লে. কর্নেল তাহের ও যুবনেতা হাসানুল হক ইনু। সেনাবাহিনীর ভিত্তি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে তাঁরা কোনো সদস্য সংগ্রহ করতে পারেননি। সিগন্যাল, সার্ভিস কোর, ইঞ্জিনিয়ার্স অর্ডন্যান্স—এ ধরনের কোর থেকে তাঁরা অল্পসংখ্যক সদস্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

বিমানবাহিনীতে এয়ারক্রাফটের সংখ্যা খুবই কম থাকায় বিমানসেনারা দুপুরের পর কর্মহীন হয়ে পড়ে। অবসর সময় কাজে লাগিয়ে এদের একটি বড় অংশ বিএ, এমএ ডিগ্রি অর্জন করে। এদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের অফিসারদের তুলনায় শিক্ষিত এবং দক্ষ বলে ধারণা করত। কথায় বলে 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী'। স্বাধীনতালাভের পর '৭২ সালেই বিমানবাহিনীতে প্রথম বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। যারা তা করেছিল, তাদের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি। অনেকের মধ্যে একটা কিছু করে জাতে ওঠার মানসিকতা গড়ে ওঠে। তাহেরের বড় ভাই ফ্লাইট সার্জেন্ট আবু ইউসুফের নেতৃত্বে কয়েকজন বিমানসেনা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থায় যোগ দেয়। '৭২-এর বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বিমানসেনাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, ফলে রোমান্টিক বিপ্লবীরা বিনা বাধায় তাদের শক্তি বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করে। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে অক্টোবর মাসে জাপানের একটি বিমানকে হাইজ্যাকাররা ঢাকা বিমানবন্দরে নিয়ে এলে এ সুযোগে বিমানসেনারা জনৈক সার্জেন্ট আফসারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। তারা ঢাকা এয়ারপোর্ট ও রেডিও স্টেশন দখল করে অভ্যুত্থানের সূচনা করে। বিমানসেনারা কোনো কারণ ছাড়াই বিমানবাহিনীর ১৩ জন অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। কয়েক ঘণ্টা পর সেনাবাহিনীর নবম ডিভিশনের সৈনিকেরা জেনারেল জিয়ার নির্দেশে এ বিদ্রোহ দমন করে।

১৯৭৪ সালের শেষ ভাগে একদিন সন্ধ্যায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাহের আমার শহীদ আজিজ পল্লির বাসায় আসেন। চা খাওয়ার একপর্যায়ে তিনি তাঁর আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। আমার বাসায় তিনি কয়েকজন মাঝারি পর্যায়ের অফিসারকে নিয়ে সমাজতন্ত্রের ওপর ক্লাস নিতে চান। আমি রাজনীতি করতে কখনোই আগ্রহী ছিলাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র

থাকাকালেও রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইনি। খেলাধুলাই ছিল আমার ধ্যানজ্ঞান। আমি তাহেরকে সরাসরি বললাম, সেনা অফিসারদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী খুঁজে পাওয়া যাবে না, খামাখাই কাউকে বিপদে ফেলা ঠিক হবে না। আমি তাঁকে জানালাম, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল আকবর ইউপিপিতে যোগ দিয়েছেন, তিনি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য মাঝেমধ্যে ফুসলাচ্ছেন। আপনি বরং জেনারেল জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। আমি পরামর্শ দিলাম।

'ওনার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও,' তাহের জানালেন।

আমি প্রফেশনাল ক্যারিয়ার নিয়ে সিরিয়াস ছিলাম। স্টাফ কলেজের এন্ট্রি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তাহেরের ক্লাস নেওয়ার বিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখাইনি। গাড়িবারান্দায় গিয়ে তাঁকে বিদায় জানানোর সময় সৌজন্য প্রদর্শন করে গাড়ির দরজা খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিতেই তিনি বাধা দিলেন, 'I can open the door myself' বলে তিনি নিজেই ক্রাচে ভর দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হলেন। শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করার একধরনের মানসিকতা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে কার্যকর ছিল।

বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সংগোপনেই তাদের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল। এদের উপস্থিতি সম্পর্কে অফিসার ও সৈনিকেরা ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত কিছুই টের পায়নি। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের ঘটনা ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। কর্নেল তাহের কিছুই আঁচ করতে পারেননি। ১৫ আগস্ট দুপুরে রেডিও স্টেশনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি ফারুক-রশিদকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ৩ নভেম্বর তারিখের অভ্যুত্থান সম্পর্কেও তিনি অন্ধকারে ছিলেন। ফারুক-রশিদের সঙ্গে বঙ্গভবনে তাঁর দু-একটি বৈঠকের কথা শোনা যায়। কিন্তু তাঁরা একজন অবসরপ্রাপ্ত, শারীরিক প্রতিবন্ধী অফিসারকে তেমন গুরুত্ব দেননি। তাঁরা পরাশক্তির নিয়ন্ত্রণে নিজস্ব পরিকল্পনায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন। জাসদের কেউ কেউ দাবি করেন, বন্দী হওয়ার পূর্বমুহূর্তে জেনারেল জিয়া নাকি তাহেরকে টেলিফোন করে তাঁর সাহায্য কামনা করেছিলেন।

৫ নভেম্বর দুপুর থেকেই কর্নেল তাহের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে সক্রিয় করেন। এলিফ্যান্ট রোডে আবু ইউসুফের বাসায় তিনি সৈনিক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হন। তাহের জানালেন যে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু সৈনিক সংস্থা হাত গুটিয়ে বসে আছে! এখনই বিপ্লব সংঘটিত করার মোক্ষম সময়। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানকে ভারতের যোগসাজশে আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনরায় ক্ষমতায় আনার

অপতৎপরতা বলে অভিহিত করেন তিনি। খালেদ মোশাররফকে রুশ-ভারতের দালাল বলে উল্লেখ করে প্রচারপত্র ছাপিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবিলম্বে বিলি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রচারপত্রে অফিসার শ্রেণিকে সব অপকর্মের হোতা বলে উল্লেখ করে সাধারণ সৈনিকদের অফিসারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিদ্রোহের আহ্বান জানানো হয়।

৫ নভেম্বর গভীর রাতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন ইউনিটে ১২ দফা দাবিসংবলিত প্রচারপত্র বিলি করে। তাতে তাদের মূল বক্তব্য ছিল, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশে সামাজিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করবে। বিদ্যমান সেনাবাহিনী ধনিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আগামী দিনে এই বাহিনী দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণি এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেবে। কেবল সেপাইদের মধ্য থেকে অফিসার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ ছাড়া সৈনিক সংস্থার দাবিদাওয়ার মধ্যে ছিল, সেপাইদের বেতন-ভাতা বাড়াতে হবে এবং অফিসারদের সেবায় নিয়োজিত 'ব্যাটম্যান' প্রথা বাতিল করতে হবে। রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করে সেনাপ্রধান সেনাবাহিনী পরিচালনা করবেন ইত্যাদি।

৫ নভেম্বর বিকেলে ট্যাংকসহ ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার এবং ২ ফিল্ড রেজিমেন্টের সৈনিকেরা বঙ্গভবন ও রেডিও স্টেশন থেকে ক্যান্টনমেন্টে নিজস্ব আবাসস্থলে ফিরে আসে। কিন্তু বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার বিলি করা প্রচারপত্র ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ছাড়া সব ইউনিটে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। রেডিও বন্ধ থাকায় খালেদ মোশাররফ-সম্পর্কিত প্রচারণা সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায়। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে একাত্তরের ২৭ মার্চের ঘোষণা জিয়াউর রহমানকে সৈনিকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯৭২ সালে সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ না পাওয়ার কারণে তাঁর প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। জিয়াকে বন্দী করে খালেদের সেনাপ্রধান পদে দায়িত্ব গ্রহণকে সাধারণ সৈনিকেরা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। ক্যান্টনমেন্টে ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত কী ঘটছে, কেন ঘটছে, এটি ৪৬ ব্রিগেডের সৈনিকেরা ছাড়া অন্যরা জানতে পারেনি। এ সময় ৪৬ ব্রিগেডের ঢাকার তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়নে প্রায় ২ হাজার সৈনিক ছিল, যারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। অন্য দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার, ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট, বিভিন্ন কোর, সার্ভিসে কর্মরত সৈনিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ হাজার, যাদের অধিকাংশই ছিল পাকিস্তান-প্রত্যাগত। পাকিস্তান-প্রত্যাগত সৈনিকদের সমর্থন লাভের জন্যই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তাদের ১৮ মাসের বেতন পরিশোধ করার দাবি জানায়। মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান-প্রত্যাগতদের

মধ্যে মানসিক দূরত্ব ছিল। সংখ্যায় কম হলেও মুক্তিযোদ্ধারাই সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে আসীন ছিলেন। প্রত্যাগত অফিসারদের কারও কারও মনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অপারগতার কারণে হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়। তাঁরা ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে অংশ নেননি। মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকেরাই এসব ঘটনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অমুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা পেশাদারি মনোভাবসম্পন্ন এবং সাধারণভাবে চেইন অব কমান্ডের প্রতি অনুগত ছিলেন।

৫ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা ও ভাইয়ের অংশগ্রহণের ছবি খালেদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য অভ্যুত্থান করেছেন, ছবি দেখে সাধারণ সৈনিকদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করার কারণে আওয়ামী লীগ সরকারকে সেনাসদস্যরা মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা-নির্বিশেষে সেনাসদস্যরা অপছন্দ করত। বাকশাল এবং ভারতীয় প্রভাব ফিরে আসার আশঙ্কায় সৈনিকেরা আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। একমাত্র খালেদ মোশাররফই বেতার-টিভিতে অভ্যুত্থানের লক্ষ্য সম্পর্কে ভাষণ দিয়ে এবং প্রথম দিনেই জাতীয় সংসদ ও আওয়ামী মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে জনমনের এ সংশয় ও বিভ্রান্তি দূর করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যথাসময়ে এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। দুটি পদক্ষেপই তিনি নেন ৬ নভেম্বর রাতে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে, কিন্তু আগেই বলেছি, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি রুশ-ভারতের দালালরূপে চিহ্নিত হলেন। যদি তিনি সত্যিকার অর্থে ভারতপন্থী হতেন, তাহলে প্রথম দিনই তিনি বেতারে আগে থেকে তৈরি করা ভাষণ পাঠ করতেন। নিহত চার নেতার মৃতদেহ নিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ঢাকা শহরে বিশাল মিছিল নামাতে বলতেন, যা সব বিরোধিতাকে নিরুৎসাহিত করত। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা জেলখানায় নিহত নেতাদের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাফনের জন্য খালেদের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। খালেদ অনুমতি দেননি। ১৯৭৫ সালে সাধারণ জনগণ ও সেনাসদস্যরাও বর্তমান সময়ের মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিল না। ফলে ভারত-সংশ্লিষ্টতার গুজব সৈনিকদের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি ও সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়েও খালেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগ ও ভারতের দালালরূপে চিহ্নিত হলেন। কী আশ্চর্য!

৫ নভেম্বর সন্ধ্যার পর তিন বাহিনীপ্রধান এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের সরকারি বাস ভবনে গিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদে দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ

জানান। সায়েম জানালেন যে সংবিধান মোতাবেক তিনি রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হতে পারেন না। খালেদ তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকই একটি অধ্যাদেশ জারি করে বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেবেন। তিনি একটি নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকারের প্রধানরূপে সংসদ ভেঙে দিয়ে তিন মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। বিচারপতি সায়েম তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিনিট পাঁচেক আলোচনা করে এসে রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণে সম্মতি জানান। তাঁকে গভীর রাতে বঙ্গভবনে নিয়ে আসা হয়। রাষ্ট্রপতি নিয়োগসংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রস্তুত করা হয়, খন্দকার মোশতাক বিনা বাক্যব্যয়ে তাতে স্বাক্ষর করেন। চিফ সেক্রেটারি শফিউল আযম নতুন রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৬ নভেম্বর বেলা ১১টায় বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি পদে শপথ গ্রহণ করেন। সুপ্রিম কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শপথগ্রহণ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিচারপতি সায়েমই প্রথম নিরপেক্ষ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধানরূপে অভিষিক্ত হলেন। ৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা করা হয়।

৬ নভেম্বর বিকেলে কর্নেল তাহের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে মিটিং করে সেদিন রাত একটায় অভ্যুত্থানের এইচ আওয়ার নির্ধারণ করেন। রাত একটায় বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিকেরা অস্ত্রাগার দখল করে আকাশে গুলিবর্ষণ করে অভ্যুত্থানের সূচনা করবে। তারা রাস্তায় বেরিয়ে আসবে এবং প্রথম সুযোগেই জেনারেল জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করবে। তাঁকে সকালে জাতীয় শহীদ মিনারে নিয়ে আসা হবে। জিয়া ও তাহের শহীদ মিনারে সেপাই ও সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। সন্ধ্যায় কলাবাগানে এক বাসায় তাহের জাসদ নেতাদের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে মিটিং করছিলেন। জাসদের সভাপতি মেজর জলিল, সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব, যুগ্ম সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ প্রমুখ সিনিয়র নেতা তখন কারাগারে বন্দী। সিরাজুল আলম খান, ড. আখলাকুর রহমানসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এ সভায় অংশ নেন। জাসদের অধিকাংশ নেতা জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছাড়া কেবল কয়েকজন সৈনিকের অংশগ্রহণে বিপ্লব সফল হবে না বলে মন্তব্য করেন এবং এ ধরনের সশস্ত্র তৎপরতায় অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাহের তাঁদের জানান যে সৈনিকেরা বিপ্লব ঘটানোর জন্য প্রস্তুত এবং এ ধরনের সুযোগ ভবিষ্যতে আর না-ও আসতে পারে। তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হলো।

৫ নভেম্বর ছিল একটি ঘটনাবহুল দিন। রাজনৈতিক দল ও সেনাসদস্যদের নানা গ্রুপ মিটিং-সিটিংয়ে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছে। অন্যদিকে খালেদ মোশাররফ অপ্রয়োজনীয় লোকদের সঙ্গে মিটিং করে সময় নষ্ট করছেন। একপর্যায়ে তাঁর মাথায় ঢুকল তাঁকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (সিএমএলএ) হতে হবে। নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধানের এক স্তর ওপরে। তাঁরা হবেন ডিসিএমএলএ। অন্যদিকে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী জুনিয়র অফিসারদের ভাবনা, খালেদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার ভয়াবহ পরিণাম থেকে কীভাবে সেনাবাহিনীকে রক্ষা করা যায়।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ফারুক-রশিদ-ডালিম গ্রুপ দেশত্যাগের পর ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার ও সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্টের সৈনিকেরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। তাদের আশঙ্কা, খালেদের নেতৃত্বাধীন সেনা কর্তৃপক্ষ হয়তো তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। স্বভাবতই তারা তখন শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত। তারা ৫ নভেম্বর ট্যাংকসহ বঙ্গভবন থেকে সেনানিবাসে ফিরে আসে। খালেদ ও তাঁর অফিসারদের আশ্বাসে তাদের আস্থা নেই। ডেসপারেট হয়ে তারা যোগাযোগ করে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতা কর্নেল তাহেরের সঙ্গে। মাধ্যম ল্যান্সারের হাবিলদার আবদুল বারী, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার একজন সদস্য। ৬ নভেম্বর রাত ১২টার সৈনিক বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য বেঙ্গল ল্যান্সার ও সেকেন্ড ফিল্ডের সৈনিকেরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

গণতন্ত্রের অনুসারী রাজনৈতিক দলসমূহ তখন নীরবে পরিস্থিতি অবলোকন করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ তাদের নেতাদের হত্যাকাণ্ডে ভীতসন্ত্রস্ত, খালেদ মোশাররফও তাদের পাত্তা দিচ্ছেন না। জাসদ নিজেদের মধ্যে মিটিং করেই কালক্ষেপণ করছে। তাহেরের সশস্ত্র তৎপরতার ওপর তাদের অধিকাংশের ভরসা নেই, তারাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালের বন্ধু খালেদ রব তখন বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। আমার সঙ্গে বহুদিন তার যোগাযোগ নেই। স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। লিয়াকত খালেদকে ক্যান্টনমেন্টের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। খালেদ রব অতীতে ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ছিল। রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো এঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রবের ইস্কাটনের বাসায় লিয়াকতরা মেনন ও রনোর সঙ্গে ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকবার বৈঠকে বসেন। খালেদ মোশাররফের সাফল্যে বামপন্থী নেতারাও উল্লসিত। তাঁরা খালেদকে সমর্থন দিতে রাজি, তবে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করার

প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ২ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে খালেদের ভূমিকার প্রতি আস্থাবান ছিলেন মেনন ও রনো।

মেজর ইকবাল ১ নভেম্বর যোগাযোগ করেন সর্বহারা পার্টির নেতা অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে। জিয়া সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বিধায় বাস্তববাদী ছিলেন। রাজনৈতিক দলসমূহ খালেদের অভ্যুত্থানকে কীভাবে নেবে, এ নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল। তিনি ইকবালকে বললেন অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা বাদ দিতে। আমাকেও একটি চিট পাঠালেন, তাতে লেখা, 'Don't do it, time is not right.' চিটি যখন হাতে পেলাম, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

৬ নভেম্বর বেলা ১১টায় বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম বঙ্গভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতিরূপে শপথ গ্রহণ করেন। তিন বাহিনীপ্রধান, ব্রিগেড কমান্ডারসহ উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দরবার হলে শেষ সারিতে আমরা ৪৬ ব্রিগেডের কয়েকজন মেজর ও লে. কর্নেল পদবির অফিসারও বসে ছিলাম। জাস্টিস সায়েমকে প্রথমবারের মতো দেখলাম, ছোটখাটো গড়ন, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। একেবারেই আন-ইমপ্রেসিভ মনে হলো। সারা জীবন জনগণ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে, একমনে রায় লিখে এতগুলো বছর পার করেছেন। দেশের এ ক্রান্তিকালে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবেন কি না সন্দেহ। যাহোক, দেশ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন রাষ্ট্রপতি পেয়েছে দেখে আমরা আশ্বস্ত বোধ করি। রেডিও-টিভি তিন দিনের নীরবতা ভেঙে প্রচার করে, নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

যশোরের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী বীর উত্তম সকালের ফ্লাইটেই ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন। খালেদের সঙ্গে তাঁর তিক্ত সম্পর্ক বহু বছর ধরে। খালেদ তাঁকে ঢাকায় আসার অনুমতি দিচ্ছিলেন না। দুই দিন ধরে দেন-দরবার করে মিসেস খালেদকে ধরে অবশেষে তিনি ঢাকায় আসার অনুমতি পেলেন। মীর শওকত অত্যন্ত দিলখোলা, কথাবার্তায় লাগামহীন, অ্যাগ্রেসিভ টাইপের অফিসার। সুন্দরী নারীর প্রতি তাঁর অনুরাগ সর্বজনবিদিত। জুনিয়র অফিসারদের সামনে নারীদের সম্পর্কে আদিরসাত্মক মন্তব্য করা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। সফিউল্লাহ ও খালেদ সাড়ে তিন বছর ধরে সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছেন। এঁদের বিপরীতে নিজেদের অস্তিত্ব কার্যকরভাবে টিকিয়ে রাখতে জিয়া ও শওকত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। খালেদ শওকতের রিঅ্যাকশন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। খালেদ সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পাওয়ায় শওকত ধরেই নিয়েছেন, তাঁর বিদায়ের সময় সমাগত।

রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের পর বঙ্গভবনের গাড়িবারান্দায় মীর শওকতের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি আমাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'হাফিজ, I am a soldier, always loyal to chain of command. খালেদকে বলো সে আমার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারে।'

আমি কিছুটা বিব্রত হয়ে বললাম, 'স্যার, আমি একজন জুনিয়র অফিসার। চিফ খালেদ আপনার কোর্সমেট, আপনি তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করতে পারেন। আমাকে কেন বলছেন?'

'এমনিই বললাম আরকি, চেইন অব কমান্ড রিস্টোর করে খালেদ হ্যাজ ডান আ গুড জব,' বলে শওকত গাড়িতে উঠলেন।

খালেদ মোশাররফকে ভারতের এজেন্ট হিসেবে অভিহিত করে প্রচারপত্র বিভিন্ন ইউনিটে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সাধারণ সৈনিকেরা বিভ্রান্ত হয়। এর ফলে এবং ল্যান্সার ও সেকেন্ড ফিল্ডের সৈনিকদের আত্মরক্ষার্থে সশস্ত্র তৎপরতার সম্ভাবনা বিকেল থেকেই সৈনিকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বিকেলে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের একজন দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার আবুল হাসেম (টি জে, বীর বিক্রম) আমার বাসায় এসে এক গোপন সংবাদ জানাল।

'স্যার, আজ রাত ১২টায় বিভিন্ন ইউনিটে একদল সৈনিক বিদ্রোহ করবে। তারা খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল ও অন্য অফিসারদের হত্যার করার জন্য অভিযান চালাবে।'

'বলো কী, এ কি সত্যি?' আমার জিজ্ঞাসা।

'স্যার, সৈনিক সংস্থা লিফলেট ছড়িয়ে সৈনিকদের উত্তেজিত করেছে। চারদিকে শুধু গুজব আর গুজব। সাবধানে থাকবেন। অসুবিধা দেখলে ১ম বেঙ্গলে আমাদের জানাবেন।' দ্রুত বেরিয়ে গেল হাসেম।

সন্ধ্যায় অফিসে গেলাম, কমান্ডারও এসেছেন। ৪৬ ব্রিগেডের ইউনিটসমূহ শান্ত রয়েছে, কোনো গন্ডগোলের খবর নেই। ২য় ফিল্ডের সৈনিকেরা নীরবে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে, অফিসারদের কোনো তৎপরতা নেই। সন্ধ্যার পরপরই ল্যান্সার ইউনিটে উত্তেজনার খবর পেয়ে খালেদ ও শাফায়াত সেখানে গেলেন। ল্যান্সার সৈনিকদের খালেদ আশ্বস্ত করেন যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। সবাই ব্যক্তিগত অস্ত্র কোতে জমা দিয়ে পরদিন সকাল থেকে নরমাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফলো করবে। সেনা সদর থেকে সব ইউনিটকে কোতে অস্ত্র জমা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

আমি সন্ধ্যার পর সৈনিক সংস্থার মধ্যরাতের বিদ্রোহের পরিকল্পনা সম্পর্কে শাফায়াতকে জানালাম। খুনি মেজরদের বিতাড়িত করার পর থেকেই আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। সৈনিকেরা বিদ্রোহ করে সেনা কর্তৃপক্ষকে কোনো রকম

অসুবিধায় ফেলবে, এমন মনে করার কোনো কারণ ছিল না। এই উপমহাদেশে সর্বশেষ সৈনিক বিদ্রোহ ঘটেছে ১৮৫৭ সালে, তারপর ১০০ বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নামও আমরা কখনো শুনিনি। ৪৬ ব্রিগেডের পদাতিক ইউনিটসমূহ দক্ষ, মুক্তিযুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং আমরা তেমন গুরুত্বও দিইনি বিদ্রোহের আশঙ্কাকে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি সায়েম রেডিও-টিভিতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। এটি আমারই লেখা। তাতে পররাষ্ট্রনীতি-সম্পর্কিত একটি প্যারাগ্রাফ শুধু যুক্ত হয়েছে। সায়েমের বাচনভঙ্গি খুবই দুর্বল, জনগণকে ইমপ্রেস করার মতো ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল না। ভাষণটিতে সাধারণত মানুষকে আশ্বস্ত করার যাবতীয় উপাদান ছিল। রাজবন্দী মুক্তির কথা এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় নির্বাচনের সময়সীমাও ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে অনিশ্চয়তা অনেকটাই কেটেছে। তবে এ ভাষণ ৩ কিংবা ৫ নভেম্বর প্রচারিত হলে জনমনে সব বিভ্রান্তি কেটে যেত। খালেদ নন্দিত হতেন। জাতীয় জীবনের ক্রান্তিকালে দেশেরে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেও খালেদ কোনো কৃতিত্ব পেলেন না। বরং নিন্দিত হলেন।

বঙ্গভবনে নৌবাহিনী প্রধান ও বিমানবাহিনী প্রধানের সঙ্গে সেনাপ্রধান খালেদের ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে। খালেদ সিএমএলএ হতে চান কিন্তু দুই বাহিনী প্রধানের এতে আপত্তি রয়েছে। খালেদ শাফায়াতকে বঙ্গভবনে ডাকলেন। রাত ১০টার দিকে বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার ত্যাগ করেন শাফায়াত। কিছুক্ষণ পর আমিও আমার বাসায় ফিরে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। রাত ১১টার দিকে ৪৬তম ব্রিগেডের অধীন ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানির ওসি মেজর রাজিউদ্দিন আমাকে ফোন করে জানাল, তার ইউনিটের সৈনিকদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। তারা সেনা সদরের নির্দেশ মোতাবেক অস্ত্র কোতে জমা দিতে রাজি হচ্ছে না। আমি রাজিউদ্দিনকে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিলাম। এই প্রথমবারের মতো শঙ্কিত হলাম। তাহলে কি একটি সেনা বিদ্রোহ অত্যাসন্ন? মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকদের সঙ্গেই রাত যাপন করব। দ্রুত ইউনিফর্ম পরে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের অফিসে পৌঁছালাম রাত সাড়ে ১১টার দিকে।

১ম ইস্ট বেঙ্গলে কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল মতিউর রহমান, অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন শাহাদাত ও সব কোম্পানি কমান্ডাররা উপস্থিত ছিলেন। আমি ও মতিউর সিওর অফিসের ফ্লোরে বিছানা পেতে ঘুমানোর উদ্যোগ নিলাম। পল্টন স্টান্ড টু অবস্থায় ছিল।

বিদ্রোহী সিপাহিদের তৎপরতা, অফিসাররা বিপন্ন

ররাত ১২টায় তুমুল গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দূর থেকে মিলিত কণ্ঠে স্লোগানের শব্দ ভেসে এল, 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই'। পার্শ্ববর্তী সাপ্লাই কোর এবং নৌবাহিনীর একটি সংস্থা থেকে মাইকে স্লোগানের শব্দ পরিষ্কারভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম? স্বাধীন দেশে সামরিক বাহিনীতে সিপাহি বিদ্রোহ, অফিসারের রক্ত চায় তারা! এ-ও কি সম্ভব! ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকেরা প্রতিরক্ষা অবস্থানে সজাগ ছিল, বনানী রেলগেটসংলগ্ন সড়কের মাথায় প্রতিরক্ষা অবস্থানে তৎপর ছিল মেজর ইকবালের নেতৃত্বে চার্লি কোম্পানি। একটি বিদ্রোহী সেনাদল এ সড়ক দিয়ে মিছিল করে ইউনিট এলাকায় ঢোকার উদ্যোগ নিতেই চার্লি কোম্পানি ফায়ার ওপেন করে। সাত-আটজন বিদ্রোহী সৈনিক হতাহত হওয়া মাত্র তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। সারা রাত আমাদের এলাকায় বিদ্রোহীদের কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

সিও এবং অ্যাডজুট্যান্টের অফিস থেকে বিভিন্ন ইউনিটে ফোন করলাম আমরা। অবাক কাণ্ড! কোথাও কোনো অফিসারের সাড়াশব্দ নেই। অধিকাংশ টেলিফোনে বসে আছে সেপাইরা, বিপ্লব সফল হওয়ার কারণে তারা উল্লসিত। অফিসার মেস, এমনকি বেশ কয়েকজন অফিসারের বাসভবনে আক্রমণ চালিয়েছে বিদ্রোহী সৈনিকেরা। অফিসাররা যে যেভাবে পেরেছেন লুঙ্গি, পাজামা, পাঞ্জাবি পরে প্রাণভয়ে বাসস্থান ছেড়ে পালিয়েছেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, তাতে অংশগ্রহণ করেছিল দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত সৈনিকেরা। ১১৮ বছর পর আবার সংঘটিত হলো সিপাহি বিদ্রোহ, এবারের প্রতিপক্ষ স্বাধীন দেশের নিজ বাহিনীর অফিসাররা। অফিসার হত্যা করতে পারলেই শ্রেণিসংগ্রাম সফল হবে, তাহের মডেলের সমাজতন্ত্র কায়েম হবে, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে ৭ নভেম্বর সৈনিকেরা বিদ্রোহে অংশ নেয়। তাদের ১২ দফা দাবিনামা হাস্যকর, নিজস্ব গোষ্ঠীস্বার্থে প্রণীত, দেশের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের কোনো রূপরেখা তাতে নেই। কেবল সৈনিকদের মধ্য থেকেই অফিসার নিয়োগ করতে হবে, বাইরের মেধাবী যুবকদের কোনো সুযোগ থাকবে না নেতৃত্বের কাঠামোতে। সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব খর্ব করার একটি সুপরিকল্পিত ছক দাবিনামার পরতে পরতে দৃশ্যমান।

রাত দুটোর দিকে মেজর মুহিউদ্দিনের নেতৃত্বে ২য় ফিল্ড আর্টিলারির একদল সৈনিক বিনা বাধায় জেনারেল জিয়ার বাসভবনে প্রবেশ করে। বেগম জিয়া আতঙ্কিত হয়ে বেরিয়ে এসে সৈনিকদের বলেন, 'জেনারেল সাহেব

পদত্যাগ করেছেন, আমরা আর কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাই না।' সৈনিকেরা 'জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ, সিপাই সিপাই ভাই ভাই' স্লোগান দিয়ে বাসার ভেতর ঢুকে পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত জেনারেল জিয়াকে কাঁধে তুলে নেয় এবং সেকেন্ড ফিল্ডের অফিসে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে জনমনে একটি ধারণা জন্মেছে, কর্নেল তাহের জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেন। এটি সম্পূর্ণ ভুল, তাহেরের অনুগত অর্ডন্যান্স সাপ্লাই, সিগন্যাল কোরের সদস্যদের পক্ষে অভিযান চালিয়ে পদাতিক বাহিনীর বেষ্টনী থেকে জিয়াকে মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। ১৫ আগস্টের অপারেশনে অংশগ্রহণকারী ল্যান্সার, ২য় ফিল্ডের ডেসপারেট সৈনিকেরা নিজেদের বাঁচার তাগিদেই জিয়াকে মুক্ত করে। মেজর মুহিউদ্দিন ও তাঁর সেনাদল পাকিস্তান-প্রত্যাগত, তাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা তাহেরের কোনো পূর্ব যোগাযোগ ছিল না। '৭৫ সালে সেনাবাহিনীর মূলধারায় তিন বছর আগে অবসর নেওয়া তাহের অনেকটাই অপরিচিত ছিলেন, সেনানিবাসে কোনো ইউনিটে ১০ মিনিট অবস্থান করার মতো সামর্থ্য তাঁর ছিল না। মিডিয়ায় বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করে জাসদ নেতারা তাহেরের বিশাল ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন, যা বাস্তবতার কষ্টিপাথরে টেকে না।

সংখ্যাগত বিচারে দুর্বল হলেও তাহেরের নেতৃত্বে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার তৎপরতা ৭ নভেম্বর সেনানিবাসে বারুদের স্তূপে দেশলাইয়ের কাঠি সংযোগের ভূমিকা পালন করেছে নিঃসন্দেহে। জিয়া মুক্ত হওয়ার ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তাহেরের ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়, সেনা চেইন অব কমান্ডের বলে বলীয়ান জিয়া মুহূর্তেই ফুৎকারে উড়িয়ে দেন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও তার নেতাকে।

জিয়া ৪র্থ বেঙ্গলের লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিনুল হক, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমীন আহম্মেদ চৌধুরী এবং কয়েকজন আস্থাভাজন অফিসারকে ২য় ফিল্ডে ডেকে নেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেন। ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত সেনা সদরের উল্টো দিকের ভিআইপি রুমে ছিলেন। মধ্যরাতে গোলাগুলি এবং 'অফিসারের রক্ত চাই' স্লোগান শুনে আতঙ্কিত শওকত রাস্তার উল্টো দিকের ব্রিগেডিয়ার এরশাদের বাসার ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে থাকেন। এরশাদ তখন একটি কোর্সে অংশ নিয়ে ভারতে ছিলেন। একদল সৈনিক খবর পেয়ে শওকতকে স্টোররুমে থেকে বের করে আনে। তারাই তাঁকে জিয়ার কাছে নিয়ে আসে ২য় ফিল্ডে।

৪ নভেম্বর ঢাকায় শক্তি বৃদ্ধির জন্য খালেদ ৭২ ব্রিগেড থেকে একটি ব্যাটালিয়ন ঢাকায় পাঠানোর জন্য কর্নেল হুদাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হুদা ১০ম ইস্ট বেঙ্গলকে ঢাকায় আসার নির্দেশ দেন। এ পল্টন ৬ নভেম্বর সকালে

ঢাকায় এসে পৌঁছায় এবং শেরেবাংলা নগরে এমপি হোস্টেল এলাকায় অবস্থান নেয়। লেফটেন্যান্ট কর্নেল নওয়াজেশ ছিলেন এ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার, নজরুল ইসলাম সুবেদার মেজর। সৈনিক ও অফিসারদের অধিকাংশই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

মধ্যরাতে ক্যান্টনমেন্টে সেনা বিদ্রোহের খবর পেয়ে খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান, কর্নেল হুদা ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল হায়দার। হায়দার পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন। বিয়ের কনে দেখার জন্য ৫ নভেম্বর ঢাকায় আসেন। খালেদ মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর কমান্ডার ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যই হায়দার বঙ্গভবনে এসেছিলেন। বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে তাঁরা কাঁঠালবাগানে খালেদের এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে ইউনিফর্ম খুলে সিভিল পোশাক পরলেন। এখান থেকে টেলিফোনে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের পর গভীর রাতে খালেদ, হুদা ও হায়দার শেরেবাংলা নগরে ১০ম ইস্ট বেঙ্গলে যান। নুরুজ্জামান সাভারে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দিলেন।

খালেদ ১০ম বেঙ্গলে পৌঁছার পর পরিবেশ মোটামুটি শান্ত ছিল। তাঁরা খুব ভোরে সেখানেই নাশতাও করেন। কিন্তু সেনানিবাস থেকে একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক ১০ম বেঙ্গলে পৌঁছে সৈনিকদের উত্তেজিত করে তোলে। এই ব্যাটালিয়নের মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ক্যাপ্টেন জলিল একদল উত্তেজিত সৈনিকের নেতৃত্ব দিয়ে খালেদ, হুদা ও হায়দারকে গুলি করে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে খালেদ ধীরস্থির ছিলেন, একের পর এক সিগারেট ফুঁকছিলেন।

হুদা কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েন। খালেদ তাঁকে বলেন, 'টেক ইট ইজি, ভাগ্যে যা আছে, তা-ই হবে।' হায়দার জলিলকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্বিনীত, উত্তেজিত জলিল এবং তার সঙ্গীরা তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং একপর্যায়ে তিনজনকেই হত্যা করে। গুলি করার আগে হায়দারের পরনের কমান্ডো জ্যাকেটটি জলিল খুলে নেয়। মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তি, সাহসী অফিসাদের এমন করুণ পরিণতি একেবারেই অকল্পনীয়। অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়, ক্যান্টনমেন্ট থেকে একজন সিনিয়র অফিসারের টেলিফোন পেয়েই জলিল উত্তেজিত হয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। অনেকেরই ধারণা, মীর শওকত এ ঘটনায় জড়িত ছিলেন। ১৯৭২ সালে কুমিল্লার বাসায় জিয়াউর রহমান বেগম জিয়ার উপস্থিতিতে শাফায়াতকে বলেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধের গোড়ার দিকে মীর শওকত তাঁকে (জিয়াকে) হত্যা করার জন্য একবার অ্যামবুশ পেতে ছিলেন। Truth is stranger than fiction.

৭ নভেম্বর গভীর রাতে জিয়া ২য় ফিল্ড থেকে বঙ্গভবনে শাফায়াত

জামিলকে টেলিফোন করে বলেন, 'ভুলভ্রান্তি যা হওয়ার হয়েছে, এসো আমরা সবাই মিলে সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করি।'

উত্তেজিত শাফায়াত বললেন, 'বারবার বলা সত্ত্বেও আপনি খুনিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না। আপনার কারণেই এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। We shall fight it out.'

কিছুক্ষণ পর বিদ্রোহী সেনারা বঙ্গভবনের ফটকে এসে পৌঁছালে ক্যাপ্টেন নজরুলের ২য় বেঙ্গলের সৈনিকেরা তাদের বাধা দেয়। কর্নেল শাফায়াত ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার জন্য বঙ্গভবনের দেয়াল টপকে দিলকুশার সড়কে লাফিয়ে পড়েন। এতে তাঁর পায়ের গোড়ালি ভেঙে যায়। সঙ্গী ক্যাপ্টেন দিদার তাঁকে নিয়ে কুমিল্লার দিকে যাত্রা করেন। ফেরিঘাটে মুন্সীগঞ্জের এসডিওর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। শাফায়াত নিজের পরিচয় দিয়ে এসডিওকে বলেন তাঁকে কোনো হাসপাতালে নিয়ে যেতে। একপর্যায়ে শাফায়াত নিজেই ক্যান্টনমেন্টে ফোন করে মীর শওকতের সঙ্গে কথা বলেন। ঘণ্টা দুয়েক পর লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিনুল হক নারায়ণগঞ্জে এসে শাফায়াতকে গাড়িতে তুলে নিলেন এবং তাঁরাই তাঁকে সিএমএইচে ভর্তি করেন।

রাত তখন চারটা বাজে। ১ম ইস্ট বেঙ্গলের রক্ষণব্যূহে সুনসান নীরবতা। মাঝেমধ্যে দূর থেকে বিদ্রোহী সৈনিকদের মাইকের আওয়াজ ভেসে আসছে। বিভিন্ন ইউনিটে ফোন করে দেখা গেল সব অফিসে আনন্দ-ফুর্তি করছে সেপাইরা। উপলব্ধি করলাম, পুরো ঢাকা গ্যারিসন বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে. অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে একমাত্র ইউনিট ১ম ইস্ট বেঙ্গল। সিও মতিউর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের কী করণীয়। ব্যাটালিয়নের জুনিয়র কমিশন্ড অফিসাররা (জেসিও) সবাই আমার মুক্তিযুদ্ধের সাথি। '৭১-এ এরা তখন নায়েক কিংবা হাবিলদার ছিল, আমিই তাদের বেনাপোলে প্রমোশন দিয়ে জেসিও বানিয়েছিলাম। আমি সুবেদার মেজর চাঁদ বখশ কাজী এবং সিনিয়র জেসিওদের এক পাশে ডেকে নিয়ে সংক্ষেপে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলাম। সবারই একই উৎকণ্ঠা, আমরাই একমাত্র ইউনিট, যারা সিপাহি বিদ্রোহে যোগ দিইনি। সুতরাং একসময় সংখ্যাগরিষ্ঠের ঘেরাওয়ের মধ্যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির শিকার হতে পারি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, অবিলম্বে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে অন্য কোনো অবস্থানে সমবেত হব আমরা। দিনের আলোতে ক্যান্টনমেন্ট এবং সাধারণ জনগণের মনোভাব যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মতিউর অনেকটাই ভেঙে পড়েছে, মেজর ইকবাল, ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহসহ অন্য অফিসাররাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পরিস্থিতি অনেকটাই '৭১-এর মার্চ মাসের মতো। সিও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন, পুরো যশোর সেনানিবাস একদিকে, ১ম ইস্ট বেঙ্গল অন্যদিকে। একসময় ক্যান্টনমেন্ট

থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পুবদিকে যাত্রা করলাম আমরা। মহাখালী, গুলশান, বাড্ডা পেরিয়ে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেরাইদে পৌঁছে গেলাম। একাত্তরে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়েছিলাম পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়ে, পঁচাত্তরের নভেম্বরে সুনসান নীরবতার মধ্য দিয়ে ঘুমন্ত শহরবাসীকে অতিক্রম করে শহরতলিতে পৌঁছলাম।

আমরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাইল তিনেক দূরে বেরাইদ উচ্চবিদ্যালয়ে অবস্থান নিলাম। বেরাইদ ও গুলশানের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে বালু নদ। স্কুলঘরটি পাকা দালান, সীমানাপ্রাচীরে ঘেরা একটি ছোট মাঠও রয়েছে। সূর্যের আলো ফোটার পর গুনতি করে দেখা গেল আমরা প্রায় ৪০০ সৈনিক, জনা দশেক জেসিও, সিওসহ আটজন অফিসার বেরাইদে সমবেত হয়েছি।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেতারে ভেসে এল মুক্ত সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভরাট কণ্ঠস্বর। 'প্রিয় দেশবাসী' সম্বোধন করে জাতির উদ্দেশে মিনিট পাঁচেকের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন তিনি। দেশবাসীকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নিজ নিজ পেশায়, স্বীয় কর্মস্থলে সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানালেন। এখানেই জিয়ার সঙ্গে খালেদ মোশাররফের পার্থক্য। খালেদ তিন দিন ধরে রেডিওর নিয়ন্ত্রণ হাতে রেখেও একটি ভাষণ দেওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলেন, অপর দিকে আধা আলো আধা অন্ধকারের মধ্যেই জিয়া বেতারে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন জাতির উদ্দেশে। রাজধানীর বাসিন্দাদের একটি বড় অংশের ঘুমই তখনো ভাঙেনি। কিন্তু এ ভাষণ দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছে। সায়েম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, কিন্তু সেই সংকটকালীন মুহূর্তে তাঁর ভাষণের অপেক্ষায় কেউ ছিল না। এহেন মাহেন্দ্রক্ষণে জাতি একজন সাহসী নেতার দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য শুনতে চায়। একাত্তরে ও পঁচাত্তরে সাহসী জিয়াউর রহমান সংকট মুহূর্তে দুবারই জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করে ইতিহাসে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেছেন। একই অবস্থানে থেকে সরব জিয়া নন্দিত, নীরব খালেদ নিন্দিত। একজন ভাগ্যের বরপুত্র, অপরজন ট্র্যাজেডির নায়ক।

বেরাইদ স্কুলের সীমানাপ্রাচীরের বাইরে শত শত কৌতূহলী মানুষ দাঁড়িয়ে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখছে। আমাদের সৈনিকেরা স্কুলের বারান্দায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করছে, সবাই ক্ষুধার্ত। এমন কঠিন সময়ে আমার ফুটবলার পরিচিতি কাজে লাগল। ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের একজন কট্টর সমর্থক, ক্রীড়ানুরাগী বশির আহমদ, আমার পূর্বপরিচিত। মাস দুয়েক আগে আমার দল ঢাকা মোহামেডান ক্লাব ঢাকা প্রথম বিভাগ লিগে চ্যাম্পিয়ন হলে বশির পুরো টিমকে তোপখানা রোডের

একটি চায়নিজ রেস্টুরেন্টে নৈশভোজে আপ্যায়ন করেছিলেন। বশির ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে স্কুলের বারান্দায় আমার সঙ্গে দেখা করেন।

'হাফিজ ভাই, ঘটনা কী? এখানে কেন এসেছেন আপনারা?' বশির বললেন।

'ক্যান্টনমেন্টে গন্ডগোল হচ্ছে, আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাইরে এসেছি।' আমি বললাম।

'ভাই, আমি এখানকার বাসিন্দা। আপনাদের জন্য নাশতার ব্যবস্থা করি?' বশির বললেন।

'নাশতা পেলে তো ভালোই হয়, ধন্যবাদ।' আমি বললাম।

করিতকর্মা বশির আধা ঘন্টার মধ্যেই ৪০০ সৈনিকের জন্য হালকা চা-নাশতার ব্যবস্থা করেন। আমাদের অবস্থা অনুমান করে দুপুর ১২টার দিকে ভাত, সবজি ও ডালসহযোগে দুপুরের খাবারের আয়োজন করেন তিনি। এমন দুঃসময়ে একজন ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তির সহযোগিতা পেয়ে বর্তে গেলাম।

ইতিমধ্যে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কয়েকজন সৈনিক আমাদের খোঁজে বেরাইদে এসে উপস্থিত হলো। তাদের কাছ থেকে গত রাতের তাণ্ডবলীলার খবর পেয়ে স্তম্ভিত হলাম আমরা। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য জাসদ সাধারণ সৈনিকদের বিদ্রোহের জন্য উসকানি দেয়। 'শ্রেণিসংগ্রামের' নামে তারা সেপাইদের অফিসার হত্যার জন্য প্ররোচিত করে। 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই', এটিই হলো তাদের বিপ্লবের মূলমন্ত্র। কেবল ক্ষমতা দখলে উন্মত্ত হয়ে ৭ নভেম্বর বিদ্রোহী সেপাইরা ১৩ জন অফিসারকে হত্যা করে। এঁদের মধ্যে মাত্র দুজন, খালেদ মোশাররফ ও নজমুল হুদা ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে জড়িত ছিলেন। বাকি ১১ জন একেবারেই নির্দোষ, কোনো সামরিক তৎপরতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন দুজন নারী। একজন মুক্তিযুদ্ধকালীন ৮ম সেক্টরের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরীর স্ত্রী, অপরজন মেজর মুজিবের স্ত্রী সিএমএইচের একজন লেডি ডাক্তার।

মেজর করিম আর্মি মেডিকেল কোরের প্রবীণ দন্তচিকিৎসক, কিছুটা স্পষ্টবাদী টাইপের মানুষ। এক সেপাই বন্দুক হাতে তাঁর কাছে দাঁতের চিকিৎসার জন্য শরণাপন্ন হলে তিনি বলে বসেন, 'তোমরা তো অফিসার মারছ, এখন আবার একজন অফিসারের কাছেই চিকিৎসার জন্য এসেছ!' প্রত্যুত্তরে সেপাইটি তাঁকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করে। মেজর আজিম সুপারসিডেড প্রবীণ কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কাজে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন। ঢাকা বিমানবন্দরে একদল বিদ্রোহী তাঁকে অকারণে গুলি করে হত্যা করে।

অর্ডন্যান্স অফিসার মেসে তিনজন তরুণ লেফটেন্যান্টকে বিদ্রোহী সেপাইরা লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। হত্যার আগে সেপাইরা থুতু ফেলে অফিসারদের তা চেটে খেতে বাধ্য করে। অনেক অনুনয়-বিনয় করেও এ নিরপরাধ তরুণেরা রক্ষা পায়নি। ঢাকা স্টেডিয়াম এলাকায় জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের হোস্টেলে জাতীয় হকি দলের ক্যাম্পে অনুশীলনরত ছিল ১৬ ইস্ট বেঙ্গলের তরুণ লেফটেন্যান্ট আনোয়ার। বায়তুল মোকাররম এলাকায় ট্রাকে চড়ে টহল দিচ্ছিল একদল বিদ্রোহী সৈনিক। ক্রীড়া বোর্ডের কর্মচারীদের কাছে তারা আনোয়ারের অবস্থানের বিষয়টি জানতে পারে এবং তাকে ধরে এনে সরাসরি গুলি করে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তিরা জানতেও পারেনি কেন ঘাতক দল তাদের হত্যা করছে। এদের একটাই অপরাধ, তারা অফিসার পদমর্যাদার অধিকারী। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার শ্রেণিসংগ্রামের 'মহান' কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যই তাদের জীবন দিতে হলো!

ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন অফিসার মেস, এমনকি অফিসারদের বাসায়ও হামলা করে বিদ্রোহী সৈনিকেরা। অফিসারেরা লুঙ্গি-পাজামা পরা অবস্থায় প্রাণভয়ে পালাতে থাকেন। অধিকাংশই কচুক্ষেত বাজার ও কুর্মিটোলার মধ্যবর্তী ঝিলের পানিতে নেমে মিরপুর কলোনির দিকে পালিয়ে যান। আমাদের শহীদ আজিজ পল্লিতেও তারা হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন অফিসারের বাড়িতে লুটপাট চালায়। আমার ব্যাটম্যান সেপাই গোলাপ মিয়া একাই একটি রাইফেল হাতে আমার বাসার গেটে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। একদল অর্ডন্যান্স কোর সেপাই আমার গেটের সামনে এলে গোলাপ বলে, 'বাসায় কেউ নেই, ঢোকার চেষ্টা করলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।' তার মারমুখী ভাবসাব দেখে কেউ আমার বাসায় ঢোকার চেষ্টা করেনি।

সকাল হতেই আমার স্ত্রী দিলারা শিশুপুত্র শাহরুখকে নিয়ে আমাদের ভক্সওয়াগন গাড়ি ড্রাইভ করে মিরপুরে বান্ধবী মরিয়মের বাসায় চলে যায়। গোলাপ মিয়া রাইফেল হাতে পেছনের সিটে বসে ছিল। রাত থেকেই আমি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলাম। ৭ নভেম্বর সারা দিন সেপাইরা অফিসারদের মারপিট করে এবং তাদের র‍্যাঙ্ক ব্যাজ ছিঁড়ে ফেলে। একমাত্র জিয়া ছাড়া আর কোনো অফিসারের কাঁধে র‍্যাঙ্ক ব্যাজ ছিল না। সীমাহীন উচ্ছৃঙ্খলতা!

৭ নভেম্বর সকালেই তাহের ইনুকে সঙ্গে নিয়ে সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্টে জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি জিয়াকে সকাল ১০টায় শহীদ মিনারে ছাত্র ও সৈনিকদের যৌথ সভায় যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সেনাপ্রধান জিয়া ক্যান্টনমেন্টের বাইরে এ ধরনের সভায় যোগদানের আহ্বান সরাসরি নাকচ করে দেন। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তাহেরের ক্ষমতারোহণের স্বপ্ন দু-

তিন ঘণ্টার মধ্যেই কর্পূরের মতো উবে যায়। তিনি জিয়াকে রেডিও স্টেশনে গিয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু জিয়ার সঙ্গে অবস্থানকারী অফিসাররা, বিশেষ করে কর্নেল মইনুল ও লেফনেট্যান্ট কর্নেল আমিনুল হক জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। আমিনুল হকের সঙ্গে তাহেরের বাগ্‌বিতণ্ডা হয় এবং একপর্যায়ে আমিনুল তাহেরকে বলে বসেন, 'আপনারা (জাসদ) তো ভারতের বি টিম।' অবশেষে বিফল মনোরথ হয়ে তাহের ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বোনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

জিয়ার ইচ্ছানুযায়ী রেডিও কর্মকর্তারা ক্যান্টনমেন্টে এসে তাঁর ভাষণ রেকর্ড করেন এবং বেতার-টিভিতে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভাষণে জিয়া নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ভাষণে কোথাও গণবাহিনী কিংবা কর্নেল তাহেরের নাম উচ্চারিত হয়নি। জাসদ ও তাহের ৭ নভেম্বরের সিপাহি বিপ্লবের জনক বলে দাবি করেন। কিন্তু সৈনিক বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুকের ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল রশিদের ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট। এই দুই ইউনিটের সৈনিকেরা ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। তারাই ২য় ফিল্ডের মেজর মুহিউদ্দিনের নেতৃত্বে জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে। ১৫ আগস্টে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের ইচ্ছানুযায়ী দেশের বাইরে অবস্থানরত ফারুক-রশিদকে ফিরিয়ে আনার দাবি সৈনিকদের ১২ দফা দাবির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ট্রাকে চড়ে সেনাসদস্যরা জমায়েত হয়। তাদের কয়েকজনের হাতে ছিল খন্দকার মোশতাকের ছবি। তাহেরের ছবি সেখানে ছিল না। জাসদের অনুসারীরা 'তাহের-জিয়া জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিলে সেনাসদস্যরা গুলি বর্ষণ করে জাসদ সমর্থকদের শহীদ মিনার থেকে তাড়িয়ে দেয়।

জাসদ একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল, বহু তরুণ, ছাত্র, যুবক এ দলের নিষ্ঠাবান কর্মী। তাদের নিজস্ব সংবাদপত্র এবং অনুগত সাংবাদিকেরা জনগণকে ধারণা দেয় যে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন এবং তারাই খালেদ মোশাররফকে হত্যা করে এবং জিয়াকে মুক্ত করে। তারা কর্নেল তাহেরকে একজন দুর্ধর্ষ সেনানায়ক হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস নেয়। কিন্তু তাহের তিন বছর আগে অবসর গ্রহণকারী শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং সেনাবাহিনীর মূল ভিত্তি পদাতিক বাহিনী ও ট্যাংক রেজিমেন্টের কাছে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত একজন কর্মকর্তা ছিলেন। সিগন্যাল, অর্ডন্যান্স, সার্ভিস কোর এবং কয়েকজন বিমানসেনা মিলে অভ্যুত্থান করে রাষ্ট্রক্ষমতা

দখল করবেন, এটি একেবারেই অকল্পনীয়। এ রোমান্টিক বিপ্লবীরা সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে ব্যবহার করেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সেনা চেইন অব কমান্ডের নিয়ন্ত্রণকারী জেনারেল জিয়া তাহের কিংবা জাসদকে পাত্তাই দেননি। বালুচ রেজিমেন্টের সাবেক অফিসার দুর্বল তাহেরের পক্ষে সেনানিবাসের কোনো ইউনিটে অবস্থান করাই সম্ভব হয়নি, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা তো দূরের কথা। অভ্যুত্থানের পরদিনই তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রাবাসে আত্মগোপন করতে হয়। জাসদের একতরফা প্রচারের ফলে তাহের ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা সৃষ্টি হয়। জিয়াকে তাঁরা বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত করেন, এটিও বাস্তবতার নিরিখে ধোপে টেকেনি। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয়, খালেদ মোশাররফের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে সৈনিক ও জনগণের মনোজগতে সৃষ্ট বারুদের স্তূপে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি সংযোগ করে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার প্রচারপত্র।

৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় জিয়া শাহবাগে রেডিও স্টেশনে যান, কর্নেল তাহেরও সেখানে ছিলেন। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা ১২ দফা দাবিসংবলিত দাবিনামা জিয়ার হাতে দেন এবং অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করে এতে তাঁর স্বাক্ষর আদায় করেন। জিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও এতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেও পরবর্তীকালে এঁদের সবাইকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছিলেন।

সকাল থেকেই বেরাইদ স্কুলের বারান্দায় আমরা অপেক্ষা করছি ক্যান্টনমেন্টের সঠিক সংবাদ জানার জন্য কিন্তু সঠিক তথ্য পাচ্ছিলাম না। দুপুরে ক্যাপ্টেন শাহাদাত এবং একজন অফিসারকে দুজন সৈনিকসহ ক্যান্টনমেন্টে পাঠালাম সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে আমাদের অবহিত করার জন্য। কিন্তু তারাও আর ফিরে আসেনি। সন্ধ্যার পর আমরা ৪০০ সৈনিকসহ ক্যান্টনমেন্টের দিকে অগ্রসর হলাম।

গুলশানের পূর্ব দিকে লেকের পাড়ে বাড্ডায় সাময়িক অবস্থান নিলাম আমরা। আমি রাত ১০টার দিকে জনা দশেক সৈনিকের একটি দল নিয়ে গুলশানের একটি আবাসিক ভবনে ঢুকি। উদ্দেশ্য টেলিফোন করে সেনানিবাসের খবর নেওয়া। কলবেল চাপতেই গৃহকর্তা ড্রয়িংরুমের দরজা খুলে দিলেন। এতজন উর্দি পরা সশস্ত্র সৈনিক দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আমি আমার পরিচয় দিলাম। তাঁর আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেডরুমে গিয়ে টেলিফোন করলাম বিভিন্ন নম্বরে। আমার বাসায় কেউ সাড়া দিল না। ব্রিগেডের বিভিন্ন ইউনিটে অফিসারদের ফোন করে কাউকে পেলাম না। মনে হলো সবাই পালিয়ে রয়েছে। অবশেষে জেনারেল জিয়াকে ফোন করলাম। অপারেটর আমার নাম শুনেই সংযোগ

কেটে দিল। এদিকে গৃহকর্তা বারবার আমাকে অনুরোধ করছেন, 'স্যার, আপনারা চলে যান, আমার বাসার সবাই ভয় পাচ্ছে।' অবশেষে বাসা থেকে বেরিয়ে বাড্ডা লেকের পাড়ে সৈনিকদের কাছে ফিরে এলাম। আমরা পাঁচজন অফিসার এবং জেসিও-এনসিওরা বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসলাম। সৈনিকেরা আমাকে বলল, 'স্যার, ক্যান্টনমেন্টে চলেন, যা হওয়ার হবে। আমরা বেঁচে থাকতে কেউ আপনাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আমি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। অফিসার মাত্রই টার্গেট সেপাইদের, এ পরিস্থিতিতে আমরা ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলেই সংঘর্ষ অনিবার্য। আমাদের কারণে সৈনিকদের জীবন বিপন্ন হোক, এটি কাম্য নয়। আমি অনেক বুঝিয়ে ৪০০ সৈনিককে ক্যান্টনমেন্টে ফেরত পাঠালাম। তাদের জানালাম, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরাও ফিরে আসব।

গভীর রাতে তারা ফিরে গেল ক্যান্টনমেন্টে নিজস্ব আবাসে। আমরা পাঁচজন অফিসার—লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর, মেজর ইকবাল, ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ, ক্যাপ্টেন তাজ এবং আমি চারজন সশস্ত্র সৈনিকসহ যাত্রা করলাম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউরের বাড়ি রূপগঞ্জ উপজেলায়। এলাকার রাস্তাঘাট মোটামুটি পরিচিত। বেরাইদে ফিরে এসে আমরা নয়জন একটি ডিঙিনৌকায় চড়লাম। নদীর ওপারে অবস্থিত এক বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলে মতিউরের সহপাঠী অমূল্যর বাড়ি, আশপাশে অন্য কোনো বাড়ি নেই। বাড়িতে গিয়ে অমূল্যকে কিংবা তার পরিবারের কাউকে পাওয়া গেল না। ৮ নভেম্বর সকালে ওই বাড়িতেই বসে আমরা পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলাপ করলাম। মতিউর বললেন, তিনি তাঁর বাড়ি রূপগঞ্জে যাবেন। ইকবাল আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর বাড়ি সুনামগঞ্জে, সেটি অবশ্য আমার শ্বশুরালয়। সন্ধ্যায় আমরা, অর্থাৎ ইকবাল, হাফিজুল্লাহ, তাজ ও আমি চারজন সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয়ভাবে একটি নৌকা সংগ্রহ করে নরসিংদীর উদ্দেশে রওনা দিলাম। আমরা চারজন সিভিল পোশাকে এবং সৈনিকেরা উর্দি পরিহিত। নদীর মাঝামাঝি এসে আমরা চারজনই ৭.৬২ চায়নিজ এসএমজি পানিতে ফেলে দিলাম। সৈনিকদের হাতে চায়নিজ রাইফেল রয়ে গেল। অস্ত্র ফেলে দেওয়ার পর নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হলো। সঙ্গে চারজন দুঃসাহসী সৈনিক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের নিরাপত্তা বিধান করছে। তাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেও তারা বলল, আমাদের সুনামগঞ্জে পৌঁছে দেওয়ার পরই তারা ফিরে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবে। দুই বছর আগেই ১ম ইস্ট বেঙ্গল থেকে বদলি হয়ে সেনা সদরে এসেছিলাম। দেখলাম এখনো টাইগার সংহতি কত সুদৃঢ়! জীবন ও

চাকরির পরোয়া না করে এ চার সৈনিক হাবিব, রতন, কাদের ও খালেক এ অনিশ্চিত যাত্রায় তাদের ভাগ্যকে আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে নিল।

৮ ডিসেম্বর বিকেলে মতিউর চলে গেলেন তাঁর বাড়ির উদ্দেশে। আমরা চারজন—ইকবাল, হাফিজুল্লাহ, তাজ ও আমি একটি প্যাসেঞ্জার লঞ্চে চড়ে নরসিংদী থেকে সুনামগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হই। সঙ্গে চারজন সশস্ত্র সৈনিক। পরদিন সুনামগঞ্জে পৌঁছে সৈনিকদের ঢাকার উদ্দেশে ফেরত পাঠালাম। তারা জানাল, ঢাকার পরিবেশ অনুকূল হলেই তারা এসে আমাদের নিয়ে যাবে।

কয়েক দিন গৃহবন্দীর মতো শ্বশুরবাড়িতে কাটালাম। কোথাও বের হইনি। শ্বশুর-শাশুড়ি পরলোকে, কিছু আত্মীয়স্বজন দেখা করে গেলেন। চার দিন পর ১ম বেঙ্গল থেকে আবার চারজন সৈনিক এসে জানাল পরিস্থিতি আগের তুলনায় ভালো, অফিসার নিধন বন্ধ হয়েছে। অতএব, এখন ঢাকায় ফেরা যায়। সিলেটে এসে ঢাকার উদ্দেশ্যে আমরা ট্রেনে চাপলাম। ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় এসে পুরান ঢাকায় হাফিজুল্লাহর ভাইয়ের বাসায় উঠলাম। ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার আগে সেখানকার পরিস্থিতি জানার জন্য পরিচিত অফিসারদের ফোন করলাম। যাদের ফোন করলাম, তারা সবাই ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত। আমার ফোন পেয়ে সবাই বিব্রত। কোনো ভালো পরামর্শ তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। বিডিআরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার দস্তগীর আমাকে খুব স্নেহ করেন। তাঁকে ফোন করলাম এবং ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাইলাম। তিনি খুবই আন্তরিকভাবে আলাপ করলেন। আমাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি জানালেন যে এখন সেনানিবাস ও সারা দেশে জিয়াউর রহমানের অবস্থান ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি জিয়ার সঙ্গে আমাদের ব্যাপারে আলাপ করে জানাবেন বলে আমাকে আশ্বস্ত করেন। আমার সঙ্গে কথা বলেই দস্তগীর বঙ্গভবনে গিয়ে জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন এবং আমার অফিসে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চান। জিয়া বললেন, আমি যেন অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল কর্নেল মইনুল হোসেনের সঙ্গে পরদিন টেলিফোনে আলাপ করি। তিনি মইনুলকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। দস্তগীর অফিসে ফিরেই আমাকে টেলিফোনে জিয়ার মনোভাব জানালেন। সে দুঃসময়ে তাঁর আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা ছিল হৃদয়স্পর্শী।

পরদিন সকালে এজি কর্নেল মইনুলকে ফোন করলাম। তিনি জানালেন, জিয়া তাঁকে আমাদের কথা বলেছেন। মইনুল মেজর মেহবুবকে একটি জিপসহ পাঠালেন আমাদের চারজনকে বেগমবাজার থেকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসার জন্য। ঘণ্টাখানেক পর মুক্তিযোদ্ধা মেজর মেহবুব (জেনারেল

মঞ্জুরের ভাগনে) নির্দেশিত এলাকায় এসে আমাদের একটি জিপে তুলে নিলেন।

পুরান ঢাকার অলিগলি পেরিয়ে ধীরে ধীরে জিপ এগিয়ে চলেছে ক্যান্টনমেন্টের পথে। মেহবুব জানাল, আমাদের ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি তাকে জানালাম, সেখানে যাওয়ার আগে আমি কিছু ব্যক্তিগত জিনিস সংগ্রহ করার জন্য ১ম ইস্ট বেঙ্গলে মিনিট দশেকের জন্য থামতে চাই। মেহবুব জানাল, 'নো প্রবলেম।' জাহাঙ্গীর গেট দিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ১ম ইস্ট বেঙ্গলে প্রবেশ করলাম। অফিসে দু-একজন জুনিয়র অফিসারের দেখা পেলাম। আমার আসার খবর পেয়েই পল্টনের জেসিও, এনসিওরা দৌড়ে আমাদের কাছে চলে আসে। আমি তাদের জানালাম, আমি চিফ জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আমাকে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার কাছের মানুষ, একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা জেসিওরা বলল, 'স্যার, আপনি আমাদের সঙ্গে এখানেই থেকে যান, অন্য কোথাও যাবেন না। বিপদ হতে পারে।'

আমি সেনা সদরের নির্দেশের বাইরে কিছু করতে চাচ্ছিলাম না, আমাকে নিয়ে আবার একটা গোলযোগ হোক, এটা আমার কাম্য নয়।

'আমি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে যাই। দেখা যাক কেমন আচরণ করা হয় আমাদের সঙ্গে। কোনো বড় সমস্যা হলে আপনাদের জানাব, তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।' আমি শান্তভাবে জানালাম। এদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই আমরা চারজন জিপে উঠে বসলাম।

জিপ এসে থামল আমারই অফিসের সামনে। আমার পরিবর্তে এখনো কাউকে ব্রিগেড মেজর হিসেবে পোস্টিং দেওয়া হয়নি। আমি গাড়ি থেকে নেমে আমার অফিসে ঢুকে বিএমের চেয়ারে বসলাম। টেবিলের অপর দিকে চেয়ারে বসল আমার তিন সঙ্গী। ব্রিগেডিয়ার মইনুলকে আবার ফোন করলাম। তিনি বললেন, 'ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতি এখনো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। তোমাদের গণভবনে পাঠাচ্ছি। সেখানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল গাফফার ও জাফর ইমাম রয়েছে। তোমরা তাদের সঙ্গী হয়ে সেখানেই থাকবে পরিবেশ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত।'

'অলরাইট স্যার।' আমার জবাব।

আমরা গণভবনে যাওয়ার জন্য গাড়ির অপেক্ষা করছি, এমন সময় একটি টেলিফোন এল আমার আর্মি নম্বরে। অপর প্রান্তে বেগম জিয়া, 'ভাই, আমি মিসেস জিয়া বলছি। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা সব সময় আপনার খোঁজখবর রাখব।'

‘থ্যাঙ্ক ইউ, ভাবি। আমাদের গণভবনে কিছুদিন থাকার কথা বলেছেন ব্রিগেডিয়ার মইনুল।’ আমি বললাম।

‘ইনশা আল্লাহ, কোনো অসুবিধা হবে না। খোদা হাফেজ।’ বেগম জিয়া বললেন।

‘ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।’ টেলিফোন রেখে দিলাম। সেনাপ্রধানের স্ত্রী স্বপ্রণোদিত হয়ে ফোন করায় কিছুটা আশ্বস্ত হলাম।

একটু পরই আমরা চারজন একটি জিপে উঠি। আমাদের নিয়ে আসা হলো শেরেবাংলা নগরে রাষ্ট্রপতির অফিস ও বাসভবন কমপ্লেক্স গণভবনে। বিশাল এলাকার ওপর গড়ে তোলা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন গণভবন। অফিস কমপ্লেক্স ও বাসভবন এলাকাকে বিভক্ত করেছে বিশাল সবুজ লন। রাষ্ট্রপতির অফিস কমপ্লেক্সটি দ্বিতল ভবন। দোতলায় বিন্যস্ত রয়েছে সারি সারি কক্ষ, মাঝখানে সুপরিসর করিডর। পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে রাষ্ট্রপতির বৃহদায়তন অফিস। এর উল্টো দিকে করিডরের অপর প্রান্তে রাষ্ট্রপতির সচিবের ঘর। আমাদের চারজনের জন্য এ ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৫ x ১৬ ফিট মাপের সুপরিসর ঘর, সঙ্গে সংযুক্ত বাথরুম। উত্তর পাশে বড় জানালা। চারটি সিঙ্গেল খাট এক সারিতে রাখা হয়েছে আমাদের জন্য। আমাদের রুমের পাশেই পশ্চিম প্রান্তে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট রুম। সেখানে কয়েক দিন ধরে রয়েছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল গাফফার বীর উত্তম ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাফর ইমাম বীর বিক্রম। আমাদের চারজনকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে তাঁরাও কিছুটা ধাতস্থ হলেন।

আমরা ঘরে ঢোকার ঘণ্টাখানেক পর একজন লেফটেন্যান্ট এসে আমাদের চারজনের হাতে একটি করে চিঠি ধরিয়ে দিলেন। পড়ে দেখি অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল ব্রাঞ্চের চিঠি, আমাদের গ্রেপ্তার করা হলো। এতক্ষণ আমাদের স্ট্যাটাস সম্পর্কে অন্ধকারে ছিলাম। কেমন আচরণ করা হবে বুঝতে পারিনি। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকারী প্রায় সব অফিসার, নৌবাহিনী প্রধান, বিমানবাহিনী প্রধানসমেত অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা তুলনামূলকভাবে জুনিয়র অফিসার, এ কারণে ততটা চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম না। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সিনিয়র অফিসারদের দায়ভার বেশি, আমরা জুনিয়ররা আজ্ঞাবহমাত্র, এটিই সামরিক বাহিনীর প্রচলিত নিয়ম। তবু গ্রেপ্তারের চিঠি পেয়ে অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলাম। সেনাবাহিনীতে আমি মোটামুটিভাবে পেশাগত দক্ষতার জন্য সুপরিচিত ছিলাম। কোনো কারণে গ্রেপ্তার হতে পারি, এমনটি কখনো কল্পনা করিনি। এ বাহিনী আমাদেরই হাতে গড়া। সব সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় ও সখ্য। নিজেকে অন্তরীণ ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। এজি মইনুল আমাকে বলেছিলেন

'আপাতত গণভবনে বিশ্রাম নাও। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই তোমাদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনব।' এটি তাহলে একটি ব্লাফ? ১ম বেঙ্গলের জেসিওদের অনুমানই সত্য হলো। আমাদের জন্য বিপদ অপেক্ষমাণ।

১৫ আগস্টে চেইন অব কমান্ড ভেঙে একদল মেজর রাষ্ট্রপতিকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করে দেশে নানা ধরনের অপকর্ম করে যাচ্ছিলেন। সংবিধান লঙ্ঘন করে দেশে অরাজকতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেনা কর্তৃপক্ষের মুরোদ হয়নি এদের প্রতিহত করার। চেইন অব কমান্ড পুনরুদ্ধার করার জন্য সিজিএস এবং ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডারের নেতৃত্বে আমরা একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খুনি মেজরদের অপসারণ করে দেশকে অরাজক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করলাম। প্রধান বিচারপতিকে অন্তর্বর্তীকালীন দলনিরপেক্ষ সরকারের প্রধান নিয়োগ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা করলাম। এর জন্য পুরস্কার হিসেবে পেলাম গ্রেপ্তার! ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে ঢাকা গ্যারিসনের সব সিনিয়র অফিসার জড়িত ছিলেন। নৌবাহিনী প্রধান ও বিমানবাহিনী প্রধান খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেলের র‍্যাঙ্ক পরিয়ে দেন। কিন্তু অভিযুক্ত হলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কের জুনিয়র অফিসাররা।

আমরা গণভবনে যাওয়ার পরবর্তী দুই দিনের মধ্যেই বেশ কয়েকজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করে আমাদের পাশের কয়েকটি ঘরে অন্তরীণ করা হলো।

গ্রেপ্তারকৃত অফিসাররা হলেন :

১. কর্নেল আবদুল মালেক

২. লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাফর ইমাম বীর বিক্রম

৩. লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল গাফফার হালদার বীর উত্তম

৪. মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম

৫. মেজর ইকবাল হোসেন চৌধুরী

৬. মেজর আমিনুল ইসলাম

৭. মেজর নাসির উদ্দিন

৮. ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ

৯. ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলাম

১০. ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কবির বীর প্রতীক

১১. ক্যাপ্টেন দীপক দাস।

৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল বীর বিক্রমকে আগেই গ্রেপ্তার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য এই গ্রেপ্তার অধ্যায় এক অকল্পনীয় ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধে

বিভিন্ন রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধারা অন্তরীণ। খালেদ মোশাররফ, নজমুল হুদা ও হায়দারের মতো প্রখ্যাত যোদ্ধারা নিহত! সেনাবাহিনীর অপারেশনাল ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার পথে।

বিমানবাহিনীর ভেতরে চিত্রটা ছিল অন্য রকম। ৭ নভেম্বর দুপুরে ঢাকা বিমানঘাঁটির ৫০৭ কনফারেন্স রুমে বিমানবাহিনীর উপপ্রধান এয়ার কমোডর খাদেমুল বাশার অভ্যুত্থানকারী অফিসারদের জানিয়ে দেন যে বৈমানিক অফিসাররা জাতীয় স্বার্থে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছেন, সুতরাং কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু পরদিনই এম জি তাওয়াব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে কয়েকজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করেন। তাঁরা হলেন :

১. স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত আলী খান বীর উত্তম
২. স্কোয়াড্রন লিডার বদরুল আলম বীর উত্তম
৩. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ওয়ালীউল হক খোন্দকার
৪. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মিজানুর রহমান
৫. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশীদ
৬. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সালাহউদ্দিন রহমত উল্লাহ
৭. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামাল উদ্দিন আহমদ
৮. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম এ কাইয়ূম।

দুই দিনের মধ্যেই উপরিউক্ত অফিসারদের ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শালে বিচার করা হয়। স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতকে মৃত্যুদণ্ড, স্কোয়াড্রন লিডার বদরুল আলমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য অফিসারদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়। পরবর্তী সময়ে একপর্যায়ে লিয়াকতের মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। চাকরি থেকে বরখাস্তকৃত দণ্ডপ্রাপ্ত অফিসারদের দেশের বিভিন্ন কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার আবুল মঞ্জুর সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ পদে যোগদান করেন এবং সেনানিবাসে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য জিয়াউর রহমানকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। গণভবনের অফিস কমপ্লেক্সে আমাদের অবস্থানের ১৫ দিন অতিবাহিত হলো। আমরা এতজন বন্দী অফিসার গল্পগুজব করে দিন কাটাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে, সেনা কর্তৃপক্ষ তা স্থির করতে পারেনি। জিয়া ও মঞ্জুর আমাদের বিচারের বিরোধী ছিলেন। জিয়া জানেন অভিযান তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালনা করা হয়নি। তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করা হয়েছে স্বল্পকালীন বন্দিত্বের সময়। ৩ নভেম্বরের টার্গেট ১৫ আগস্টের খুনি মেজররা এবং খন্দকার মোশতাক। জিয়া নিজেই পদত্যাগ না করলে তাঁকে সম্মানজনক অবস্থানেই রাখা হতো।

৩ নভেম্বর রাতে খন্দকার মোশতাক ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল রশিদ জিয়াকে ফোন করে অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু জিয়া তাতে সাড়া দেননি। রশিদ লন্ডনের পত্রিকায় পরবর্তীকালে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেন যে জিয়া নিজেই তাঁর বিশ্বস্ত অফিসারদের মাধ্যমে ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক।

দুঃসাহসী অজানা ইতিহাস

গণভবন কমপ্লেক্সে অবস্থান করছিল প্রেসিডেন্টস গার্ড রেজিমেন্টের কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল মতিন*। এই রেজিমেন্টের সৈনিকেরাই আমাদের পাহাড়ায় নিযুক্ত ছিল। অফিস কমপ্লেক্সের দোতলার ৬টি ঘরে আমরা ১১ জন ছিলাম। একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা মাঝবরাবর। চারজন সশস্ত্র সৈনিক ২৪ ঘণ্টাই এটি পাহারা দিত। কারণ, পালাতে হলে এই সিঁড়িই ব্যবহার করতে হবে। আমাদের প্রতিটি ঘরের জানালা বরাবর নিচে একতলায় একজন সৈনিক সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন থাকে। আমরা যাতে লাফিয়ে পড়ে পালাতে না পারি, সে জন্য কড়া পাহারায় নিয়োজিত ছিল সৈনিকেরা। অফিসার-স্বল্পতার কারণে প্রতিদিন একজন অফিসার বন্দীদের এসকর্ট অফিসারের দায়িত্ব পালন করতেন।

আমাদের সঙ্গে সেনা কর্তৃপক্ষ ভালোই ব্যবহার করছিল। অফিসার মেস থেকে আমাদের খাবার আসত। সপ্তাহে এক দিন আত্মীয়স্বজন দেখা করতে আসতেন। বিমানবাহিনীর অফিসারদের কোর্ট মার্শাল সেনা কর্তৃপক্ষের ওপর আমাদের বিচারের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু জিয়া ও মঞ্জুর আরও সময়ক্ষেপণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। একমাত্র ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত জিয়াকে বিচারের জন্য পরামর্শ দিচ্ছিলেন। একদিন শওকত সকালের দিকে আমাদের দেখার জন্য গণভবনে এলেন। আমাদের সবাইকে একটি ঘরে বসিয়ে তিনি কিছু কঠিন কথা শোনালেন। তাঁর মতে, অবিলম্বে আমাদের সবাইকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দেওয়া উচিত। আমরা নীরবে তাঁর দম্ভোক্তি শুনে গেলাম।

সপ্তাহখানেক পর আমাদের দেখতে এলেন ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর, আবেগ লুকানোর জন্য কালো সানগ্লাস পরা। আবার একটি ঘরে আমরা সমবেত

---

* পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল। ওয়ান-ইলেভেনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা।

হলাম। মঞ্জুর অত্যন্ত হৃদয়বান ব্যক্তি। আমাদের দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন! তিনি অশ্রু লুকানোর জন্য সচেষ্ট হলেন। বললেন, 'আমি বিদেশে ছিলাম। দেশে থাকলে এমনটি হতে দিতাম না। তোমাদের ছাড়া কীভাবে এ সেনাবাহিনী চলবে?' পরিশেষে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন, 'চিন্তা কোরো না, আমার পক্ষে যা কিছু সম্ভব, সবই করব। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।' বিষণ্ন মঞ্জুর বিদায় নিলেন।।

১১ জন অফিসার আমরা গল্পগুজব, অতীতের স্মৃতিচারণা, ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে চর্বিত চর্বণ করে একঘেয়ে দিন কাটাচ্ছি। আশপাশের রুমে যাওয়া যায় কিন্তু নিচে নামার অনুমতি নেই। দোতলার সিঁড়িতে কড়া পাহারা। জানালার নিচে দণ্ডায়মান সেন্ট্রি সদা সতর্ক। সপ্তাহের এক দিন মিলনমেলা বসে। সবার আত্মীয়স্বজনের পদচারণে মুখর একটি বিকেল। সারা সপ্তাহ আমরা এর অপেক্ষায় থাকি। মলিন মুখে আমাদের স্ত্রীরা দেখা করতে আসেন। বিমানবাহিনীর অফিসারদের কোর্ট মার্শাল ও কর্নেল শাফায়াতের জেলবাস তাঁদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আমরা তাঁদের আশ্বাস দিই। কিন্তু তাঁরা কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। একদিন আমার আব্বা দেখা করতে এলেন। চুপচাপ ছিলেন। কেবল একটি কথাই বললেন, যা আজীবন মনে থাকবে, 'Variety is the spice of life.' যাওয়ার আগে বললেন, 'চিন্তা কোরো না, আল্লাহ ভরসা।' আমার বন্ধুদের মধ্যে দুজন সরকারের উপসচিব তওফিক-ই-ইলাহী ও শাহ মোহাম্মদ ফরিদ দেখা করতে এসে সহমর্মিতা জানিয়ে গেল। একটি বিষয় খারাপ লাগত, আমার মাত্র দেড় বছর বয়সী শিশুপুত্র শাহরুখ অভিমান করে আমার কোলে আসতে চাইত না। অনেক সাধ্যসাধনার পর একসময় আসত, কিন্তু বিদায়ের সময় আর কোল থেকে নামতে চাইত না। এতটুকু শিশুও দেখা না হওয়ার কারণে অভিমান করে, দেখে আশ্চর্য হলাম!

দিনগুলো গল্পগুজবে ভালো কাটলেও রাতে সবাই বন্দিত্বের জ্বালা উপলব্ধি করতাম। আশা-নিরাশার দোলাচলে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় থাকতাম। এ দুঃসময়ে আমাকে মানসিকভাবে চাঙা রেখেছে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কয়েকজন এনসিও। সেনা ফুটবল টিমের আসাদ, মোকতার, শামসু এবং কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক তিন-চার দিন পরপর এসে দেখা করে যেত। সিপাই সিপাই ভাই ভাই, সুতরাং তাদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই। তারা বলত, 'স্যার, আপনি যদি হুকুম দেন, যেকোনো দিন দলবল নিয়ে এসে আপনাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব। কারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই।' সেনা শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি, এটি তারা করতেই পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু আমি নতুন কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাইনি। তাদের শুধু

বললাম, 'তেমন বিরূপ পরিস্থিতি দেখলে খবর পাঠাব, তোমরা এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।' দুঃসময়ে তাদের সহমর্মিতা দেখে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম চার মাস ১ম ইস্ট বেঙ্গলে আমিই একমাত্র অফিসার ছিলাম। আমার নেতৃত্বেই যশোর ক্যান্টনমেন্টে পল্টন বিদ্রোহ করে। যুদ্ধ চলাকালে আমিই ৬০০ সৈনিককে রিক্রুট করে এই ব্যাটালিয়নকে নতুনভাবে গঠন করি। শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ব্যাটালিয়ন সংগঠিত করার সময় আমি সৈনিকদের শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ ভালোবাসা অর্জন করি, যা আমার জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। আমাকে গ্রেপ্তার করার পরপরই ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তারা প্রকাশ্যেই বলাবলি করতে লাগল, 'কেন মেজর হাফিজকে গ্রেপ্তার করা হলো? তাঁর অপরাধ কী?' ঢাকা সেনানিবাসে তখনো শৃঙ্খলা পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ৭ নভেম্বরের সিপাহি বিদ্রোহের পর অফিসারদের কমান্ড কন্ট্রোল ভেঙে পড়ে। তাঁরা সৈনিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হলেন। ১৩ জন অফিসারের হত্যাকাণ্ড দেখে অধিকাংশ অফিসার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন। অনেকেই পরিবারকে সেনানিবাসের বাইরে পাঠিয়ে দেন। বিভিন্ন ইউনিটে কমান্ডিং অফিসার থাকা সত্ত্বেও অফিসাররা সৈনিকদের হুকুম দিতে সংকোচ বোধ করতেন। সৈনিকদের একটি বড় অংশ অফিসারদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করত না। সৈনিকেরা সেনাপ্রধান জিয়া ছাড়া অন্যদের তোয়াক্কা করত না। ১২ দফা দাবির মধ্যে একমাত্র ব্যাটম্যান প্রথা রহিত করা ছাড়া অন্য কোনো দাবি পরবর্তী কয়েক মাসেও পূরণ করা সম্ভবপর হয়নি। জিয়া ও মঞ্জুরকে প্রায়শ বিভিন্ন সেনানিবাসে সৈনিকদের শৃঙ্খলা বিধান করার জন্য সরাসরি ইউনিটে গিয়ে মধ্যস্থতা করতে হতো।

১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকদের ক্ষুব্ধ মনোভাব জানতে পেরে সেনা কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ১২ ঘণ্টার নোটিশে ব্যাটালিয়নকে ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠিয়ে দেয়। গণভবনে এ সংবাদ পাওয়ার পর আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি। নিজেকে প্রথমবারের মতো অসহায় মনে হলো।

বন্দী অবস্থায় প্রথম দিকে মনে হতো, আমাদের কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। কারণ, জিয়া ও মঞ্জুর আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। অবস্থা খুবই সঙিন হলে হয়তো বড়জোর আমাদের চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে বন্দিত্বের প্রায় দুই মাস কেটে গেল। আমাদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরতে থাকে ক্রমান্বয়ে। সেনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রথমে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ ডিজিএফআইয়ের কর্মকর্তা স্কোয়াড্রন লিডার আজিজ গণভবনে এসে

আমাদের সবার কাছ থেকে ঘটনার লিখিত বিবরণ (স্টেইটমেন্ট) সংগ্রহ করেন। সবাই জানালেন, তাঁরা নির্দোষ, উপরস্থ কর্মকর্তার (সুপিরিয়র অফিসার) নির্দেশেই তাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন। এর দুই সপ্তাহ পর সেনা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের পরিচালক (ডিএমআই) মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহসীন গণভবনে এসে জানালেন, পরবর্তী কোনো এক সময় আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ (সামারি অব এভিডেন্স) লিপিবদ্ধ করা হবে। এবার আর বোঝার বাকি থাকল না যে আমাদের কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হবে। দুশ্চিন্তার বিষয়!

মহসীনের ভিজিটের পর বন্দী অফিসারদের মধ্যে হতাশা জন্ম নেয়। সবচেয়ে নার্ভাস হয়ে পড়েন কর্নেল মালেক ও গাফফার। গাফফার দিনরাত বলতে গেলে জায়নামাজেই কাটাতেন। কারও সঙ্গে তেমন বাক্যালাপ করতেন না। বিপদ থেকে মুক্তির জন্য ইবাদত-বন্দেগি করেই সময় কাটাতেন। আমাদের ঘরের চারজনের মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। আগের মতোই হাসিখুশি ছিলাম আমরা। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের এসকর্টরূপে দায়িত্ব পালন করত সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত তরুণ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শাহ ইকবাল। ১১ জন সিনিয়র অফিসারের পাহারা দিতে গিয়ে সে হিমশিম খেত। আমরাও তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতাম। সে-ও আস্তে আস্তে আমাদের সাহচর্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কর্নেল মালেক আমাদের মধ্যে সিনিয়র। তার চাকরির বয়স ইকবালের বয়সের চেয়েও বেশি। একদিন সরল মনে ইকবাল আমাকে প্রশ্ন করে, 'স্যার, আপনারা ১১ জন অফিসার একসঙ্গে আছেন, কিন্তু এ রুমের চারজন (আমরা) ছাড়া বাকিরা এত বিষণ্ন থাকেন কেন?' আমি কোনো উত্তর দিইনি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাফর ইমাম। তিনি সারাক্ষণ মোটামুটিভাবে হাসিখুশি থাকতেন। তাঁর মুখে নোয়াখালীর হুজুরদের মাহফিলের ওয়াজ শুনে আমরা হেসে কুটিকুটি হতাম।

সামারি অব এভিডেন্সের কথা শুনেই রাতে আমাদের ঘরের চারজন বৈঠকে বসি। সবাই একমত হলাম যে গণভবন থেকে পালাতে হবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও। পালানো খুবই কঠিন। আমাদের প্রহরার জন্য দুই স্তরবিশিষ্ট প্রতিরক্ষাবেষ্টনী স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম বলয়ে রয়েছে অফিস কমপ্লেক্সে সদা সতর্ক প্রহরীরা। দোতলা থেকে নিচে নামতে হলে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে, যা চারজন সশস্ত্র সৈনিক সার্বক্ষণিকভাবে পাহারা দিচ্ছে। দোতলা থেকে জানালা দিয়ে লাফ দিলে পা ভাঙার সমূহ আশঙ্কা।

এ ছাড়া প্রতিটি জানালার নিচে রয়েছে একজন সশস্ত্র প্রহরী। ২য় বলয়ে রয়েছে গণভবনের সীমানাপ্রাচীরের ওপর নির্মিত সেন্ট্রি বক্সসমূহের মধ্যে

প্রহরারত সশস্ত্র সৈনিকেরা। অফিস কমপ্লেক্স থেকে কোনোভাবে বের হলেও সীমানাপ্রাচীরের সেন্ট্রি বক্সের সৈনিকদের এড়িয়ে যাওয়া কঠিন হবে। গার্ড রেজিমেন্টের সৈনিকদের বৃহৎ অংশ বিভিন্ন কোর ও সার্ভিস থেকে নেওয়া, এদের অধিকাংশই পাকিস্তান-প্রত্যাগত। পালানোর উদ্যোগ নিলে এরা গুলি করতে দ্বিধা করবে না। সুতরাং পালানোর চেষ্টা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবু আমাদের মাথায় বিভিন্ন প্ল্যান ঘুরতে থাকে।

একদিন সৌভাগ্যক্রমে পালানোর পথ খুঁজে পেলাম অপ্রত্যাশিতভাবে। দোতলার করিডরের উভয় দিকে, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ পাশে সারি সারি অফিস ঘর। আমরা বন্দীরা বসবাস করি উত্তর দিকের ঘরগুলোতে। করিডরের দক্ষিণ পাশের ঘরগুলো বন্ধই থাকে। আমাদের ঘরের উল্টো দিকে রাষ্ট্রপতির বৃহদায়তন অফিস ঘর। আমাদের গণভবনে আসা অবধি ঘরটি বন্ধ রয়েছে। একদিন সকালে হঠাৎ ঘরটির তালা খুলে একজন সুইপার ভেতরে ঢোকে ঘরটি ঝাড়ু দেওয়ার জন্য। ক্যাপ্টেন তাজ করিডরে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে রাষ্ট্রপতির অফিস ঘরের মধ্যেও একটি সিঁড়ি রয়েছে। কেবল রাষ্ট্রপতির ব্যবহারের জন্য এই সিঁড়ি, যেটি ব্যবহার করে তিনি একতলা থেকে সরাসরি দোতলায় তাঁর অফিস ঘরের ভেতরে যেতে পারতেন। ১৫ আগস্টের পর থেকে এ সিঁড়ি এবং অফিস ঘর কেউ ব্যবহার করেনি। এর অবস্থান সম্পর্কে সুইপার, কেয়ারটেকার এমন কয়েকজন ছাড়া অন্যদের ধারণা নেই।

সুইপার রুম পরিষ্কার করে বেরিয়ে গেলে তাজ আমাদের রাষ্ট্রপতির অফিস ঘরের ভেতরে সিঁড়ির কথা জানাল। আমরা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক, এই সিঁড়িটি ব্যবহার করেই আমাদের পালাতে হবে। সেদিনই আমাদের ঘরের জানালার একটি হুক খুলে তাজ এটির অগ্রভাগকে ফ্লোরে ঘষে ঘষে সুচালো পেরেকের মতো করে গড়ে তোলে। ১৫ ফুট চওড়া করিডরের মাঝবরাবর সিঁড়িতে চারজন সৈনিক প্রহরা দেয়। তাদের অবস্থান একতলা-দোতলার মধ্যবর্তী ল্যান্ডিংয়ে। প্রায় দুই মাস কেটে গেছে। প্রহরীরাও কিছুটা ঢিলেঢালাভাবে দায়িত্ব পালন করছে। দোতলার করিডরে অফিসাররা সারাক্ষণ চলাফেরা, গল্পগুজব করে। তাই তারাও করিডর ছেড়ে মধ্যবর্তী ল্যান্ডিংয়েই পাহারা দিচ্ছে। তারা জানে, দোতলা থেকে নিচতলায় নামতে হলে সিঁড়িটির ল্যান্ডিংই ব্যবহার করতে হবে। তাই এখানে তারা কড়া পাহারা রেখেছে ২৪ ঘণ্টা। আমাদের বসবাসের ঘরগুলোতে জানালার নিচে একতলায় সার্বক্ষণিক পাহারায় রয়েছে একজন গার্ড। রাতে জানালা খোলা নিষিদ্ধ। কেউ খুললেই নিচ থেকে রূঢ়ভাবে গার্ড বলে, 'জানালা বন্ধ করেন।' স্যার-ট্যার বলা ছেড়ে দিয়েছে ৭ নভেম্বরের পর থেকে। সুতরাং জানালা বেয়ে

কিংবা লাফ দিয়ে নিচে নামাও সম্ভব নয়। গভীর রাতে তাজ হুকের তীক্ষ্ণ শলাকা ব্যবহার করে একসময় রাষ্ট্রপতির অফিস ঘরের Yale তালাটি খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকে সিঁড়িটি দেখে আসে। এটি ব্যবহার করে সহজেই একতলার দক্ষিণ প্রান্তের লনে নেমে আসা যায়। অফিস রুম তালাবদ্ধ করে দ্রুত আমাদের ঘরে ফিরে এসে পরিস্থিতি জানায়। আমরাও পালানোর জন্য সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকি।

গণভবন থেকে পালানোর ব্যাপারে দু-একজন সহবন্দীর মনোভাব যাচাই করলাম। তাঁরা কেউই নতুন কোনো ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নিতে রাজি নন। জাফর ইমাম বললেন, 'আমার পরিবার আমাদের মুক্তির জন্য এক জিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। জিন বর্তমানে আফ্রিকায় অবস্থান করছেন। তিনি বাংলাদেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি কোনো রিস্কি পদক্ষেপ নেব না।'

আমরা পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি গোপনে। অফিস ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে লনে নেমে বাসভবন কমপ্লেক্সের পাশ দিয়ে গণভবনের সীমানাপ্রাচীর পর্যন্ত অন্তত দুই শ গজ পথ পেরোতে হবে আমাদের। এ পথে অফিসার কিংবা অফিসার মেসের কর্মচারীদের সামনে পড়ে যেতে পারি। সীমানাপ্রাচীরে রয়েছে বেশ কয়েকটি সেন্ট্রি পোস্ট, যেখানে সশস্ত্র প্রহরী সার্বক্ষণিকভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকে। সুউচ্চ প্রাচীর টপকাতে হলে সেন্ট্রি পোস্টের ভেতরে ঢুকে প্রাচীরের ওপরে উঠতে হবে।

আমাদের যারা খাবার সার্ভ করে, সেই মেস ওয়েটারদের একজন শফি, বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত। নেতার প্রসঙ্গ এলে তার চোখে জল নেমে আসে। সে আমাদের ওপর খুবই খুশি। আমরা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের দেশ থেকে তাড়িয়েছি। খুনি মোশতাককে গদি থেকে নামিয়েছি! তাকে একদিন কনফিডেন্সে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের পালানোর ব্যাপারে কোনো সাহায্য করবে কি না। একটু ভড়কে গেলেও সে রাজি হলো। কথা প্রসঙ্গে জানাল, প্রাচীরের প্রতিটি সেন্ট্রি পোস্টে রাতে প্রহরী থাকে না, দু-চারটি পোস্ট খালিও থাকে। আমি তাকে দায়িত্ব দিলাম আমাদের নিকটতম একটি সেন্ট্রি পোস্ট চিহ্নিত করার জন্য, যেখানে রাতে পাহারা থাকে না। দুই দিন পর শফি আমাদের একটি সেন্ট্রি পোস্টের অবস্থান জানাল। রাষ্ট্রপতির বাসভবনের পশ্চিম প্রান্তে প্রথম পোস্টটিতে রাতে কোনো প্রহরী থাকে না। আমরা আশান্বিত হলাম। এই পোস্টের মধ্য দিয়ে প্রাচীর টপকে নিচে লেক সড়কে নামার পর একটি গাড়ি পেলে দ্রুত পালাতে সুবিধা হবে। আমরা একটি গাড়ি সংগ্রহে তৎপর হলাম। তাজের বন্ধু খোকা একটি গাড়ি গ্যারেজের মালিক। সপ্তাহে এক দিন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাকে বললাম, আমাদের সংকেত পেলেই নির্দিষ্ট তারিখে রাত সাড়ে নয়টায় লেক এবং

জাতীয় সংসদ ভবনের মধ্যবর্তী সড়কে নির্দিষ্ট সেন্ট্রি পোস্টের কাছাকাছি একটি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। বিপদে বন্ধুর পরিচয়, খোকা রাজি হলো এ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সাহায্য করতে।

পরবর্তী সাক্ষাৎকার দিবসে আমরা স্ত্রী ও স্বজনদের কাছে পালানোর প্ল্যান জানালাম। তারা আঁতকে ওঠে। অবশেষে আমাদের পীড়াপীড়িতে সহযোগিতা করতে রাজি হলো। আমাদের ঘরে আমি ছাড়া তিনজনই অবিবাহিত। তাদের ঝক্কি-ঝামেলা কম। আমি স্ত্রী দিলারাকে একটি কোডওয়ার্ড জানালাম। 'আমার টেট্রনের ইউনিফর্ম পাঠাও'—এ মেসেজ পেলে সে বুঝবে আজ রাত সাড়ে নয়টায় আমরা গণভবন থেকে পালানোর উদ্যোগ নেব। তার করণীয় হলো শিশুপুত্র শাহরুখ ও ব্যাটম্যান গোলাপ মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেডিয়ামে অবস্থানরত ১ম ইস্ট বেঙ্গলে উপস্থিত হওয়া। আমরা সেখানেই মিলিত হব। আমাদের দর্শনার্থী স্বজনেরা সেদিন বিদায়ের মুহূর্তে বহু কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। কেউ জানে না আবার দেখা হবে কি না। আমাদের কারণে পরিবারের কী ভোগান্তিই না হচ্ছে। আমাদের সৃষ্ট সেনাবাহিনীতে আমরাই বন্দী!

১৫ জানুয়ারি ১৯৭৬, রাত সাড়ে নয়টায় গণভবন থেকে পালানোর জন্য দিনক্ষণ স্থির হলো। সকাল নয়টায় মেস ওয়েটারকে পাঠালাম তিনজনের কাছে, কোড ওয়ার্ডসহ। আমার স্ত্রীর কাছে চিরকুট পাঠালাম, 'আমার টেট্রনের ইউনিফর্ম পাঠাও।' তাজের বন্ধু খোকা ও দুলাভাই পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের কাছেও সাংকেতিক বার্তা পাঠালাম। বাহক ওয়েটার শুধু সাংকেতিক বার্তা পৌঁছে দিল। এর মর্মার্থ সে-ও জানত না। আমার স্ত্রী ইডেন গার্লস কলেজের প্রভাষক। কলেজ ক্যাম্পাসে সুপারের খালি বাড়িতে অবস্থান করছিল। সংকেত পেয়েই ব্যাগ গুছিয়ে শিশুপুত্র শাহরুখ ও ব্যাটম্যান গোলাপকে নিয়ে বিকেলে ট্রেনযোগে রওনা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশে। তাজের দুলাভাই রাত নয়টা থেকে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে নির্দিষ্ট স্থানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। খোকা একটি গাড়ি সংগ্রহ করে যথাসময়ে আমাদের পিকআপ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

সংকেত পাঠানোর পর থেকে আমাদের হার্টবিট বাড়তে লাগল। বেলা দুইটার মধ্যেই ওয়েটার ফিরে এসে ওকে রিপোর্ট—'সবকিছু ঠিকঠাক' জানানোর কথা। দুইটা বাজল, তিনটা বেজে গেল, সে ফিরে আসছে না! আমাদের উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। অবশেষে চারটার দিকে ওয়েটার ফিরে এসে চিরকুট হস্তান্তরের 'ওকে' রিপোর্ট দিল। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। রাত সাড়ে আটটার আগেই ডিনার সেরে আমাদের রুমের চারজনই আমরা

লাইট অফ করে শুয়ে পড়লাম। ডিউটি অফিসার শাহ ইকবালের সেদিন অফ ডিউটি। রাত পৌনে নয়টায় সে গল্পগুজব করার জন্য আমাদের রুমে আসে। আমরা শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে তাকে বিদায় করলাম।

'অন্য রুমে গিয়ে গপসপ করো।' বললাম আমি।

'স্যার, অন্যরা বিষণ্ন থাকে, গল্পসল্প করার মুড নেই তাদের।' ইকবাল বলল।

'আজ খুব মাথা ধরেছে, কাল এসো আমাদের রুমে।' আমি বললাম।

ইকবাল চলে গেল, কিছুই সন্দেহ করেনি সে।

রাত সাড়ে নয়টায় আমাদের দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হলো। আমাদের রুমের দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখলাম, করিডরে কেউ নেই। না কোনো বন্দী, না কোনো প্রহরী। সিঁড়ির গার্ডরা একতলা-দোতলার মাঝামাঝি ল্যান্ডিং ডিউটি করছে। তাদের কথোপকথনের শব্দ ভেসে এল। তাজ দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যেই তীক্ষ্ণ শলাকা ব্যবহার করে করিডরের উল্টো দিকে রাষ্ট্রপতির অফিস ঘরের তালা খুলে ফেলে। একে একে আমরা চারজন মিনিটখানেকের মধ্যেই অন্ধকার অফিস ঘরে ঢুকি। ঘরের ভেতরে সিঁড়িটি বেয়ে একতলায় নেমে আসি মুহূর্তের মধ্যে। সিঁড়ির মুখে দরজাটি খুলে একতলায় সবুজ লনের ঘাসে পা ফেললাম সন্তর্পণে। লনে যে কারোরই সামনে পড়ে যেতে পারতাম। ভাগ্যক্রমে সেখানে কেউ ছিল না। দ্রুত পায়ে লন অতিক্রম করার একপর্যায়ে এক কিশোর আমাদের দেখে ফেলে। সে লেফটেন্যান্ট ইকবালের সিভিলিয়ান ব্যাটম্যান। সে আমাদের দেখে কিছুটা অবাক হলেও কোনোরূপ চেঁচামেচি করেনি। সে দোতলায় গিয়ে ইকবালের খোঁজ করে, কিন্তু তার দেখা পায়নি। আমরা আবছা অন্ধকারের মধ্যেই অতি দ্রুত পায়ে হেঁটে রাষ্ট্রপতির বাসভবন কমপ্লেক্সের পশ্চিম প্রান্তের সবুজ লন পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম গণভবনের সীমানাপ্রাচীরের পাদদেশে। আমাদের ঘর থেকে সীমানাপ্রাচীর প্রায় দুই শ গজ দ্রুত হেঁটে পেরিয়ে এলাম। রাত মাত্র সাড়ে নয়টা। ভাগ্যক্রমে কারও সামনে পড়ে যাইনি! সামনেই প্রথম যে সেন্ট্রি পোস্ট পেলাম, সেটি শফির ভাষ্যমতে খালি থাকার কথা। খালিই ছিল। সরাসরি এর মধ্যে ঢুকে একে একে আমরা চারজনই সীমানাপ্রাচীরের কার্নিশ ধরে নিচে রাস্তায় লাফিয়ে নামলাম।

প্রাচীর থেকে লাফিয়ে লেকসংলগ্ন রাস্তায় নেমে চারদিকে তাকালাম। কেউ কোথাও নেই। অথচ এখানেই গাড়িসহ খোকার থাকার কথা! এখানে অপেক্ষা করা বিপজ্জনক, তাই দ্রুত হেঁটে চললাম দক্ষিণ দিকে, আসাদ গেটের উদ্দেশ্যে। সংসদের ডেপুটি স্পিকারের বাসভবনসংলগ্ন সরু রাস্তা ধরে কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম আসাদ গেটের উল্টো দিকের পেট্রলপাম্পে।

রাস্তায় একটি অটোরিকশা থামিয়ে আমরা চারজন উঠে বসলাম। চালককে বললাম, 'চলেন সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে।' জনবিরল রাস্তায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে আমাদের-বাহন অটোরিকশা। আমরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছি রুদ্ধশ্বাসে, নিরাপদে বেরিয়ে এসেছি। সৌভাগ্যক্রমে কারও সামনেই পড়িনি, একজন ছাড়া। সেই একজন ইকবালের কিশোর ব্যাটম্যান, তার স্যারের অপেক্ষায় নিচতলায় ঘুরঘুর করছে। আধা ঘণ্টা পর ইকবাল একতলায় নেমে এলে ব্যাটম্যান একথা-সেকথার পর ক্যাজুয়াল গলায় বলে, 'স্যার, হাফিজ স্যারের রুমের চারজন অফিসারকে কিছুক্ষণ আগে নিচতলার লনে হাওয়া খেতে দেখলাম।' ইকবালের আক্কেলগুড়ুম! বলে কী! দ্রুত দোতলায় আমাদের ঘরে ঢুকে দেখে পাখিরা উড়ে গেছে। সবকিছুই স্বাভাবিক। ডিউটি অফিসার অন্য রুমের অফিসারদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। সিঁড়িতে চারজনের সতর্ক পাহারা। ঘরগুলোর জানালার নিচে প্রহরীরা ডিউটি করছে। সবাই আছে—শুধু আমরা চারজন ছাড়া। নিচে নামল কীভাবে, অবিশ্বাস্য!

মুহূর্তের মধ্যেই অ্যালার্ম সাইরেন বেজে ওঠে প্রেসিডেন্টস গার্ড রেজিমেন্টে। অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিন হতবাক। দিন পনেরো আগেই তার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের দিনে প্রীতিভোজের ভাগ আমরা বন্দীরাও পেয়েছিলাম বিকেল চারটার দিকে দীর্ঘ অপেক্ষার পর। খাবার বলতে উচ্ছিষ্ট, তাও ঠান্ডা ও বিস্বাদ!

ছোট ছোট গ্রুপে অফিসারদের নেতৃত্বে প্যাট্রল পার্টি বেরিয়ে গেল গভীর রাতে। আমাদের চারজনকে যেভাবেই হোক, গ্রেপ্তার করতে হবে। প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের প্রেস্টিজ পাংচার হওয়ার পথে!

আমাদের বের হওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই পলায়নের দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। প্যাট্রল পার্টি, পুলিশ কড়া পাহারা বসায় ঢাকা থেকে সড়কপথে নির্গমনের প্রধান সড়কগুলোতে। রাত ১০টায় সীমানাপ্রাচীর-সংলগ্ন রাস্তায় তারা পেয়ে যায় খোকাকে। খোকা আসতে ১০ মিনিট দেরি করে। নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বনেট খুলে মেরামত করার ভান করছিল। এমন সময় প্যাট্রল পার্টি এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সে গাড়ি খারাপের অজুহাত দেয়। সৈনিকেরা বলে, 'ব্যাটা, জলদি ভাগ এখান থেকে।'

খোকা ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট করে এবং দ্রুত বাড়ি ফিরে যায়। তার বুঝতে বাকি থাকে না যে আমরা বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে পড়েছি। সারা দেশে পুলিশ বাহিনী ও সামরিক স্থাপনাসমূহে ফ্ল্যাশ মেসেজ দেওয়া হয় আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে সতর্কতা জারি করে। চেকপোস্ট, রোড জংশনগুলোতে পাহারা জোরদার করা হয়।

আমরা রাত সাড়ে ১০টায় পৌঁছে গেলাম সদরঘাট এলাকায়। সেখানে তাজের দুলাভাই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করছেন। একটু পরই বাঞ্ছারামপুরের উদ্দেশে একটি লঞ্চ ছাড়বে। লঞ্চের পেছন দিকে টিকিট ক্লার্কের ছোট কেবিন রয়েছে। টার্মিনালের ভিড় এড়িয়ে, ডিঙিনৌকায় চড়ে সেই কেবিনে ঢুকলাম আমরা চারজন। মিনিট দশেক পরই লঞ্চ টার্মিনাল ছেড়ে যায় গন্তব্যের উদ্দেশে। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রায় দুই মাসের বন্দিজীবনের অবসান ঘটায় আমরা উত্তেজিত, শিহরিত। আনন্দে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলাম। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে শুকরিয়া জানাই। অদ্ভুত এক অনুভূতি!

প্যাট্রল পার্টিসমূহ হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের। আমাদের পালানোতে তাদের চাকরিও হুমকির সম্মুখীন। রাত ১২টায় এক গ্রুপ আমার খোঁজে ঢোকে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। বায়তুল মোকাররম মসজিদের পুব পাশেই ক্লাব টেন্ট। কার উর্বর মস্তিষ্কে ধারণা জন্মেছে, আমি আমার ফুটবল টিমের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারি। ফুটবল মৌসুম শেষ হয়েছে মাস তিনেক আগে, ক্লাবে কোনো খেলোয়াড় ছিল না এ সময়। কোনার দিকের একটি ঘরে একাকী মশারি খাটিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন ক্লাবের কোচ, একসময়ের কৃতী ফুটবলার আশরাফ চৌধুরী। সজোরে ধাক্কা মেরে ঘরে দরজা খুলে একসঙ্গে ঢোকে সাত-আটজন সৈনিক, তাদের হাতে উদ্যত বেয়োনেট ফিক্সড রাইফেল। আশরাফের গাট্টাগোট্টা শরীর, উপরন্তু একজোড়া ফৌজি স্টাইলের গোঁফও রয়েছে তাঁর। মশারি থেকে মাথা বের করেই একদল মারমুখী রাইফেলধারী দেখে তাঁর আক্কেলগুড়ুম। সৈনিকেরা গোঁফ দেখে তাঁকেই মেজর হাফিজ ঠাওরেছে। দু-একজন বলে ওঠে, 'পেয়েছি, পেয়েছি।'

আতঙ্ক গ্রাস করে আশরাফকে। সঙ্গের অফিসার নাম জিজ্ঞেস করতেই তিনি নিজ পরিচয় দিলেন। ক্লাবের কর্মচারী দুজন আশরাফের কোচ পরিচয়কে সত্যায়িত করে। অবশেষে সার্চ পার্টি বিফল হয়ে ফিরে যায়।

আমাদের পালানোর প্ল্যানটি ছিল নিখুঁত। সড়কপথে অনেক চেকপোস্ট ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তাই আমরা নৌপথ বেছে নিয়েছিলাম। পালানোর ক্ষেত্রে নৌপথ তুলনামূলকভাবে নিরাপদ, নদীতে শত শত নৌকায় সার্চ অপারেশন খুবই কঠিন। আমরা রাত সাড়ে নয়টায় এইচ আওয়ার নির্ধারণ করেছি। সন্ধ্যার পরপর রাতের প্রথম প্রহরে প্রহরীরা ঢিলেঢালা থাকে। গভীর রাতেই অঘটন ঘটতে পারে—এ আশঙ্কায় প্রহরীরা রাতের মধ্যভাগেই বেশি তৎপর থাকে।

কেরানির কেবিনে শুয়ে আমাদের কারোরই ঘুম আসছিল না মুক্তির আনন্দে, উত্তেজনায় আমরা উদ্বেল। সবাই জানি, সামনে আরও বিপদের

সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। কিন্তু প্রাথমিক সাফল্য আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। Fortune favours the brave, সামরিক বাহিনীর বহুল প্রচারিত প্রবাদবাক্যটি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

সূর্যোদয়ের কিছু পরই আমাদের লঞ্চ বাঞ্ছারামপুর ঘাটে পৌছাল। এখানেই ক্যাপ্টেন তাজের বাড়ি। আমরা অন্য যাত্রীদের মধ্যে মিশে গিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে গেলাম। আধা ঘণ্টা পায়ে হেঁটে তাজের গ্রামের বাড়িতে পৌছালাম। গোসল করে, নাশতা সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার উদ্যোগ নিলাম টিনের তৈরি বৈঠকখানায়। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে গেল। তারা জানালা এবং বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। আমি তাজকে বললাম, চলো বেরিয়ে পড়ি। এখানে দীর্ঘ সময় থাকলে পুলিশ আসতে পারে। অবশেষে আমরা চারজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুবদিকের একটি ছোটখাটো নদীবন্দরের উদ্দেশে হাঁটা শুরু করি। এ এলাকা তাজের অতিপরিচিত। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য অনুযায়ী চলার পথে পথিকেরা আমাদের পরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি জানতে চায়। তাজ উত্তর দেয়, আমরা নীরবে পথ চলি। ঘণ্টা দুয়েক চলার পর নদীর পাড়ে পৌছে যাই।

ঘাটে একটি ইঞ্জিনচালিত মাঝারি সাইজের নৌকা ভাড়া করলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার জন্য। নদীপথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অনেক দূরের পথ, বেশ কয়েক ঘণ্টা লাগবে। কিন্তু নৌপথ নিরাপদ, ধরা পড়ার আশঙ্কা কম। দুপুরে আমাদের নৌযাত্রা শুরু হলো। শুকনা কাঠের পাটাতনে চিত হয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছি আমরা চারজন। ধীরে চলেছে নৌকা, আমরাও চিন্তামগ্ন। অনিশ্চিত গন্তব্যে দ্রুত পৌছানোর কোনো তাড়া নেই আমাদের। দুই মাসের বন্দিজীবনের দিনগুলো চলচ্চিত্রের মতো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। কী বিচিত্র আমাদের জীবনধারা। বয়স ৩০ পেরোতে না পেরোতে জীবনের ওপর কত ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হলো আমাকে। একাত্তরের যুদ্ধে আহত হয়েছি। বহুবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। কামালপুর আক্রমণে হাতের এসএমজির বাঁট শত্রুর শেলের আঘাতে দুই টুকরা হয়ে গেল, ছয় ইঞ্চি বাঁ দিকে লাগলে আমিই দ্বিখণ্ডিত হতাম। একাত্তরে বেঁচে গেলাম, বিজয়ী হলাম। আবার চার বছরের মাথায় নতুন সংঘাতে জড়িয়ে গেলাম। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আবারও এগিয়ে চলেছি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। ভাগ্যে কী আছে এবার! একই ভাবনায় ডুবে আছি চারজন। একই পথের যাত্রী।

রাত ১২টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গুদারাঘাটে ভিড়ল আমাদের ইঞ্জিনচালিত নৌকা। নৌকা থেকে নেমে হেঁটে কাছাকাছি একটা হোটেলে দুটি রুমে অবস্থান নিলাম আমরা চারজন। উত্তেজনায় রাতের বাকি সময়টুকু নির্ঘুম কেটে গেল। সকাল নয়টায় হাফিজুল্লাহকে পাঠালাম শহরে চক্কর মেরে

আসতে, বাজারে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছোট্ট শহর, ১ম বেঙ্গল ছাড়া আর কোনো সামরিক ইউনিট এখানে থাকার কথা নয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী কিংবা অন্যান্য টুকটাক জিনিসপত্র কেনার জন্য সৈনিকেরা বাজারে আসতেই পারে। ঘণ্টা দেড়েক পর হাফিজুল্লাহ হোটেলে ফিরে আসেন, সঙ্গে 'এ' কোম্পানির কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার নুরুল ইসলাম। নুরু একজন কৃতী বক্সার, মুক্তিযোদ্ধা এবং আমার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন।

নুরু আমাদের দেখে উদ্বেলিত হলো, চোখে আনন্দাশ্রু। 'স্যার, খুবই চিন্তিত ছিলাম আপনাদের নিয়ে। হঠাৎ আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠানো হলো। গতকাল সিও (লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর) ব্যাটালিয়ন দরবারে জানিয়েছেন যে আপনারা চারজন গণভবন থেকে পালিয়েছেন। পল্টনে ঢোকার চেষ্টা করা হলে যেন আপনাদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়—এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছেন।' নুরুল ইসলাম জানাল। অবাক হলাম, আমরা রূপগঞ্জ থেকে সুনামগঞ্জ গেলাম আর মতিউর ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গিয়ে ১ম বেঙ্গলেই যোগদান করেছেন ধোয়া তুলসীপাতার মতো। আবার আমাদেরই গ্রেপ্তার করার হুকুম জারি করেছেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল!

নুরু আরও জানাল, গতকালই আমার ব্যাটম্যান গোলাপ আমার স্ত্রী ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসেছিল। আমাদের দেখা না পেয়ে তারা সুনামগঞ্জে চলে গেছে।

নুরুকে বললাম প্রতিটি কোম্পানি থেকে অন্তত একজন করে বিশ্বস্ত জেসিও কিংবা এনসিওকে নিয়ে সন্ধ্যার পরপরই আমাদের হোটেলে আসতে। এদের সঙ্গে আলাপ করেই পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। নুরু দ্রুত ফিরে গেল পল্টনে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর পল্টন থেকে আমার বিশ্বস্ত ছয়-সাতজন জেসিও, এনসিও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে হোটেলে এল। এদের মধ্যে রয়েছে দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার আবুল হাসেম, কৃতী অ্যাথলেট নায়েব সুবেদার শামসু, ফুটবলার আসাদ, হাবিব, রতন এমন কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। এদের সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোলাখুলি আলাপ করে অফিসার ও সৈনিকদের মনোভাব জানতে চাইলাম। তারা জানাল, অফিসাররা সবাই সেনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশই পালন করবেন। সৈনিকেরা, বিশেষ করে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তারা আমাদের পক্ষেই থাকবে বলে আশা করা যায়। সিও মতিউর রহমান এ মুহূর্তে জরুরি কাজে শ্রীমঙ্গল রেস্টহাউসে আছেন, সঙ্গে অ্যাডজুট্যান্ট শাহাদাত। টুআইসি (উপ-অধিনায়ক) মেজর রায়হান, কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন ফারুক খান, লেফটেন্যান্ট শামিম

শাহজাহান, আরও দু-একজন অফিসার ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেডিয়ামে পল্টনের সঙ্গেই রয়েছেন। সৈনিক ও অফিসাররা মাঠে তাঁবুতেই অবস্থান করছেন। একটি কোম্পানি হবিগঞ্জে এবং একটি প্লাটুন সিলেটে রেডিও স্টেশনের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। আলোচনার শেষ পর্যায়ে সুবেদার হাসেম বলল, 'স্যার, আপনারা আজ রাতেই পল্টনে ঢোকেন। জীবনের বিনিময়ে হলেও আপনাদের রক্ষা করব আমরা। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা। আমরা গিয়ে রাত ১১টায় পাঁচ-ছয়জনকে পাঠিয়ে দেব। এরা গাইড করে আপনাদের পল্টনে নিয়ে আসবে।' হাসেম এবং সঙ্গীরা ফিরে গেল স্টেডিয়ামে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ও স্টেডিয়াম এলাকার সঙ্গে আমরা কেউই পরিচিত নই। কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের পাশেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেডিয়াম। এর একদিকে মহাসড়ক, অন্যদিকে সরকারি ডাকবাংলো। দুই দিকে বিস্তীর্ণ ফসলের খেত। মাঠের এক দিকে ১০০ গজ কংক্রিটের তৈরি গ্যালারি, বাকি তিন দিক ফাঁকা, নামেই স্টেডিয়াম। কেবল একটি ফুটবল মাঠ এবং দুই পাশে গোলপোস্ট রয়েছে। স্টেডিয়ামের অবকাঠামো বলতে তেমন কিছুই নেই।

হাসেম এবং সঙ্গীরা বিদায় নেওয়ার পর চিন্তামগ্ন হলাম। প্রায় দুই মাস বন্দী থাকার ফলে সেনাবাহিনীর সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছি। সিজিএস ও ব্রিগেড কমান্ডারের নেতৃত্বে ৩ নভেম্বরে অপারেশন পরিচালিত হয়েছে। ১ম ইস্ট বেঙ্গল এতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, ২য় ইস্ট বেঙ্গলের দুটি কোম্পানিও কার্যকর অংশগ্রহণ করেছে। ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলে খালেদ মোশাররফ হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে, সেনা কর্তৃপক্ষ ১ম বেঙ্গলকে আস্থায় নিতে পারেনি। এদের হঠাৎ করেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১ম ইস্ট বেঙ্গলকে কুমিল্লায় অবস্থানকারী ১০১ ব্রিগেডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। ব্রিগেডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাদিকুর রহমান চৌধুরী।

৪৬ বিগ্রেডের অপর দুটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ঢাকাতেই অবস্থান করছে। নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী প্রধান এবং সেনা সদরের সিনিয়র অফিসাররা বহাল তবিয়তে চাকরি করে যাচ্ছেন। শুধু আমরা কজন জুনিয়র অফিসারকে বলির পাঁঠা বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ! আমরাও সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করব। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

হোটেল রুমে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি। রাত ১১টায় চারজন সৈনিক এল আমাদের গাইড করে পল্টনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রাত ১২টায় হোটেল থেকে বেরিয়ে স্টেডিয়ামের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে যাত্রা করলাম। গাইডরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রামীণ সড়ক ধরে, স্টেডিয়ামসংলগ্ন ফসলের খেতের মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়ে এল ফুটবল মাঠের এক প্রান্তের তাঁবুর সারিতে।

আমাদের সঙ্গে সন্ধ্যায় বৈঠককারী জেসিও-এনসিওদের সঙ্গেই ছুটে এল ব্যাটালিয়নের সাধারণ সৈনিকেরা। আমাদের সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে তারা আমাদের জড়িয়ে ধরে আনন্দ-উল্লাস করে। মুহুর্মুহু স্লোগান দেয়, 'সিনিয়র টাইগার জিন্দাবাদ, মেজর হাফিজ জিন্দাবাদ!' আমার জীবনের এক স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল সেটি!

একসময় একটি পেট্রলের ব্যারেলের ওপর দাঁড়িয়ে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলাম সমবেত সৈনিকদের উদ্দেশে—'প্রিয় সৈনিক ভাইয়েরা, আমি মেজর হাফিজ, স্বাধীন বাংলাদেশে এই ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭১ সালে যশোর ক্যান্টনমেন্টে ২০০ সৈনিক এবং ৯ জন জেসিওকে নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে ৬০০ তরুণকে ভর্তি করে এই ব্যাটালিয়নকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করি। একাত্তরের চার মাস এই ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছি। আমি ছাড়া আর কোনো অফিসার ছিল না পল্টনে। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুর ওপর আক্রমণ চালিয়েছি। অনেকেই জীবন দিয়েছে, আমিও আহত হয়েছিলাম। আমাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে আজ আমাদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ১৫ আগস্ট সংবিধান লঙ্ঘন করে, রাষ্ট্রপতিকে সপরিবার হত্যা করে একটি রাজনৈতিক দলের অংশবিশেষকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানো হয়েছে। আপনারা জানেন, একটি ট্যাংক রেজিমেন্ট ও আর্টিলারি রেজিমেন্ট সেনা চেইন অব কমান্ড লঙ্ঘন করে প্রতিদিন ঢাকা শহরে লুটপাট করেছে। কয়েকজন খুনি অফিসার সেনাপ্রধানের হাতে চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনী পরিচালনা করছে। বঙ্গভবনে কয়েকটি ট্যাংকের কাছে দেশবাসী জিম্মি হয়ে পড়েছিল, সেনা কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনার জন্য কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সেনাবাহিনীর সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার জন্য সিজিএস ও ব্রিগেড কামান্ডারের নির্দেশে খুনিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয় ৩ নভেম্বর। খুনিদের বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ট্যাংকসমূহ ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দেশ রাহুমুক্ত হয়। একটি নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে।

'কিন্তু ৭ নভেম্বর একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ঢাকা সেনানিবাসে ১৩ জন নিরীহ অফিসারকে হত্যা করে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। একমাত্র ১ম ইস্ট বেঙ্গল বিদ্রোহীদের প্রতিহত করে। কিন্তু পুরস্কারের পরিবর্তে আপনাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নির্বাসিত করা হলো। আমিসহ ১১ জন জুনিয়র অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হলো। অথচ বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানসহ সিনিয়র অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। এই পরিস্থিতিতে আমরা জীবনের

ঝুঁকি নিয়ে গণভবন ত্যাগ করে আপনাদের কাছে এসেছি আশ্রয় নেওয়ার জন্য। আমরা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চাই, ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে চাই। এখন বলুন আপনারা কি আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে রাজি আছেন?'

শত শত সৈনিক বজ্রনির্ঘোষে গর্জে ওঠে, 'অবশ্যই। মেজর হাফিজ জিন্দাবাদ, সিনিয়র টাইগার জিন্দাবাদ। আজ থেকে আপনি আমাদের কমান্ডার। আপনার নির্দেশেই আমরা চলব।' মধ্যরাতে তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের স্লোগানে ঘুমন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেগে ওঠে।

স্টেডিয়ামের প্রবেশপথের ডান পাশেই অফিসার মেস এবং অফিসারদের বসবাসের তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। আমি অফিসার মেসের দিকে এগোলাম। শত শত সশস্ত্র সৈনিক আমাকে অনুসরণ করছে। টুআইসি মেজর রায়হান, ক্যাপ্টেন ফারুক খান এবং জনা চারেক অফিসার ভীত জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, আবার হয়তো ৭ নভেম্বরের মতো অফিসার নিধনের পালা শুরু হবে। এরা সবাই আমার জুনিয়র। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন জানাল। তাদের সরাসরি জানালাম, 'এ মুহূর্ত থেকে আমি এই ব্যাটালিয়নের কমান্ডার। আমার নির্দেশেই তোমরা নিজ দায়িত্ব পালন করবে। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটলে চরম শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি দুই মাস বন্দিজীবন কাটিয়ে এসেছি, কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার?' 'ইয়েস স্যার, দেয়ার উইল বি নো প্রবলেন,' তারা কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল।

এমন সময় মেসের টেলিফোন বেজে উঠল, আমি রায়হানকে রিসিভার ওঠাতে বললাম। অপর প্রান্তে ১০১ ব্রিগেড কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাদিক। রায়হান বিব্রত, শুধু 'স্যার স্যার' করছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাদিকুর রহমান চৌধুরী ১ম ইস্ট বেঙ্গলে কমিশনপ্রাপ্ত দক্ষ অফিসার। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে পল্টনের কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে প্রশংসনীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। সিনিয়র টাইগারের সদস্য হওয়ার কারণে তাঁর সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল।

আমি টেলিফোন হাতে নিয়ে বললাম, 'মেজর হাফিজ বলছি।'

'হাফিজ, আমি কর্নেল সাদিক বলছি। তুমি একজন মহান দেশপ্রেমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা। আমাকে কয়েকজন বলেছে তোমরা নাকি ভারতে চলে যাবে। আমি বলেছি, কক্ষনো নয়, দেশপ্রেমিক হাফিজ নিজ দেশেই থাকবে। আমার অনুরোধ, তোমরা কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা কিংবা রক্তপাত কোরো না,' সাদিক বললেন।

'স্যার, সৈনিকদের অনুরোধে আমি এই ব্যাটালিয়নের কমান্ডাররূপে দায়িত্ব নিয়েছি। এখানে আমার নির্দেশই কার্যকর হবে। শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার

দায়িত্ব আমার,' আমি বললাম।

'হাফিজ, টুআইসি রায়হানকে টেলিফোন দাও,' সাদিক বললেন।

রায়হান সেট হাতে নিল, বলল, 'আমার সামনে শত শত সৈনিক, জেসিও দাঁড়িয়ে আছে। এরা সবাই মেজর হাফিজের প্রতি অনুগত বলে মনে হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করা হয়নি।'

'স্যার, আপনি একজন সৈনিকের সঙ্গে কথা বলুন,' বলে হাবিলদার আসাদের হাতে টেলিফোন দিলাম।

'স্লামালেকুম স্যার, আমি ৩৯৩৩...হাবিলদার আসাদ আলী বলছি, মেজর হাফিজ সাহেব কিছুক্ষণ আগে আমাদের পল্টনে এসেছেন। আমরা একাত্তরে তাঁর অধীনে যুদ্ধ করেছিলাম। তিনি একজন সৎ ও যোগ্য অফিসার। তাঁকে বিনা অপরাধে বন্দী করা হয়েছে। আমাদের দাবি, আপনি মেজর হাফিজকে সিও এবং অন্যান্য অফিসারকে কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে আমাদের ইউনিটে পোস্টিং করে দেন।'

অপর প্রান্তে বিব্রত কর্নেল সাদিক বিষয়টি ওপরে জানাবেন বলে কথোপকথন শেষ করলেন।

কর্নেল সাদিক ফোন রাখার দুই মিনিট পরই ফোন করেন সিজিএস ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর।

'হাফিজ, কাল সকালে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসতে চাই তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য।' মঞ্জুর বললেন।

'স্যার, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।' জানালাম আমি।

সৈনিকদের জানালাম, সকাল আটটায় সিজিএস আসবেন। তারা বলল, 'স্যার, কোনো চিন্তা করবেন না, যা বলার আমরাই বলব।'

রাতে আমরা চারজন বিভিন্ন কোম্পানিতে সৈনিকদের সঙ্গেই ঘুমালাম। কী দারুণ উত্তেজনার মধ্য দিয়েই না দিনটা কেটেছে। সেনাবাহিনীতে এ সময় সৈনিকদের ইচ্ছাই শেষ কথা, অফিসারদের ভূমিকা ছিল নগণ্য। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে গোটা দশেক সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে।

দাবিদাওয়ার মৌসুম চলছে পূর্ণোদ্যমে। ১২ দফার সঙ্গে নিত্যনতুন দফা যুক্ত হচ্ছে। সেনাপ্রধান জিয়া এবং মঞ্জুর ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। কর্নেল ফারুক, রশিদ এঁরাও বিদেশে রয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবে, এ আশঙ্কায় তাঁদেরও দেশে ফিরিয়ে আনা হয়নি।

স্টেডিয়াম-সংলগ্ন খেতের মাঝামাঝি একটি হেলিপ্যাড প্রস্তুত করেছে আমাদের সৈনিকেরা। H মার্ক করে বাঁশের আগায় লাল কাপড় টানিয়ে রেখেছে ল্যান্ডিংয়ের জন্য। ঠিক সকাল আটটায় সেখানে অবতরণ করে

ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরের হেলিকপ্টার। তিনি একাই এসেছেন।

আমরা চারজন হেলিপ্যাডে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম। আমাদের দেখে খুব খুশি হয়েছেন বলে মনে হলো। তাঁকে অফিসার মেসে নিয়ে এলাম। তিনি আমাদের চারজনের সঙ্গে আলাদাভাবে বসলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। আপনি সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলুন।'

'তোমাদের সাহসের প্রশংসা করি। তোমরা কীভাবে পালালে, আমাকে বলবে?' মঞ্জুর বললেন।

আমি সংক্ষেপে জানালাম আমাদের পলায়নের ইতিবৃত্ত। মঞ্জুর অবাক বিস্ময়ে শুনলেন।

স্টেডিয়ামের মাঠে পুরো ব্যাটালিয়ন বিভিন্ন কোম্পানিতে বিভক্ত হয়ে অপেক্ষা করছে সিজিএসের বক্তব্য শোনার জন্য। মঞ্জুর মাঠে আসার পর প্রতি কোম্পানি থেকে একজন সৈনিক সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে কয়েকটি দাবিদাওয়া পেশ করে :

১. মেজর হাফিজকে সিও এবং বাকি তিনজন অফিসারকে কোম্পানি কমান্ডাররূপে ১ম ইস্ট বেঙ্গলে পদায়ন করতে হবে।
২. ৩ নভেম্বরের কর্মকাণ্ড যদি অবৈধ হয়ে থাকে, তাহলে নৌবাহিনী প্রধান, বিমানবাহিনী প্রধান, সেনা সদর দপ্তরের সিনিয়র অফিসারদের ঢাকায় বিচার করতে হবে।
৩. এঁদের বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর প্রয়োজন হলে মেজর হাফিজ ও তিনজন অফিসারের প্রকাশ্য বিচার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকদের উপস্থিতিতেই করতে হবে।
৪. চারজন অফিসারকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কোনো সৈনিকের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে কোনোরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর বললেন, 'আমিও একজন সিনিয়র টাইগার, মেজর হাফিজ এবং বাকি তিনজন অফিসার মুক্তিযুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। আমি আপনাদের বক্তব্য সেনাপ্রধানকে জানাব। তিনি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন।' তিনি আধঘণ্টা পর হেলিকপ্টারে উঠে গেলেন। যাওয়ার আগে বললেন যে সেনাপ্রধানের সঙ্গে আলাপ করে যত শিগগির সম্ভব আমাদের ফলাফল জানাবেন। আমরাও তাঁর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকব জানালাম। হেলিকপ্টার দৃষ্টিসীমার বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত হেলিপ্যাডে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমরা সিজিএসের কাছ থেকে আসা সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি। এক সপ্তাহ কেটে গেল। নো নিউজ। আট দিনের মাথায় আবার মঞ্জুর টেলিফোন করলেন।

'হাফিজ, আমি গুরত্বপূর্ণ সিনিয়রদের বোঝানোর চেষ্টা করছি, আরও একটু সময় দাও আমাকে।' মঞ্জুর বললেন।

'নো প্রবলেম স্যার, প্লিজ টেক ইউর টাইম,' আমি বললাম।

'একটা জিনিস আমাকে ভাবাচ্ছে, তোমরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিনিয়র মোস্ট ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করে বসেছ। জিনিসটা ভালো দেখাচ্ছে না, তোমাদের দেখাদেখি অন্য ইউনিটও বিদ্রোহ করে বসে কি না, এ নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি। তোমরা একটা কাজ করো, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে চলে এসো। বিএমএ মেসে থাকো কিছুদিন। সেখানে আমরা একটা লোকদেখানো কোর্ট মার্শাল করব তোমাদের চারজনকে। শাস্তিস্বরূপ সিনিয়রিটি কিছুটা কেটে নিয়ে তোমাদের আবার ১ম বেঙ্গলে পোস্টিং দিয়ে পাঠিয়ে দেব। সৈনিকদের দাবিও পূরণ হলো। আমাদেরও মুখ রক্ষা হলো। কী বলো?' মঞ্জুর বললেন।

'রাইট স্যার, আপনার আদেশ শিরোধার্য, আমরা কুমিল্লায় যাব। তবে একটা প্লাটুন আমাদের নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে নিয়ে যাব।' আমি জানিয়ে দিলাম। মঞ্জুরের প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস। তিনি রাজি হলেন।

পরদিন ৪০ জন সৈনিক বেছে নিয়ে দুটি লাইট মেশিনগান, দুটি হেভি চায়নিজ মেশিনগান সঙ্গে নিয়ে দুটি তিন টনি গাড়ি নিয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের উদ্দেশে রওনা হলাম। যাওয়ার আগে সিনিয়র জেসিও-এনসিওদের নির্দেশ দিলাম স্ট্যান্ড টু, অর্থাৎ অস্ত্র হাতে, সামরিক সাজসরঞ্জাম পরে প্রস্তুত থাকতে। আমাদের ওপর কোনো ধরনের আক্রমণ হলে তারাও কুমিল্লার উদ্দেশে মার্চ করবে। আমাদের এবং সৈনিকদের আত্মবিশ্বাস তখন তুঙ্গে। তারা বলল, 'কোনো চিন্তা করবেন না, স্যার। খবর পেলেই আমরা যা কিছু করণীয়, সবই করব।' ভাবতেই অবাক লাগছে, কী অকল্পনীয় কাণ্ড ঘটাচ্ছিলাম আমরা নিয়মিত সেনাবাহিনীতে! ৮০০ সৈনিক আমাদের চারজন জুনিয়র অফিসারকে রক্ষা করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। তাদের কাছে জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ বিষয়। কী সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আমাদের মধ্যে। অবিশ্বাস্য!

শীতের সকাল। মহাসড়ক বেয়ে কুমিল্লার পথে চলছি। সামনে সৈনিকবোঝাই তিন টনি ট্রাক, মাঝে জিপে আমরা চারজন, পেছনের তিন টনিতে বাকি সৈনিকেরা, দুটি গাড়িতে মেশিনগান তাক করা। পথে কোনো অ্যামবুশে পড়লে জবাব দিতে প্রস্তুত এই ব্যাটল সিজনড সৈনিকেরা। পেছনের তিন টনি গাড়িতে ১ম বেঙ্গলের একজন অফিসার লেফটেন্যান্ট শামিম শাহজাহান সেনা সদরের নির্দেশে আমাদের সঙ্গী হলো।

দুপুরের কিছু আগেই আমরা কুমিল্লা সেনানিবাসে পৌঁছে গেলাম। অফিশিয়ালি, অর্থাৎ কাগজে-কলমে আমরা গ্রেপ্তারকৃত অফিসার। পদাতিক ব্রিগেডে বাসস্থান, রেশন, শৃঙ্খলা, শাস্তি ইত্যাদি বিষয় কমান্ডারের পক্ষে যিনি

দেখাশোনা করেন, তাঁর পদবি ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডজুট্যান্ট অ্যান্ড কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল, সংক্ষেপে বলা হয় ডিকিউ। কুমিল্লায় ১০১ ব্রিগেডের ডিকিউর কাছে নিয়মমাফিক রিপোর্ট করতে গেলাম। সিজিএস আমাদের আসার খবর জানিয়েছেন ব্রিগেডের সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চে। ডিকিউর রুমে ঢুকে দেখি দায়িত্ব পালন করছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী মেজর সিরাজ। সুহৃদ বন্দীদের হ্যান্ডল করা একটি অপ্রিয় দায়িত্ব। সিরাজও কিছুটা বিব্রত। তার ধারণা, আমরা সাধারণ বন্দীদের মতোই তার সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের ভাবসাব দেখে এবং সঙ্গী মেশিনগানধারী সৈনিকদের অঙ্গভঙ্গি দেখে তারা হতবাক। আমরা কি বন্দী, না তাদের বন্দী করতে এসেছি, এ নিয়ে সিরাজ কিছুটা চিন্তিত।

'রিল্যাক্স ম্যান, আমি বিএমএ মেসে যাচ্ছি। সিজিএসের কোনো মেসেজ থাকলে আমাকে জানিয়ো।' বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম। সিরাজও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বোঝা গেল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিনিয়র টাইগারদের বিদ্রোহ সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না এখানে।

সৈনিকদের সঙ্গে নিয়েই বিএমএ মেসে গেলাম। একটি ছোট টিলার ওপর অফিসার মেসটি। অফিসার মেসের ২০ গজ দূরেই একটি বড় হলঘর, ইটের দেয়াল ও টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি। হলরুমের মাঝবরাবর পার্টিশন দিয়ে দুটি রুম করা হয়েছে। আমরা দুই রুমে ভাগাভাগি করে থাকার বন্দোবস্ত করলাম। সৈনিকেরা যেখানেই যায়, সাধারণত শুকনা খাবার, ডেকচি ইত্যাদি নিয়েই মুভ করে। আমার সঙ্গীরাও স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের চারজনের খাবার মেস থেকে এলেও আমরা জওয়ানদের সঙ্গেই তাদের খাবার শেয়ার করি। সৈনিকেরা যাতে আমাদের সাহচর্যে অসংকোচে থাকে, সে জন্য রাতে গানের জলসাও বসাই। তাদের মনোভাব চাঙা, দুশ্চিন্তার লেশমাত্রও নেই তাদের মনে।

বিএমএ মেস এলাকায় ঢুকেই আমরা চারদিকে পরিখা খনন করে অলরাউন্ড ডিফেন্স নেই। মেসের অন্য বাসিন্দারা অবাক বিস্ময়ে দেখছে আমাদের সৈনিকেরা মেশিনগান, লাইট মেশিনগান বাগিয়ে পজিশন নিয়ে আছে। ওরা বিএমএর প্রশিক্ষক, প্লাটুন কমান্ডার। সেনাবাহিনীর বাছাই করা মেধাবী অফিসাররাই বিএমএতে পদায়িত হয়। মেসের অ্যান্টি রুমে পত্রিকা পড়তে যাই। পরিচিত অফিসারদের সঙ্গে গল্পসল্প হয়। বিএমএর অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন আনোয়ার তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার। মুক্তিযুদ্ধের সময় 'জেড' ফোর্সের তেলঢালায় থাকাকালে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। জাতীয় রক্ষীবাহিনী ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীতে অঙ্গীভূত হয়েছে। এ বাহিনী গঠনকালে দুজন রাজনৈতিক নেতাকে (সরোয়ার মোল্লা এবং আনোয়ারুল আলম শহীদ)

সরাসরি লেফটেন্যান্ট কর্নেল র‍্যাঙ্ক দিয়ে উপপরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এঁদের দুজনকে সেনাবাহিনীর নিয়মকানুন, রণকৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য বিএমএতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। তাঁরা অফিসার মেসেই অবস্থান করতেন। এঁদের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরা আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক। এঁদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালে তাঁরা বিনয়ের সঙ্গে অপরাগতা জানান। তাঁদের শিগগিরই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেপুটেশনে পাঠানো হচ্ছে। সুতরাং তাঁরা নতুন কোনো ঝামেলায় জড়াতে চান না।

আমি অফিসারদের ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করি। ঢাকার বাইরের সেনানিবাসগুলোতে অফিসাররা এসব ঘটনার অনেক কিছুই জানত না। আমাদের বক্তব্য শুনে তারা অবাক হলো। আমাদের প্রতি সেনা সদর অন্যায় আচরণ করছে, এটিও তারা উপলব্ধি করে। সারা দেশে অফিসাররা সৈনিকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়, অপর দিকে আমাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সাধারণ সৈনিকেরা জীবন বাজি রেখেছে দেখে কুমিল্লায় অফিসাররা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন!

১৫ দিন কেটে গেল বিএমএ মেসে। আমাদের কোনো হিল্লে হচ্ছে না। সিজিএস মঞ্জুর একসময় জানালেন, আমাদের সিনিয়রিটি ডাউন করে ১ম বেঙ্গলে পাঠানোর পরিকল্পনা কয়েকজন নীতিনির্ধারক সিনিয়রের বিরোধিতার কারণে হালে পানি পাচ্ছে না। এদের কনভিন্স করার জন্য তাঁর আরও সময় প্রয়োজন। এদিকে আমাদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম। আমি জানিয়ে দিলাম, আমরা আর কুমিল্লায় থাকতে চাই না।

'আপনি সময় নিন, আমরা কালই ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যাব।' সবিনয়ে নিবেদন করলাম। মঞ্জুর বুঝলেন, আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর আবার আমরা গাড়িযোগে যাত্রা করে সন্ধ্যার আগেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছে গেলাম। কুমিল্লা ছাড়ার আগে ১০১ ব্রিগেড কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাদিক আমাদের চারজনকে তাঁর বাসভবনে চা পানের আমন্ত্রণ জানান। চা খেতে খেতে তিনি বললেন, 'হাফিজ, চিফ (জিয়া) তোমার প্রতি দুর্বল। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তুমি ও তিনি তাঁর ম্যাপ কেস বিছিয়ে গাছের নিচে ঘুমাতে একসঙ্গে, এ কথা তিনি ভোলেননি।'

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছালে পল্টনের সৈনিকেরা আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায় আমাদের। উপলব্ধি করলাম, আমাদের পক্ষে পল্টন ছেড়ে কুমিল্লা যাওয়া উচিত হয়নি। মাত্র ৪০ জন সৈনিককে পর্যুদস্ত করা

খুব কঠিন ছিল না সেনা কর্তৃপক্ষের। পরবর্তীকালে আমরা জানতে পেরেছি, জেনারেল মীর শওকত কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে এ বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীতে এমন কোনো ইউনিট পাওয়া যায়নি, যারা সৈনিকদের ওপর গুলি চালাতে প্রস্তুত ছিল। এ আক্রমণে আক্রমণকারীরা অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতো। কারণ, আমাদের পিঠও দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর রহমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে পল্টনে যোগ দিয়েছেন। তিনি খুবই ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। আমরা তাঁকে আশ্বস্ত করি যে আপনি তো আমাদের সঙ্গেই ছিলেন ৩ নভেম্বরে, এখন ভোল পাল্টে ফেলেছেন। যাহোক, পল্টনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুসরণ করুন। বাকি সব প্রোগ্রাম, মুভমেন্ট আমার নির্দেশে চলবে। আমাদের কর্মকাণ্ডে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করবেন না। মতিউর সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভের আগে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক ছিল। তিনিও সেটি বজায় রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসার পর এক মাস কেটে গেল। আমাদের সৈনিকদের উৎসাহ ও দৃঢ়তায় কোনো ভাটা পড়েনি। সেনা কর্তৃপক্ষ ওয়েটিং গেম খেলে আশা করেছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হতাশ হয়ে সিনিয়র টাইগাররা পল্টনে একসময় আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু দিনে দিনে সৈনিকদের মনোভাব দৃঢ়তর হচ্ছিল। আমরাও সময় নিয়ে বিদ্রোহকে আরও সংহত করে তুলেছিলাম।

দেড় মাস কেটে যাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এলেন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। প্রতি সপ্তাহে জেনারেল মঞ্জুরের সঙ্গে আমার টেলিফোনে আলাপ হতো। আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলাম, কিন্তু মঞ্জুর ধীরস্থিরভাবে আমাদের ক্ষোভকে প্রশমিত করতেন। কিন্তু দেড় মাস ধরে বিদ্রোহী অবস্থানে থেকে আমাদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়।

জেনারেল এরশাদ সেনাবাহিনীতে তেমন শক্তিধর কেউ ছিলেন না। সুযোগ পেয়েও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এ কারণে মানসিকভাবে তিনি কিছুটা দুর্বল ছিলেন। আমি তাঁর অধীনে কখনো চাকরি করিনি। ফলে তাঁর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। ইকবাল তাঁর অধীনে কয়েক মাস এজিস স্টাফ ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর মতে, এরশাদ কিছুটা দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি।

এরশাদকে হেলিপ্যাডে রিসিভ করে সৈনিকদের সামনে নিয়ে এলাম। তারা আগের মতোই দাবিদাওয়া জানাল। তারা এমন সব যুক্তি প্রদর্শন করে যে এরশাদ তা মেনে নিতে বাধ্য হন। তিনি পুরো পল্টনের সামনে সংক্ষিপ্ত

বক্তব্য দেন। একজন এনসিও বলে ওঠে, 'স্যার, দেড় মাস হয়ে গেল, আমাদের দাবিদাওয়ার কোনো সদুত্তর তো পেলাম না। আমরা কত দিন ধৈর্য ধরে থাকব?'

তার বক্তব্য শুনে এরশাদ খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েন। দীর্ঘ সৈনিক জীবনে তিনি কখনো বিদ্রোহের সম্মুখীন হননি। ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি তিনি এনডিসি কোর্স করার জন্য ভারতে ছিলেন। ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর, ৭ নভেম্বর—এসব দেখার সুযোগ পাননি। '৭৬-এর মার্চে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে এসে বিদ্রোহের উত্তাপ অনুভব করে খুবই অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। পাশেই দাঁড়ানো আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন। একপর্যায়ে তিনি সৈনিকদের বললেন, 'আমি মেজর হাফিজ ও অন্য অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকৃত ঘটনা জানতে এসেছি। এখান থেকে ফিরে গিয়ে সেনাপ্রধানকে আপনাদের মনোভাব সম্পর্কে জানাব। আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। আমরা আপনাদের দাবিদাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল। চিফই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।'

আমরা এরশাদকে অফিসার মেসে নিয়ে এলাম। তাঁর মনে সম্ভবত এমন ধারণা জন্মেছিল যে আমরা তাঁকে জিম্মি করে দাবিদাওয়া আদায় করার চেষ্টা চালাতে পারি। কিন্তু আমাদের নমনীয় ভাবসাব দেখে এবং তাঁর প্রতি যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করায় তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। আমি তাঁকে ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ঘটনা জানানোর পর তিনি স্বীকার করলেন যে দেশের বাইরে থাকার কারণে এসব ঘটনা তাঁর জানা ছিল না। তাঁকে আমাদের দাবির প্রতি নমনীয় বলে মনে হলো। আলোচনা শেষে তিনি জানালেন, ঢাকায় ফিরে তিনি সেনাপ্রধান জিয়াকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পরিস্থিতি এবং সৈনিকদের মনোভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে রিপোর্ট করবেন।

'ঢাকায় একটা মক কোর্ট মার্শাল করলে কেমন হয়?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'খুবই ভালো হয়, স্যার। আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে ঢাকায় যেতে হলে পুরো ব্যাটালিয়ন নিয়ে যাব।' আমার সংক্ষিপ্ত জবাব।

আবার চিন্তাগ্রস্ত হলেন এরশাদ। এক ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহী সৈনিক ঢাকায় গেলে পরিস্থিতি তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে! তাড়াহুড়ো করে এরশাদ হেলিকপ্টারে উঠে গেলেন।

দেড় মাস পেরিয়ে গেল। আমাদের অবস্থা পূর্ববৎ। ১ মার্চ অধৈর্য হয়ে মঞ্জুরকে ফোন দিয়ে বললাম, 'স্যার, সৈনিকেরা অধৈর্য হয়ে পড়েছে। আমাদের পক্ষে আর তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তারা মার্চ করে ঢাকায় আসতে চায় আপনাদের সিদ্ধান্ত জানার জন্য। সিলেট রেডিও স্টেশন তাদের নিয়ন্ত্রণে, ঢাকায় আসার আগে দেশবাসীকে বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে

সেনাবাহিনীর সার্বিক পরিস্থিতি এবং সৈনিকদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে অবহিত করা হবে।'

এবার মঞ্জুরের টনক নড়ল! বললেন, 'হাফিজ, প্লিজ, এসব কোরো না। ঢাকায় এলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে যাবে এবং দেশে গৃহযুদ্ধ বাধবে। আমাকে শেষবারের মতো সাত দিন সময় দাও। আমি চিফকে বুঝিয়ে ফাইনাল সিদ্ধান্তে পৌঁছাব।'

পরবর্তী ছয় দিনের মাথায় সিজিএস মঞ্জুরের টেলিফোন এল।

'হাফিজ, কাল চিফ জেনারেল জিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসবেন তোমাদের সঙ্গে ফাইনাল আলোচনার জন্য। ওকে?' মঞ্জুর বললেন।

'রাইট স্যার। ইউ অল আর ওয়েলকাম।' আমি বললাম।

রাতে সৈনিকদের চিফের আগমনবার্তা জানিয়ে বিস্তারিত ব্রিফ করলাম।

পরদিন ৭ মার্চ ১৯৭৬, সকাল আটটায় সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান স্টেডিয়ামের পাশে হেলিপ্যাডে নামলেন। তাঁর সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর এবং চিফের একান্ত সচিব লেফটেন্যান্ট কর্নেল অলি আহমদ বীর বিক্রম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেডিয়াম থেকে ৫০০ গজ দূরে মহাসড়কের ওপর স্ট্যান্ড বাই রয়েছে একটি মর্টার ব্যাটারির ৭০ জন সৈনিক। প্রয়োজনবোধে তারা চিফের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে। ব্রিগেড কমান্ডার সাদিক সড়কপথে কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর এবং আমরা চারজন বিদ্রোহী অফিসার হেলিপ্যাডে জিয়াকে স্বাগত জানাই। পুরোনো ড্রিল মোতাবেক সৈনিকদের সম্মুখীন হলেন জিয়া। বিভিন্ন কোম্পানির সৈনিকেরা তাদের দাবিসমূহ জানাল। প্রধান দাবি আমাদের প্রথম ইস্ট বেঙ্গলে পোস্টিং, তারপর অভ্যুত্থানের দায়ে নেভি চিফ, এয়ার চিফ, বিডিআর ডিজি এবং সেনা সদরের সিনিয়র অফিসারদের কোর্ট মার্শাল করতে হবে ঢাকায়। এরপর আমাদের চারজনের বিচার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাদের সামনেই অনুষ্ঠিত হবে। জিয়া এত দিন এসব দাবির কথা শুনে এসেছেন। এবার সরেজমিনে উপলব্ধি করেন এসবের যৌক্তিকতা। একজন এনসিও চিফের অনুমতি নিয়ে বলে, 'স্যার, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের হেডকোয়ার্টার ছিল ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল। আমিও সেখানে ডিউটিতে ছিলাম দুই দিন। দেখলাম মেজর হাফিজ সাহেব বাইরে লনে বসে ছিলেন। ভেতরে ব্রিগেডিয়ার খালেদ সাহেব অ্যাডমিরাল, জেনারেল ও সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে সারা দিন মিটিং করছেন। এই জুনিয়র অফিসাররা তো মিটিংরুমেই ঢুকতে পারেনি। অথচ আজ এই চারজনকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। এটা কি ন্যায়বিচার হলো, স্যার?'

এর জবাবে বিব্রত জিয়া বললেন, 'এই চারজন অফিসার আমারও ঘনিষ্ঠ,

অনেক দিনের পরিচিত। এদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত আপনাদের জানানো হবে।'

জিয়া নিজেও তখন কঠিন সময় অতিক্রম করছিলেন। সেনাবাহিনীতে অফিসারদের কমান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সিপাহি বিদ্রোহের রেশও কাটেনি। প্রায়ই বিভিন্ন সেনানিবাসে ছোটখাটো বিদ্রোহ লেগেই আছে। জাসদ, কর্নেল তাহের এবং সৈনিক সংস্থা জিয়াকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। নিজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং সেনা শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য বাধ্য হয়েই জিয়া '৭৫এর ২৩ নভেম্বর গ্রেপ্তার করেন মেজর জলিল, আ স ম রব, হাসানুল হক ইনু এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট আবু ইউসুফকে। ২৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আবাসিক ভবন থেকে গ্রেপ্তার করেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাহেরকে। ৭ নভেম্বরের অফিসার হত্যার জন্য দায়ী বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার বেশ কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জিয়া সেনাপ্রধান হলেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দায়িত্ব তাঁর ওপরই বর্তেছে।

সৈনিক সমাবেশে দু-চার কথা বলেই জিয়া আমাদের নিয়ে বসলেন। মাঠের পাশেই একটি বড় তাঁবুতে সকাল নয়টায় আমাদের সঙ্গে বৈঠক শুরু হলো। প্রথম পর্যায়ে আমাদের একজন একজন করে ডাকা হলো তাঁবুতে। ভেতরে রয়েছেন মাত্র দুজন—জিয়া ও মঞ্জুর। প্রথমেই আমার পালা। ঢুকে অভিবাদন জানাতেই জিয়া অত্যন্ত মোলায়েম সুরে বললেন, 'বসো।' টেবিলের ওপাশে জিয়া, তাঁর মুখোমুখি আমি এবং এক পাশে মঞ্জুর বসা।

আসন গ্রহণ করামাত্রই জিয়া বললেন, 'হাফিজ, তোমাকে মহসীন* (লেফটেন্যান্ট কর্নেল, পরিচালক, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ) কিছু বলেনি?'

'না স্যার,' আমার জবাব। জিয়া বিস্মিত হয়ে মিনিটখানেক চুপ রইলেন। ধারণা করলাম, ডিএমআইকে আমার জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ দিয়েছিলেন, যা মহসীন আমাকে জানায়নি গণভবনে।

'স্যার, আমি খোলাখুলি কিছু কথা বলার জন্য আপনার অনুমতি চাইছি।' আমার সবিনয় নিবেদন।

'কী বলার আছে, নিঃসংকোচে বলে ফেল।' জিয়া বললেন।

আমি ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরলাম।

'স্যার, ১৫ আগস্ট এত বড় ঘটনা ঘটল, এরপর থেকে খুনি মেজররা

---

* বীর বিক্রম। পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার, জিয়া হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করে এত অপকর্ম করল, আপনি সেনাপ্রধান এদের নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উদ্যোগ নিলেন না। এদের কর্মকাণ্ডকে আপনি কখনো সমর্থন করেননি, কিন্তু এদের নিবৃত্ত করার জন্য কোনো পদক্ষেপও নেননি। ১৯ আগস্ট সেনা সদরে কনফারেন্সে কর্নেল শাফায়াত মেজর রশিদকে দমন করার হুমকি দিলেন। খন্দকার মোশতাককে উৎখাত করার ঘোষণা দিলে আপনি খুশি হয়েছিলেন এবং চিফের রুমে শাফায়াতকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন 'ওয়েল ডান', এই উচ্ছৃঙ্খল অফিসারদের সঙ্গে এভাবেই আচরণ করা উচিত। আপনার পেশাগত আচরণে উৎসাহিত হয়েই কর্নেল শাফায়াত এদের দমন করার উদ্যোগ নেন। আপনি সেনাপ্রধান হওয়ার পর শাফায়াত আপনাকে বারবার অনুরোধ করেছেন বিদ্রোহী অফিসারদের চেইন অব কমান্ডের আওতায় আনার জন্য। কিন্তু আপনি কিছুই করেননি।' আমি বললাম।

'আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আমার আরও সময় প্রয়োজন ছিল।' জিয়া একটু ডিফেন্সিভ।

'স্যার, ৩ নভেম্বরে ৪৬তম ব্রিগেডের অ্যাকশন কোনো গোপন অভিযান ছিল না। ক্যান্টনমেন্টে সবাই জানত এ অপারেশন সম্পর্কে এবং ঢাকা গ্যারিসনের সব অফিসার এতে প্রকাশ্য সমর্থনও দিয়েছে। এয়ার চিফ, নেভি চিফ ব্রিগেডিয়ার খালেদকে মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্ক পরিয়ে দিয়ে সেনাপ্রধান হিসেবে মেনে নিলেন। আপনি এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। আমাদের মতো জুনিয়রদের বিচারের মুখোমুখি করেছেন। অথচ আমি বাধা দেওয়ার কারণেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও নুরুজ্জামান আপনাকে সাভারে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিতে পারেনি।' আমি বললাম।

জিয়া বিব্রত, অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'আমি তো বন্দী ছিলাম। অনেক কিছুই জানতে পারিনি।'

'স্যার, আপনার নির্দেশে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিলাম। মুক্তিযুদ্ধে আপনার অধীন অফিসার ছিলাম। সেনাবাহিনীতে আমাকে আপনার বিশ্বস্ত অফিসার হিসেবে সবাই জানে, আর আমাকেই গ্রেপ্তার করলেন রুই-কাতলাদের বাদ দিয়ে। আমি ১ নভেম্বর আপনার বাসায় গিয়ে আপনাকে আমাদের অপারেশন (মোশতাকের বিরুদ্ধে) সম্পর্কে জানিয়ে আসিনি?' আমার প্রশ্ন।

জিয়া নিরুত্তর।

'স্যার, ৩ নভেম্বরের অ্যাকশনের টার্গেট ছিল খন্দকার মোশতাক ও খুনি মেজররা। আপনি টার্গেট ছিলেন না। আপনি নিজেই তো পদত্যাগ করলেন।' আমি ইমোশনাল হয়ে বলে ফেললাম।

মঞ্জুরের দিকে তাকালাম, তিনিও সম্মতিসূচক মাথা নাড়ছেন। জিয়া নীরবে শুনে গেলেন। আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। জিয়া নিরাবেগ। আইস কুল!

এ পর্যায়ে জিয়া বললেন, 'কী চাও তোমরা?'

'আমাদের চাওয়ার কোনো গুরুত্ব নেই। সৈনিকদের দাবিদাওয়া আপনি শুনেছেন। এসবই আমাদের চাওয়া। আমাদের এই ব্যাটালিয়নে পোস্টিং দিয়ে দিন, তারপর ধীরেসুস্থে সিদ্ধান্ত নিন।' জানিয়ে দিলাম।

'এক ঘণ্টা কেটে গেল আমাদের আলাপচারিতায়। একপর্যায়ে জিয়া বললেন, 'ঠিক আছে, অন্যদের সঙ্গেও কথা বলি। তারপর চিন্তাভাবনা করে দেখি কী করা যায়।'

আমি তাঁবুর বাইরে চলে এলাম। এরপর একে একে ইকবাল, হাফিজুল্লাহ ও তাজের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন সেনাপ্রধান। তাঁরাও জানিয়ে দিলেন সৈনিকদের দাবিই তাঁদের প্রত্যাশা। একপর্যায়ে মধ্যাহ্নভোজের জন্য বিরতি দেওয়া হলো।

অফিসার মেসে জিয়া আমাদের সঙ্গেই দুপুরের খাবার খেলেন। কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'হাফিজ, অনেক দিন ফুটবল খেলি না। চলো আজ বিকেলে ফুটবল খেলা যাক।'

'শিওর স্যার।'

আমরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমাদের নমনীয় আচরণে জিয়া অনেকটাই রিল্যাক্সড হলেন। বললেন, 'আজ রাতটি তোমাদের সঙ্গেই কাটাব।' হেলিকপ্টার রেখে দিলেন। মর্টার ব্যাটারির সৈনিকদেরও ফেরত পাঠানোর জন্য কর্নেল সাদিককে নির্দেশ দিলেন।

বিকেল চারটায় ফুটবল ম্যাচ শুরু হলো। একদিকে প্রথম ১ম বেঙ্গলের জেসিও এবং সৈনিকেরা, অপর টিমে অফিসাররা—জিয়া, মঞ্জুর, সাদিক, অলি, আমরা চারজন এবং ১ম বেঙ্গলের তিনজন। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসে সৈনিকেরা মুহুর্মুহু হাততালি দিয়ে উৎসাহ জোগাচ্ছে। সাদিক ও অলি ভালোই খেলেন। জিয়াও বেশ ফিট বলে মনে হলো। আমি টেনশনে খেলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ হলো।

রাতে নৈশভোজের পর আবার বৈঠক শুরু হলো। এবার আমাদের চারজনকে একত্র করেই আলোচনা শুরু করেন জিয়া। সঙ্গে রয়েছেন মঞ্জুর ও সাদিক। দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনার পরও সিদ্ধান্তে পৌছানো যাচ্ছে না। রাত প্রায় ১২টা বাজে, আমরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একপর্যায়ে জিয়া বললেন, 'আমি এখন কেবল সেনাপ্রধান নই, রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্বও আমাকে বহন করতে হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো আমাকে ভোগাচ্ছে। ৭ নভেম্বরের

পর থেকে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আমাকে দিনরাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলেও আমার কর্মকাণ্ডের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে সবার। আমাকে সফল হতেই হবে।'

'স্যার, দেশের স্বার্থে আমরা আপনাকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত,' আমি বললাম।

'আমার সিদ্ধান্ত শোনো। তোমাদের চারজনকে পল্টনের সৈনিকেরা গ্রহণ ও সমর্থন করেছে। সুতরাং তোমাদের সেনাবাহিনীতে রাখব আমরা। কিন্তু সেনাবাহিনীর সার্বিক শৃঙ্খলার স্বার্থে বাকি অফিসাররা, অর্থাৎ কর্নেল শাফায়াত জামিলসহ গ্রেপ্তার আটজনকে কোর্ট মার্শাল করে শাস্তি বিধান করতে হবে। অন্যথায় আমি এই সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে পারব না।' জিয়া বললেন।

আমরা সিদ্ধান্ত শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমরা চাকরি করে যাব এবং আমাদের কমান্ডার ও ভ্রাতৃপ্রতিম অফিসাররা কঠিন শাস্তি ভোগ করবেন, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে! সকাল নয়টায় আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন রাত ১২টা বাজে। লাঞ্চ ও ফুটবল ম্যাচের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়ে ম্যারাথন আলোচনা চালিয়ে আমরাও শ্রান্ত-ক্লান্ত, মাথাও ঠিকমতো কাজ করছে না!

দুই মিনিট চিন্তা করে আমি জানালাম, 'স্যার, আমাদের চারজনকে নিয়েই আপনারা বিব্রত, চিন্তিত। আমরাও সিদ্ধান্ত নিলাম সেনাবাহিনীতে আর থাকব না, আমাদের অবসর দিন। এর বিনিময়ে কর্নেল শাফায়াত জামিল এবং অন্য গ্রেপ্তার অফিসারদের (বৈমানিকসহ) মুক্তি দিন। আমরা চারজন, অর্থাৎ আমি, ইকবাল, হাফিজুল্লাহ ও তাজকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক দায়িত্ব দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দিন।'

আমার প্রস্তাব শুনে জিয়ার মুখে হাসি ফুটল। মঞ্জুর ও সাদিক আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। এত সহজে সমস্যার সমাধান হবে, তাঁরা ভাবতেও পারেননি। সাদিক দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'হাফিজ, ইউ আর অল প্যাট্রিয়টস, I salute you.'

আমরা চারজনই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লাম। জিয়া হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, বললেন, 'I agree to what you said.'

'স্যার, আমরা পল্টনেই থেকে যাই। আপনি ঢাকায় গিয়ে কাইন্ডলি আমাদের বিদেশে পোস্টিং অর্ডার পাঠিয়ে দেন। আমরা এখান থেকেই বিদেশে চলে যাব।' আমি অনুরোধ জানালাম।

এ সময় মঞ্জুর বলে উঠলেন, 'নো প্রবলেম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমরা এখান থেকে বিদেশে চলে গেলে ভালো দেখাবে না। মনে হবে

তোমাদের জোর করে আমরা বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার সাজেশন হলো—তোমরা যার যার বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে কয়েক দিন কাটাও। এক সপ্তাহ পর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমি পোস্টিং অর্ডার রেডি করে রাখব। তোমরা সম্মানজনকভাবে নতুন চাকরিস্থলে যোগ দেবে।'

মঞ্জুরের ওপর অগাধ বিশ্বাস আমাদের। বললাম, 'রাইট স্যার, এক সপ্তাহ পরই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

জিয়া ও সঙ্গীরা অফিসার মেসের তাঁবুতে রাত কাটালেন। তাঁরা নির্ভার। দুই মাস পর জটিল সমস্যার সমাধান হলো। আমরা কিন্তু নির্ঘুম রাত কাটালাম। কাল থেকে জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হবে। প্রিয় সেনাবাহিনীতে আগামীকালই আমাদের শেষ কার্যদিবস।

পরদিন ৭ মার্চ ১৯৭৬ সকাল আটটায় ব্যাটালিয়ন দরবার অনুষ্ঠিত হলো। সেনাপ্রধান জিয়া সতর্কভাবে শব্দচয়ন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেন।

'এই পল্টন আমার প্রিয়, এখানেই কমিশন লাভ করেছি, '৬৫ সালে এবং '৭১ সালে আপনাদের সঙ্গে নিয়েই যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। উভয় যুদ্ধে এই পল্টন উজ্জ্বল সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। হাফিজও মুক্তিযুদ্ধের প্রথম কয়েক মাস এই পল্টনের নেতৃত্ব দিয়েছে। চারজন অফিসার দুই মাস ধরে এ পল্টনে অবস্থান করছে। আমি তাদের সেনাবাহিনীতে রাখতে চাই। কিন্তু তারা নিজেরাই অবসর নিতে চাচ্ছে। আমিও এতে রাজি হয়েছি। আমি আশা করি এই ব্যাটালিয়ন ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা বজায় রাখবে এবং অনেক সাফল্য অর্জন করবে।' জিয়া দরবারের সমাপ্তি টানলেন।

আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিয়া সকাল ১০টায় হেলিকপ্টারে উঠলেন। কমান্ড ব্যর্থতার কারণে সিও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউরের ওপর তিনি ক্ষিপ্ত ছিলেন। বাক্স-প্যাটরাসহ তাঁকেও হেলিকপ্টারে তুলে নিলেন। পল্টন থেকে বিদায় নেওয়ার সুযোগও তাঁকে দেওয়া হলো না। হেলিকপ্টারে ওঠার পূর্বমুহূর্তে আমি সেনাপ্রধানকে বললাম, 'স্যার, কোনো ভুল করলে আমরাই করেছি, কোনো সৈনিকের বিরুদ্ধে যেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়।'

'ওকে।' জিয়ার উত্তর।

মঞ্জুর বললেন, 'হাফিজ, একটি কথা স্বীকার করতে আমার কোনো সংকোচ নেই, আমরা এই পল্টনের সৈনিকদের মতো সৈনিকই তো চাই, যারা সর্বাবস্থায় অফিসারদের কমান্ড মানবে, নিরাপত্তা দেবে। ৭ নভেম্বরের পর থেকে অফিসাররা আতঙ্কে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জওয়ানদের দৃঢ়ভাবে কমান্ড করার মতো আত্মবিশ্বাস অনেকেরই নেই। তোমাদের মতো অফিসার ছাড়া আমরা কীভাবে এই সেনাবাহিনী পরিচালনা করব? নিশ্চিত থাকো, তোমাদের নিরাপত্তা দেওয়ার কারণে কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না।'

আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিয়া হেলিকপ্টারে উঠে গেলেন। শত শত সৈনিক ঘিরে ধরল আমাদের চারজনকে। তাদের অনেকের চোখে অশ্রু, আমরাও আবেগাপ্লুত। তারা প্রশ্ন করে, 'কেন চলে যাচ্ছেন?'

আমি বললাম, 'তোমরা অনেক কষ্ট করেছ, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের নিরাপত্তা দিয়েছ। এখন তোমাদের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রয়োজন। তাই আমরা চলে যাচ্ছি। চিফ নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।'

'স্যার, আমরা নিজেদের নিয়ে ভাবি না, আমরা সামান্য মানুষ। আমাদের চিন্তা আপনাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে।' সৈনিকেরা উত্তরে জানাল।

কী বিরাট হৃদয়ের অধিকারী এই সাধারণ সৈনিকেরা। ভাবতেও অবাক লাগে। তারা আমাদের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত। কী সুদৃঢ় সেনাবাহিনীর মধ্যেকার বিদ্যমান ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

বিদায়বেলায় এক আবেগঘন দৃশ্যের অবতারণা হলো। শত শত সৈনিকের সঙ্গে কোলাকুলি করে অশ্রুসিক্ত নয়নে জিপে উঠে আমরা ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলাম বেলা ১১টায়। বিদায় ১ম ইস্ট বেঙ্গল।

মহাসড়ক বেয়ে আমাদের বহনকারী জিপ এগিয়ে চলেছে ঢাকার পথে। ছিয়াত্তর সালে রাস্তাঘাট অনেকটাই ফাঁকা, যানজটের বালাই ছিল না। রাস্তা তেমন মসৃণ নয়, ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছি। দুই পাশের গ্রামবাংলার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য কিন্তু উপভোগ করার মানসিকতা আমার নেই। জিপের ড্রাইভার সেলিম একাত্তরে ছিল ১৪ বছর বয়সী কিশোর, এক বাসের হেলপার। তাকে আমিই বেনাপোলে রিক্রুট করেছিলাম ১ম বেঙ্গলে। সে নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে। মাঝেমধ্যে আমাকে লুকিয়ে রুমালে চোখ মুছছে। যুদ্ধের সময় আমার গাড়ি চালিয়েছে, সে জন্যই ওকে পাঠানো হয়েছে আমাকে পৌঁছানোর জন্য।

নিজেকে বড় অসহায়, দুর্বল মনে হচ্ছে সেনাবাহিনী ছেড়ে আসার পর। মাত্র আট বছরের সৈনিক জীবন। অথচ কত ঘটনাবহুল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর, ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। একাত্তরের মার্চে আমরা মাত্র ২৫ জন অফিসার পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গড়ে তুলি। এঁদের মধ্যে মাত্র আটজন মেজর, বাকিরা ক্যাপ্টেন এবং লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কধারী ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে সবাই যুদ্ধ করেছেন। রক্ত দিয়েছেন। অথচ নিজেদের গড়া সেই সেনাবাহিনী থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিতে হচ্ছে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয়

অর্জনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি ব্যাটল সিজনড দুর্ধর্ষ সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন অনুন্নত দেশের বাজেটে সেনাবাহিনী কোনো অগ্রাধিকার পায়নি। '৭৫-এ সৈনিকদের ইউনিফর্ম, কম্বল, অস্ত্র, সরঞ্জামের প্রচুর ঘাটতি ছিল কিন্তু সৈনিকদের মনোবল ছিল তুঙ্গে। কিন্তু বিপ্লবী মুক্তিবাহিনীকে পেশাদার সামরিক বাহিনীতে রূপান্তর করা অত্যন্ত কঠিন প্রক্রিয়া। এ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সরকার এবং সামরিক বাহিনীর শীর্ষ নেতাদের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার ঘাটতি থাকার কারণে আমরা সফল হতে পারিনি। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে জাতীয়-আন্তর্জাতিক কুচক্রী মহল, ঘটিয়েছে ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড। চেইন অব কমান্ড প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে নিহত ও বহিষ্কৃত হন মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তি যোদ্ধারা।

এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সৈনিকদের উসকে দিয়ে অফিসার হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা পৃথিবীর সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে তেমন দেখা যায় না। কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য জাসদ ও কর্নেল তাহের বিপ্লবের নামে ৭ নভেম্বর সেনাবাহিনীতে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন, সেটি বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এ অভাবনীয় ঘটনা বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর মূল ভিত্তিকে চিরতরে দুর্বল, ভঙ্গুর করে দিয়েছে। সামরিক বাহিনীর ঐতিহ্য ও পেশাদারত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছে জাসদ ও তাহের। বাংলাদেশে একশ্রেণির রাজনীতিক ও সাংবাদিক '৭৫-এর ঘটনাবলি না জেনেই কাউকে হিরো আর কাউকে ভিলেন বানিয়ে যাচ্ছেন।।

জেনারেল জিয়াউর রহমান কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন এবং আপাতদৃষ্টিতে তাতে সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় দুর্বল নেতৃত্বের কারণে পরবর্তীকালেও আধিপত্যবাদী কুচক্রী মহলের প্ররোচনায় অফিসার হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা এবং সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

ঢাকা শহরের প্রবেশমুখে বাস, ট্রাক, কারের মিলিত হর্নের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেলাম। সন্ধ্যার আগেই ইডেন গার্লস কলেজের গেটে এসে থামল আমার জিপ। কলেজ কম্পাউন্ডের এক প্রান্তে, পুকুরের পাড়ে একটি দ্বিতল ভবনের দোতলায় সাময়িকভাবে ডেরা বেঁধেছে আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা দিলারা। দারোয়ান গেট খুলে দিল, প্রবেশ করলাম জীবনের এক নতুন অধ্যায়ে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার সময় মনে পড়ে গেল, বন্দিজীবনের প্রারম্ভে পিতার কাছে শোনা উক্তি—Variety is the spice of life.

উপ-সেনাপ্রধান এরশাদ এবং সিজিএস মঞ্জুরকে কয়েকবার টেলিফোন করেও সদুত্তর পেলাম না। তাঁরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। আমাদের চারজনকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক পদে নিয়োগ দেওয়া হলো না। আমাকে দেশে একটি মধ্যম মানের চাকরির অফার দিলেন জেনারেল জিয়ার প্রধান স্টাফ অফিসার মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম (শিশু)। আমি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। ঢাকা মোহামেডান ক্লাবে আস্তানা গেড়ে আবার ফুটবলে নিমগ্ন হলাম। স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠিয়ে হাজারো সমর্থকের গগণবিদারী হর্ষধ্বনির মধ্যে দুঃখ ভোলার প্রয়াসে সচেষ্ট হলাম।

১৯৭৭ সালে শাফায়াত জামিল, তাজুল ইসলাম ও আমি একটা লিমিটেড কোম্পানি গঠন করে ব্যবসায় নামলাম। কোম্পানির নামটি আমারই দেওয়া। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য একেবারেই বেমানান, 'ক্যাভেলিয়ার লিমিটেড', অর্থাৎ ফুর্তিবাজ যোদ্ধা। সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ দিলেন জেনারেল মঞ্জুর এবং জিয়াউর রহমান। ৯ মাসের মধ্যেই অর্থকষ্ট দূর হলো, তিনজনই নতুন গাড়ি কিনলাম।

১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৭৫-এ অবসরপ্রাপ্তদের আলাদাভাবে ডাকলেন তাঁর গড়া দল বিএনপিতে যোগ দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য। আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন মন্ত্রী কর্নেল আকবর। আমি রাজনীতিতে কখনোই আগ্রহী ছিলাম না। প্রেসিডেন্টের আহ্বানের মূল্য মোটা বুদ্ধির কারণে বুঝতে পারিনি। মেজর ইকবাল ও লে. কর্নেল জাফর ইমাম ১৯৭৯-তে বিএনপিতে যোগ দিলেন। জিয়া তাঁদের এমপি ও প্রতিমন্ত্রী বানালেন।

সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর পেলাম ১৯৭৬-এ। ফুটবলের মাঠ থেকে অবসর ১৯৭৮-এ। খেলাকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা উপভোগ করেছি, খেলা ছাড়ার পর নিজেকে অপাঙ্ক্তেয় মনে হলো। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ১০টি বছর কেটে যাওয়ার পর একসময় রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ভোলা-৩ আসন থেকে পরপর ছয়বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলাম।

অনেকেই প্রথমবার এমপি হয়েই (ভোটে কিংবা বিনা ভোটে) মন্ত্রী পদ লাভ করেন। লালমোহন ও তজুমুদ্দিনের জনগণ পরপর ছয়বার আমাকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করে। কিন্তু 'আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে'। আমার ভাগ্যে শিকা ছিঁড়ল ষষ্ঠবার এমপি হওয়ার পর। ১৯৯১ সালে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মাত্র

তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, আমি তাঁদের একজন। বছরখানেক পর '৯২ সালে খালেদা জিয়ার আহ্বানে বিএনপিতে যোগদান করি।

২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয়ী হলো। মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য নির্দিষ্ট দিনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা টেলিফোনের পাশে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে সকাল থেকে বসে আছেন একটি ফোনকলের অপেক্ষায়। আমার অবস্থাও তথৈবচ। বেলা দুইটার দিকে সেই কলটি এল, যার জন্য ১৫ বছর ধরে অপেক্ষায় ছিলাম। ফোনের অপর প্রান্তে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু আকবর আলী খান। 'স্লামালেকুম স্যার, আমি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি বলছি। আজ বিকেল চারটায় ক্যাবিনেট মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণের জন্য আপনাকে বঙ্গভবনে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি।' আমার গাড়িটি লক্কড়ঝক্কড়মার্কা। এক বন্ধুর গাড়ি ধার করে বিকেলে বঙ্গভবনে গেলাম।

আজ আমার বয়স ৭৫ পেরিয়েছে। ৩৪ বছর ধরে রাজনীতি করছি। সেনাবাহিনীতে ছিলাম মাত্র আট বছর। এ দেশে রাজনীতি অত্যন্ত ঝক্কিঝামেলার ব্যাপার। নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে যশ-গৌরবও মাঝেমধ্যে মেলে। মাঝেমধ্যে মনে হয় ক্যাবিনেট মন্ত্রিত্বের তুলনায় সেনা ক্যাপ্টেনের তৃতীয় 'পিপ'টি আমাকে অধিকতর আনন্দ দিয়েছে! Nothing like Army, what a way of life!

পরিশিষ্ট ১

বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবি

১. আমাদের বিপ্লব নেতা বদলানোর জন্য নয়। এই বিপ্লব গরিব স্বার্থের জন্য। এত দিন আমরা ছিলাম ধনীদের বাহিনী। ধনীরা তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করেছে। ১৫ আগস্ট তার প্রমাণ। তাই এবার আমরা ধনীদের দ্বারা ধনীদের স্বার্থে অভ্যুত্থান করিনি। আমরা বিপ্লব করেছি। আমরা জনতার সঙ্গে এক হয়ে বিপ্লবে নেমেছি। আমরা জনতার সঙ্গে থাকতে চাই। আজ থেকে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী হবে গরিবশ্রেণির স্বার্থরক্ষার একটি গণবাহিনী।

২. অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

৩. রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

৪. অফিসার ও জওয়ানদের ভেদাভেদ দূর করতে হবে, অফিসারদের আলাদাভাবে নিযুক্ত না করে সামরিক শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ণয় করতে হবে।

৫. অফিসার ও জওয়ানদের একই রেশন ও একই রকম থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. অফিসারদের জন্য আর্মির কোনো জওয়ানকে ব্যাটম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা চলবে না।

৭. মুক্তিযুদ্ধ, গত অভ্যুত্থান ও আজকের বিপ্লবে যেসব দেশপ্রেমিক ভাই শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. ব্রিটিশ আমলের আইনকানুন বদলাতে হবে।

৯. সব দুর্নীতিবাজের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বিদেশে যারা টাকা জমিয়েছে, তাদের টাকা বাংলাদেশে ফেরত আনতে হবে।
১০. যেসব সামরিক অফিসার ও জওয়ানকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. জওয়ানদের বেতন সপ্তম গ্রেড হতে হবে এবং ফ্যামিলি অ্যাকমডেশন ফ্রি হতে হবে।
১২. পাকিস্তান-ফেরত সামরিক বাহিনীর লোকদের ১৮ মাসের বেতন দিতে হবে।

নিবেদক
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিপ্লবী সৈনিকবৃন্দ
(নভেম্বর ১৯৭৫)

পরিশিষ্ট ২

জাতীয় সংসদ বাতিল : রাষ্ট্রপতির ভাষণ

রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করার সময় বিচারপতি জনাব আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দেন, নিচে তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হলো :

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলায়কুম

আজ এক সংকটময় মুহূর্তে জাতির বৃহত্তম স্বার্থে জনগণের সহযোগিতার ওপর দৃঢ় আস্থা রেখে আমি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। দেশের স্বাধীনতা এবং আপামর জনসাধারণের ও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী-সমৃদ্ধিশালী জীবন নিশ্চিত করার জন্য, যে লক্ষ লক্ষ ভাই ও বোনেরা আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং করেছেন তাঁদের জীবন বিপন্ন, আজ সর্বান্তঃকরণে তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। যে আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য আমরা স্বাধীনতাসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম, স্বাধীনতার প্রায় দীর্ঘ চার বছর পরেও তার আশানুরূপ বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে জনসাধারণ আজও অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। তাদের মনে হতাশা ও নিরাপত্তাবোধের অভাব। দেশের সাধারণ মানুষের এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রসূত আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন হয়নি।

গত ১৫ আগস্ট কতিপয় অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকরিরত সামরিক অফিসার এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে হত্যা করে। জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সামরিক আইন জারি করেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুর্ঘটনার সঙ্গে সামরিক বাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিল না।

দেশবাসী আশা করেছিল, দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরে আসবে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু আমরা সবাই নিরাশ হয়েছি। দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি সম্প্রতি কারাগারে অন্তরীণ কিছু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ আমাকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। দেশকে চরম দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করার মহৎ উদ্দেশ্যে সঠিক সহায়তা দান করার জন্য আমি আমাদের দেশপ্রেমিক ও ঐতিহ্যবাহী সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছি।

দেশে সামরিক আইন জারি রয়েছে। আমি একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অবাধ নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এই দায়িত্ব ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অথবা সম্ভব হলে তার পূর্বেই পালন করতে বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে জাতীয় সংসদ বাতিল করা হলো। আমাদের দেশে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এবং সমাজদেহ থেকে দুর্নীতি, মুনাফাখুরি, কালোবাজারি, চোরাকারবারি ও বেআইনি অস্ত্রধারী এবং খুন, রাহাজানি ও লুটতরাজের মতো ঘৃণ্য অপরাধসমূহ দূর করতে হবে, যাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসে। একই সঙ্গে আইনের শাসন, জনগণের মৌলিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার বিরামহীন প্রচেষ্টায় আমাদের লিপ্ত হতে হবে।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমতা, সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা এবং একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে আমরা অবিচল থাকব। আমরা সক্রিয়ভাবে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে যাব। আমি দৃঢ়তার সাথে পুনরায় ঘোষণা করছি যে আমাদের সরকার জাতিসংঘের সনদ ও তার নীতিমালা ও লক্ষ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সরকার সকল দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি এবং দায় সম্পর্কে পূর্ণ মর্যাদাশীল থাকবেন।

আমরা বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদবিরোধী নীতি অনুসরণ করে যাব। ইসলামি সম্মেলন, জোটনিরপেক্ষ ও কমনওয়েলথ সম্মেলনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় থাকবে। বিশ্বশান্তি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দৃঢ়তর করার প্রচেষ্টায়ও আমরা সক্রিয় থাকব। এখন পর্যন্ত যেসব রাষ্ট্রের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার

ব্যাপারে আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়, এই প্রতিপাদ্যই হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি।

আমরা উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। একই সাথে আমরা আমাদের নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিদ্যমান ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে নিষ্ঠাবান। বৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে আমাদের সরকার ঘনিষ্ঠতর বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা চালিয়ে যাবেন।

ইসরাইলের কবল থেকে পবিত্র আরব ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য এবং আরব ভাইদের ন্যায়সংগত সংগ্রাম ও ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি আমরা আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন অব্যাহত রাখছি।

পরিশেষে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধানে আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করি। ইনশা আল্লাহ, আমরা সফলকাম হব।

খোদা হাফেজ।
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।